বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

৯২ তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদযাপন স্মারক

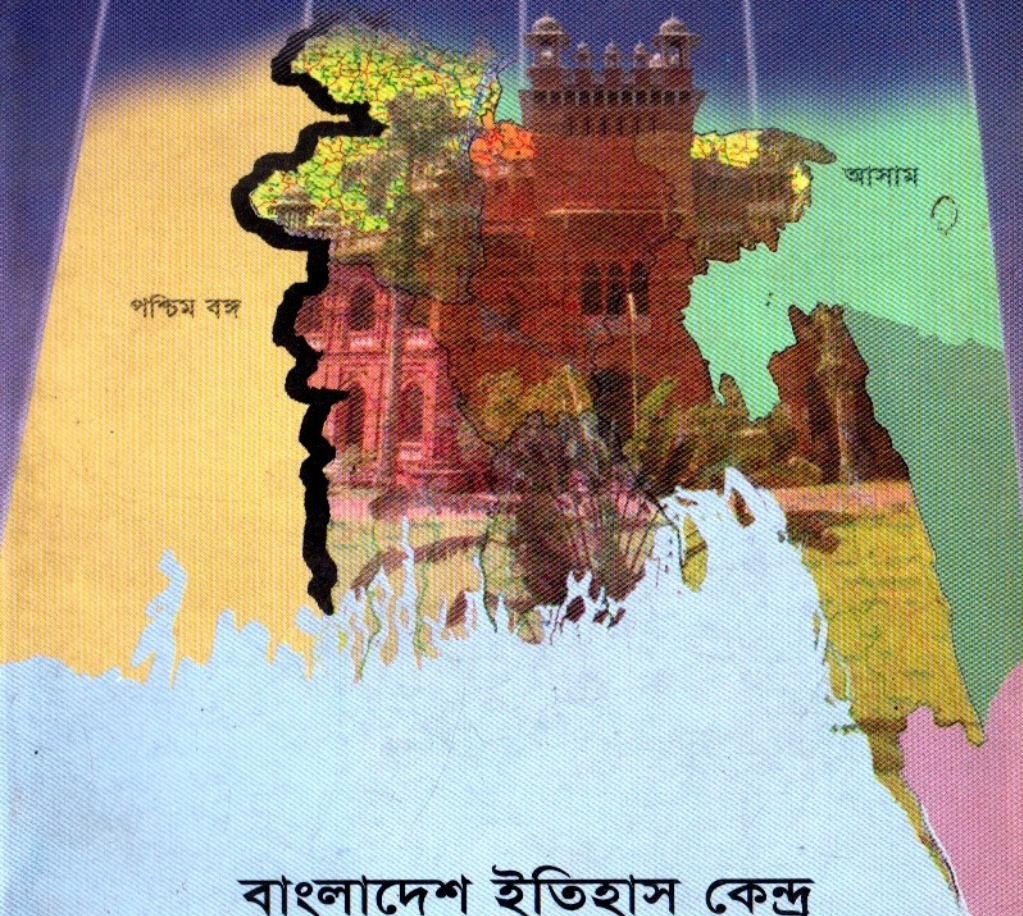

বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

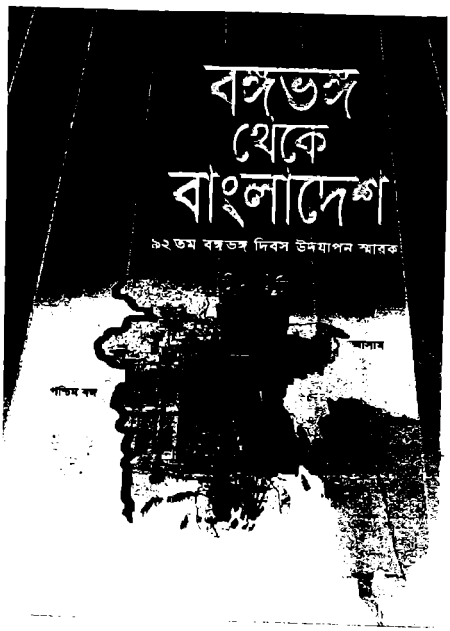

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

৯২তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদযাপন স্মারক

বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

৯২তম বঙ্গভঙ্গ দিবস উদযাপন স্মারক

স্মারক কমিটি

আহবায়ক

মাসুদ মজুমদার

সদস্য

খন্দকার আবদুল মোমেন

আবদুল ওয়াহিদ

প্রকাশকাল

১৬ অক্টোবর '৯৭

৩১ আশ্বিন, ১৪০৪

১৩ জমাদিউস সানি, ১৪১৮ হিজরী

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

আরিফুর রহমান

প্রচ্ছদ গ্রাফিকস

ডটপ্লাস, ঢাকা

মুদ্রণ

চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড

১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০

ফোন ঃ ৪১৯৬৫৪, ৯৩৩৮২৫২

শুভেচ্ছা মূল্য

১০০ (একশত) টাকা

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র

৩৮০/বি, মীরপুর রোড (৩য় তলা)

ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Bonga Vonga Theke Bangladesh [From Bonga Vonga to Bangladesh] A Souvenir, Published on the occasion of 92nd anniversary of Partition of Bengal. Published by Bangladesh Itihash Kendra (Centre for History of Bangladesh), 380/B, Mirpur Road (2nd Floor), Dhanmondi, Dhaka. Bangladesh. Edited By Masud Majumder, Khondaker Abdul Momen, Abdul Wahid. Date of Publication 16th October 1997. Price : Tk. 100.00 US$ 5

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র

উপদেষ্টামন্ডলী

প্রফেসর দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান,
প্রফেসর ডঃ আবদুল করীম, প্রফেসর ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ,
প্রফেসর ডঃ মনিরুজ্জামান মিয়া, বিচারপতি সুলতান হোসেন খান,
ডঃ আসকার ইবনে শাইখ, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, শাহেদ আলী,
বিচারপতি আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, অলি আহাদ,
কাজী জাফর আহমদ, মুহম্মদ আয়েন উদ্‌দীন, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা,
সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী, আনোয়ার জাহিদ, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এম, পি,
মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এম, পি, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান,
আবদুল কাদের মোল্লা, আবদুল মান্নান তালিব,
কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমান , মোহাম্মদ ইউনুস, আখতার-উল-আলম,
আবুল আসাদ, কবি আল মাহমুদ, ওবায়দুল হক সরকার, অধ্যক্ষা চেমন আরা
কণ্ঠশিল্পী আঞ্জুমান আরা বেগম, মাওলানা রূহুল আমীন খান,
আমানুল্লাহ কবীর, মাসির হোসেন, আবদুল বাতেন, এরশাদ মজুমদার,
সৈয়দ তোসারফ আলী, ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব, অধ্যাপক মতিউর রহমান,
নাজিম হাবিবুজ্জামান, ডাঃ মহসিন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র

আহবায়ক কমিটি

আহবায়ক

আরিফুল হক

যুগ্ম আহবায়ক

গিয়াস কামাল চৌধুরী

সদস্য

আবদুল হাই শিকদার, হাফীজ উদ্দীন, মাসুদ মজুমদার
মতিউর রহমান মল্লিক, রফিকুন্নবী, মুহাম্মদ আবদুল হান্নান
এলাহী নেওয়াজ খান, আবদুল ওয়াহিদ,
এ্যাডভোকেট রঈসউদ্দীন, সুলতান আহমদ, আলম মাসুদ
আরকানুল্লাহ হারুনী, মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান,
আনিসুজ্জামান, মুহাম্মদ মুর্তাজা, শাহ আলম, মহিববুল্লাহ

নির্বাহী কমিটি

গিয়াস কামাল চৌধুরী, আবদুল হাই শিকদার
মাসুদ মজুমদার, আমিনুল ইসলাম, মতিউর রহমান মল্লিক
খন্দকার আবদুল মোমেন, আবদুল ওয়াহিদ
আনিসুজ্জামান, হাসনাত আবদুল কাদের,
মুহাম্মদ মুর্তাজা, মহিববুল্লাহ, শাহ্ আলম
আসাদুজ্জামান

স্মারক কমিটি

আহবায়ক

মাসুদ মজুমদার

সদস্য

খন্দকার আবদুল মোমেন
আবদুল ওয়াহিদ

সেমিনার কমিটি

মতিউর রহমান মল্লিক
আবদুল ওয়াহিদ
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

www.pathagar.com

সুচীপত্র

লেখা	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা নং
১। বাংলা ভাগ হয় নাই	— আবুল মনসুর আহমদ	৯
২। বঙ্গভঙ্গ	— প্রফেসর এম এ রহিম	১১
৩। বঙ্গ বিভাগ	— আবদুল মওদুদ	১৫
৪। সময় তো চলে যায়	— সৈয়দ আলী আহসান	১৯
৫। বঙ্গ বিভাগ রাজনৈতিক পদক্ষেপ	— প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ	২২
৬। বঙ্গভঙ্গ	— কে এম মোহসীন	২৪
৭। বঙ্গভঙ্গ বনাম স্বাধীন বঙ্গ	— অলি আহাদ	২৯
৮। বঙ্গভঙ্গ রদ ও বাংলার মুসলমান	— আব্বাস আলী খান	৩১
৯। বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি	— প্রফেসর এ বি এম মাহমুদ	৩৭
১১। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া	— প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	৪৮
১০। বঙ্গবিভাগ ও রদের ফলাফল	— প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	৫১
১২। পূর্ববঙ্গ ও আসাম ঃ সেকাল-একাল	— প্রফেসর আবদুল গফুর	৬০
১৩। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সাম্প্রতিক পর্যায় সূচনা	— প্রফেসর এস এম লুৎফর রহমান	৬৪
১৪। শির দেগা নেহি দেগা আমামা	— গিয়াস কামাল চৌধুরী	৭২
১৫। কেন বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতাকারীরাই শেষে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলো	— মহবুব আনাম	৭৪
১৬। মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়	— এম এ মোহাইমেন	৮২
১৭। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ	— ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরী	৮৬
১৮। বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া	— প্রফেসর মুনতাসীর মামুন	৮৯
১৯। বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন রাজনীতি	— কে এম রাইছ উদ্দিন খান	৯১
২০। বাংগালীর দেহ বাংগালীর প্রাণ	— অধ্যাপক আখতার ফারুক	১০০
২১। বঙ্গভঙ্গ	— মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লা	১০৩
২২। বঙ্গভঙ্গ ও ভদ্রলোক শ্রেণী	— আসহাবুর রহমান	১০৭
২৩। বঙ্গভঙ্গ রদকারীরা কেমন আছেন	— আবদুল মান্নান তালিব	১১০
২৪। ঢাকা বাঙ্গালী মুসলমানদের সংস্কৃতির রাজধানী	— আবদুল মান্নান সৈয়দ	১১৩
২৫। বঙ্গভঙ্গ এবং তৎকালীন হিন্দু মানসিকতা	— আবুল আসাদ	১১৭
২৬। মুখোশধারী আধিপত্য	— আল মাহমুদ	১২৯
২৭। শতবর্ষের ফেরারী	— আহমদ ছফা	১৩১
২৮। লাইভ স্টক	— ওবায়দুল হক সরকার	১৩৫
২৯। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গ ও আজকের বাংলাদেশ	— আরিফুল হক	১৪০
৩০। বাংলাভাষীরা কি কখনো এক হবে?	— এরশাদ মজুমদার	১৫১
৩১। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ ঃ বঙ্গভঙ্গের দুই মধ্যকালীন রাজনীতি	— শামসুল ইসলাম	১৫৪
৩২। দুই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সংঘাত	— মোহাম্মদ আবদুল মান্নান	১৬২
৩৩। বঙ্গভঙ্গ ও আমাদের জাতিসত্তা	— অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের	১৭২
৩৪। বঙ্গভঙ্গ ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া	— মুনসী আবদুল মান্নান	১৭৭
৩৫। বঙ্গভঙ্গ দ্বিজাতি তত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা	— মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব	১৯৩
৩৬। বঙ্গভঙ্গ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা	— ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব	১৯৭
৩৭। বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ	— মাসুদ মজুমদার	২০১
৩৮। বঙ্গভঙ্গ বাংলাদেশ ও অনাগত ভবিষ্যৎ	— তারেক ফজল	২০৪
৩৯। নওয়াব সলিমুল্লার ভাষণ	—	২১০
৪০। ধারাপঞ্জী	—	২১২
৪১। প্রতিবেদন ও আলোকচিত্র	—	২১৭

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

১. আবুল মনসুর আহমদ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক।
২. প্রফেসর এম এ রহিম, ইতিহাসবিদ, সাবেক প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, ন্যাশনাল প্রফেসর, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর।
৪. প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ, রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. প্রফেসর কে এম মোহসীন, ইতিহাসবিদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. অলি আহাদ, রাজনীতিবিদ, ভাষা সৈনিক।
৭ আব্বাস আলী খান, রাজনীতিবিদ, গবেষক।
৮. প্রফেসর এ বি এম মাহমুদ, ইতিহাসবিদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রফেসর, উর্দু ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইতিহাসবিদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১১. প্রফেসর আবদুল গফুর, সাংবাদিক, ভাষা সৈনিক।
১২. প্রফেসর এস এম লুৎফর রহমান, সাহিত্যিক, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩. গিয়াস কামাল চৌধুরী, সাংবাদিক, সাবেক সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব।
১৪. মহবুব আনাম, সাবেক সম্পাদক, দি বাংলাদেশ টাইমস ও সাবেক সাংসদ।
১৫. এম এ মোহাইমেন, লেখক, সাবেক সাংসদ।
১৬. ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, ইতিহাসবিদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।
১৭. প্রফেসর মুনতাসীর মামুন, ইতিহাসবিদ, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮. কে এম রাইছ উদ্দিন খান, ইতিহাসবিদ, প্রবন্ধকার।
১৯. অধ্যাপক আখতার ফারুক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক।
২০. মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, গবেষক।
২১. আসহাবুর রহমান, লেখক, রাজনীতিক।
২২. আবদুল মান্নান তালিব, গবেষক, অনুবাদক।
২৩. আবদুল মান্নান সৈয়দ, সাহিত্যিক, গবেষক।
২৪. আল মাহমুদ, কবি, প্রবন্ধকার, গল্পকার ও কলামিস্ট।
২৫. আবুল আসাদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সম্পাদক, দৈনিক সংগ্রাম।
২৬. আবদুল মওদুদ, লেখক, গবেষক।
২৭. আহমদ ছফা, সাহিত্যিক, কলামিস্ট।
২৮. ওবায়দুল হক সরকার, অভিনেতা, লেখক, নাট্যকার।
২৯. এরশাদ মজুমদার, সাংবাদিক।
৩০. শামসুল ইসলাম, লেখক, গবেষক।
৩১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, লেখক, ব্যাংকার।
৩২. মুন্সী আবদুল মান্নান, সাংবাদিক, কলামিস্ট।
৩৩. অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, গবেষক, রাজনীতিক।
৩৪. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, গবেষক, কলামিস্ট।
৩৫. ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রব, ভূ-রাজনীতি বিশেষজ্ঞ, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৭. তারেক ফজল, লেখক, শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৬. মাসুদ মজুমদার, সাংবাদিক, কলামিস্ট, সংস্কৃতি সংগঠক।
৩৮. আলম মাসুদ, সাংবাদিক।

www.pathagar.com

আমাদের কথা

বঙ্গভঙ্গ আমাদের জাতিসত্তার পরিচিতিকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছে। ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম বাংলার জনগণের জাগৃতির পথে বঙ্গভঙ্গ ছিলো অন্যতম মাইল ফলক। বৃটিশ বেনিয়াচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা, সাম্প্রদায়িক বর্ণ হিন্দু, কোলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবী, হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্রের কারণে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার জনগণের স্বপ্ন পুনরায় ভূলুণ্ঠিত হয়। বঙ্গভঙ্গ ছিলো মুলত বৃটিশ বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষকের প্রতিনিধি লর্ড কার্জনের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার। লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য যা-ই হোক, মুসলিম বাংলার জনগণ বঙ্গভঙ্গের ভেতর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হবার স্বপ্ন দেখেছিলো। কোলকাতার বিপরীতে ঢাকার উত্থানকে স্বাগত জানিয়েছিলো। ঐতিহাসিক স্মৃতিবাহী, সময়ের বাঁক ঘুরানো সেই বঙ্গভঙ্গ দিবস উপলক্ষে জাতির স্বার্থে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমন্বয়ে একটি সমৃদ্ধ স্মারক প্রকাশনাকে 'বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র' দায়িত্ব ভেবেছে।

এ দায় বোধই ৯২ বছর পর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় দাঁড়িয়ে বঙ্গভঙ্গ ও এর প্রেক্ষাপট, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ-এর ইতিহাস পরিক্রমায় ধারাবাহিকতা খতিয়ে দেখার প্রেরণা যুগিয়েছে। বর্তমান স্মারক এই উদ্যোগের পথে একটি বিশেষ প্রকাশনা কর্মসূচী।

দেশের খ্যাতিমান ঐতিহ্যপ্রেমী ও শেকড় সন্ধানী লেখক ও ইতিহাসবেত্তাদের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিত-প্রেক্ষাপট, তৎকালীন সমাজচিত্র, পূর্ব বাংলার জনগণের আকুতি, আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের স্বরূপ, ঢাকা-কোলকাতার বৈষম্য, বঙ্গভঙ্গের ফলাফল এবং রদের প্রতিক্রিয়া– প্রভৃতি বিষয়ের উপর লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধই আমরা প্রকাশের বিবেচনায় এনেছি।

বঙ্গভঙ্গ নামে যে বিষয় ও প্রাসঙ্গিক সময়টিকে চিহ্নিত করা হয় কার্যত তা কি বঙ্গভঙ্গ ছিলো? সত্যের খাতিরে তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় ১৯০৫ সালে

www.pathagar.com

বৃটিশ কর্তৃত্বে বাংলাদেশ ও এর লাগোয়া অঞ্চল নিয়ে প্রশাসনিক বিভাগ নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। বঙ্গ যদি বিভক্তই ধরা হবে তা হয়েছে '৪৭-এর দেশ বিভাগের সময়-কংগ্রেসের ইচ্ছায় মুসলিম লীগের সম্মতিতে।

হিন্দু ও কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক সত্য লুকাবার চেষ্টা করলেও এ সময়ের ইতিহাস এতই জীবন্ত যে, প্রকৃত সত্য জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। তাই আমরা কোন অনুমান-নির্ভর না হয়েও একটি অখণ্ড– ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরার ক্ষেত্রে কোন উপাদানের অভাব বোধ করিনি। ঐতিহাসিক সত্য তথ্য তুলে ধরার জন্যে আমরা নির্মোহ ইতিহাসকে ক'জন ঐতিহাসিকের নিজস্ব প্রকাশনা থেকে হুবহু প্রকাশ করেছি। প্রকাশনার কলেবর বৃদ্ধি না করার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সকল ঐতিহাসিক-এর পূর্ণাঙ্গ লেখা তুলে ধরতে পারিনি। অংশবিশেষ প্রকাশ করেছি। যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে, ততটুকুতে সম্পাদনার নামে কলম চালাবার দৃষ্টতা প্রদর্শন করিনি।

এছাড়া প্রকাশিত প্রচুর বই থেকে আমরা শুধুমাত্র প্রামাণ্য অংশটুকু নিয়েছি। যাঁদের প্রকাশনা থেকে আমরা কিছু অংশ প্রবন্ধ-নিবন্ধ হিসেবে প্রকাশ করেছি, কিংবা রেফারেন্স আকারে তুলে ধরেছি তাঁদের অনেকের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে পারিনি। সৌজন্যবোধ প্রদর্শনের তাগিদে অনুমতি নেয়ার প্রবল ইচ্ছা ও তাড়া থাকার পরও আমরা সময় করতে পারিনি। এ জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ বিষয়ে প্রচুর লেখা থেকে আমরা যা নিয়েছি, তা ইতিহাসের প্রয়োজনে। দেশের শেকড় সন্ধানী ঐতিহ্যানুরাগী ইতিহাস বিষয়ক লেখকের সংখ্যা প্রচুর। এ ক্ষেত্রে আমরা তাৎক্ষণিক নাগালের ভেতর যে ক'জনকে পেয়েছি, তাড়া দিয়ে লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছি, শুধু তাদের লেখাই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, দেশের প্রায় সকল লোকই এ বিষয়ে উৎসাহী। কারণ আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির যে দিকেই যাওয়া যাক না কেন বিগত একশ' বছরের ইতিহাস ঘুরে-ফিরে আসবেই। সে ক্ষেত্রে 'বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ' ইতিহাসের বাঁক ঘুরানো একটি রাজপথ।

নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু যে পরিমাণ অপরিহার্য বিবেচিত হয়, সেই তুলনায় আমাদের উপস্থাপনা হয়তো পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক মনে হবে না। আমরা সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। প্রতিকূলতা অনেক। যা হয়নি অথচ হওয়ার প্রয়োজন ছিল-এমন একটি অভাববোধের দায় আমাদেরও আছে। এই অভাববোধ আমাদেরকে সদা-সতত-সর্বত্র নতুন নতুন কর্মসূচীর প্রেরণা যোগাক-সকলের কাছে এ দোয়া চাই। আর মহান আল্লাহ্‌র কাছে চাই সামগ্রিক সাহায্য।

১৬ অক্টোবর, ১৯৯৭

মাসুদ মজুমদার
খন্দকার আবদুল মোমেন
আবদুল ওয়াহিদ

www.pathagar.com

বাংলা ভাগ হয় নাই

আবুল মনসুর আহমদ

তেমনভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলার মাটি বা মানুষ কোনোটাই ভাগ হয় নাই। কোনও বস্তু দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ হইবার পর বিভক্ত অংশগুলির উভয়ে পূর্ব নাম ও পরিচয় বজায় রাখিলেই বলা যায় বস্তুটি বিভক্ত হইয়াছে। দেশ ভাগ হওয়া সম্বন্ধেও একথা সত্য। এই অর্থে জার্মানি, কোরিয়া ও ভিয়েৎনাম ইত্যাদি দেশ ভাগ হইয়াছে বলা যায়। কারণ বিভক্ত অংশসমূহ তাদের পূর্ব নাম ও পরিচিতি বহন করিতেছে। ঐ সব দেশের মানুষ সম্পর্কেও এই কথা সত্য। তারাও তাদের জাতীয় পূর্ব নাম ও পরিতিচি দাবি করিতেছে। বিশ্ববাসী তা স্বীকারও করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও না। ১৯৪৭ সালে ইংরাজ-শাসিত ইন্ডিয়া বাটোয়ারা হইয়া যে দুইটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাকে ভারত বা ইন্ডিয়ার দ্বিধাবিভক্তি বলা যায় না। কারণ সে বাটোয়ারায় জার্মানি, কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের মত ইন্ডিয়া বা ভারত নামের দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। ইন্ডিয়া বা ভারত নামের একটি রাষ্ট্রই ছিল আগের মতই। শুধু পূর্বেকার ইন্ডিয়ার কতকাংশ কাটিয়া পাকিস্তান নামে একটি নয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। ওটাকে ইন্ডিয়া বা ভারত বলা চলে না। পূর্বতন ভারতের সীমা পরিবর্তন ও আকার ক্ষুদ্রকরণ বলা যায় মাত্র।

বাংলাদেশের ব্যাপারটাও তাই। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে যা ঘটিয়াছিল, সেটা আজকার আলোচনার জন্য অবান্তর। দুই কারণে। প্রথম কারণ ঐ সময়ে বাংলাদেশের বরাতে যা ঘটিয়াছিল, তা হইয়াছিল এ দেশের মেজরিটির দাবির লাহোর-প্রস্তাবের খেলাফে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, লাহোর প্রস্তাবের সে ব্যতিক্রম এখন দূরীভূত হইয়াছে। বাংলাদেশ আজ লাহোর প্রস্তাবের দাবির মতই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছে। কাজেই বাংলাদেশের তথাকথিত বিভক্তির বিচার করিতে হইবে ১৯৪৭ সালের রূপ ও চরিত্র দিয়া নয়। আজিকার রূপ ও চরিত্র দিয়া।

www.pathagar.com

এই দিক হইতে বিচার করিলে ১৯৪৭ সালের ঘটনা বাংলা বিভক্তি নয়। সীমা পরিবর্তন মাত্র। সীমা পরিবর্তনে আকার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাকে বাংলা বিভক্তি বলা যায় না। স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলার দেহ ও আকারের বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। কখনো বা রাজমহল, পূর্ণিয়া, সিলেট, গোয়ালপাড়া বাংলাদেশ হইতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। কোনো-কোনোটা আবার ফেরত আসিয়াছে। এর কোনোটাকেই বাংলা বিভাগ বলা হয় নাই। ১৯০৫ সালের পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টিকে বাংলা বিভাগ বলা গেলেও ১৯৪৭ সালের ওটাকে বাংলা বিভাগ বলা চলে না। বাংলাদেশের মাইনরিটি স্বাধীন ইচ্ছায় তাদের এক অংশ বাংলাদেশের মাটির খানিকটা অংশ লইয়া বৃহত্তর ভূখন্ড ভারতে এবং অধিকতর মহান ভারতীয় জাতিতে মিশিয়া গিয়াছে।

এই ঘটনা বাংগালী জাতিত্বের বরাতে যা ঘটিয়াছে বাংলাদেশের আমিত্ব ও ব্যক্তিত্বের ভাগ্যেও তা-ই ঘটিয়াছে। কাজেই ব্যাপারটা বোঝা যত কঠিন মনে হয়, আসলে তত কঠিন নয়। ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় ভারতের 'আমিত্ব' 'বক্তিত্ব সুতরাং 'জাতিত্ব'ও ভারতেই বিদ্যমান ছিল। তার বিচ্ছিন্ন অংশ 'পাকিস্তান' বা বাংলাদেশে ভারতের সে 'আমিত্ব' 'ব্যক্তিত্ব' বা 'জাতিত্বে'র কোনও অংশই আসে নাই। বাংলাদেশের বেলায়ও তাই ঘটিয়াছে। ব্যক্তির 'আমিত্বের' মতই জাতির 'আমিত্ব'ও অবিভাজ্য। মানুষের দেহ খন্ডিত হইলে যে কোনও খন্ডের সাথে 'আমিত্ব' যায় না। 'আমার মাথা' 'আমার হাত' 'আমার পা' ও 'আমার অন্তরে'র মতই দেশের 'আমিত্ব'ও তার দেহ-খন্ড হইতে স্বতন্ত্র থাকে। ব্যক্তির মতই দেশেরও 'আমিত্বে'র সাথে থাকে তার আত্মা। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় বাংলার আমিত্ব' পড়িয়াছে তৎকালীন পূর্ব-বাংলার, আজিকার বাংলাদেশে। ঐ সংগে বাংলার জাতীয় আত্মাও আসিয়াছে এখানেই। আজিকার বাংলাদেশেই তাই সমগ্র বাংলা।

ইতিহাসের বাংলার অতীতের সকল সীমা পরিবর্তনেও যেমন বাংলার 'আমিত্ব' সুতরাং তার আত্মা, আজিকার বাংলাদেশের ভূখন্ডেই ছিল, আজও তেমনি তার আত্মা এখানেই বিরাজ করিতেছে।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ

এম এ রহিম

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ বাংলাদেশ তথা ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়, ভারতের রাজনৈতিক জীবনে তা এক বিরাট ও সুদূরপ্রসারী আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রধানত শাসনতান্ত্রিক কারণে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল। বাংলাদেশ তখন বৃটিশ ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রদেশ ছিল, বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা এ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর আয়তন ১,৭৯,০০০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৭৯,০০০,০০০ ছিল। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ একজন ছোটলাটের শাসনাধীন ছিল। যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকায় ছোটলাট প্রদেশের পূর্বাঞ্চল দেখাশুনা করতে পারতেন না। পাঁচ বছর কার্যকালের মধ্যে একবারও তাঁর পক্ষে পূর্বাঞ্চল পরিদর্শন সম্ভব হত না। এ জন্য এ অঞ্চলের জেলাগুলোর উন্নতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়ত না। ফলে, এর অধিবাসীদের উন্নতির সুব্যবস্থা হতে পারত না।

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই কমিটি প্রকাশ করে যে, বিরাট বাংলা প্রদেশের শাসন ব্যাপারে যে অসুবিধা বিদ্যমান আছে তা দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। ১৮৬৭ সালে বাংলার ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে ও ১৮৭২ সালে স্যার জন কেম্পবেল অভিযোগ করেন যে, এত বড় প্রদেশের শাসনভার একজনের পক্ষে বহন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর ফলে শ্রীহট্ট, কাচার ও গোয়ালপাড়া একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। এর পরও এই বিস্তীর্ণ প্রদেশের শাসন ব্যাপারে অসুবিধা থেকে যায় এবং সরকারী মহল হতে ১৮৯২ সালে ও আবার ১৮৯৬ সালে সুপারিশ করা হয় যে, আসাম ও পূর্ব বাংলার জেলাগুলো নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন কর উচিত। ১৯০১ সালে মধ্যপ্রদেশের চীফ এনড্রো ফ্রেজার উড়িষ্যা ভাষাভাষী অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এর উপর ভারত সরকারের কর্ম-সচিবগণ বিভিন্ন পরিকল্পনা সুপারিশ করেন। অবশেষে তাঁদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলো বড়লাট লর্ড কার্জনের নিকট উপস্থাপিত হয়। বড়লাট বিস্মিত

www.pathagar.com

হন যে, তাঁর অজ্ঞাতে বাংলাদেশ, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশের ভৌগোলিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হচ্ছে। এ হতে মনে হয় যে, শাসনতান্ত্রিক কারণে বহুদিন হতে বাংলাদেশ প্রদেশের ভৌগোলিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল এবং লর্ড কার্জনের অজ্ঞাতে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীগণ এই প্রদেশ বিভাগে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। বড়লাট তাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে ভারত সচিব লর্ড হেমিলটনের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেন।

এনড্রো ফ্রেজার শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ প্রদেশ বিভাগের সুপারিশ করেছিলেন। এটি বিভাগের পক্ষে তিনি রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, যদি ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে এই অঞ্চলের অশান্তি কমে যাবে এবং পূর্ব বাংলা হতে যে গুরুতর শাসন সমস্যার উদ্ভব হয় তা দূর হবে। এটি খুবই স্বাভাবিক যে, লর্ড কার্জন ফ্রেজারের উল্লেখিত রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথাও বিবেচনা করেছিলেন। ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয় আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। শিক্ষিত হিন্দুগণ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস মনে করে যে, বাঙালী জাতীয়তার উপর আঘাত করার উদ্দেশ্যে সরকার এই পরিকল্পনা রচনা করেছে। ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী রিজলী তাঁর মন্তব্যে বলেন, "কংগ্রেস মনে করে যে, বাংলাদেশ যুক্ত থাকলে এটি খুব শক্তিশালী হয়, বাংলাদেশ বিভক্ত হলে এর শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্নমুখী হয়ে পড়বে। এটি খুবই সত্য এবং এটিই হবে আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম সুফল।"

এ পরিকল্পনা মুসলমানদেরও মনঃপুত হয়নি। ১৯০৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ঢাকা সুহৃদ সংঘ এক সভায় আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলো নিয়ে (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার বাদ দিয়ে) একটি নতুন প্রদেশ গঠনের দাবী করে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তের জন্য পূর্ব বাংলা অঞ্চল পরিদর্শন করতে আসেন। ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ বড়লাটকে রাজকীয় আতিথেয়তা প্রদান করেন। এ সময় তিনি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার ব্যাপারে বড়লাটের নিকট মুসলমানদের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাগুলো আসামের সঙ্গে যুক্ত হলে এ অঞ্চলের মুসলমানদের বিশেষ উপকার হবে না। তিনি এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য একটি প্রদেশ দাবী করেন। পূর্ব বাংলা অঞ্চল পরিদর্শন করে লর্ড কার্জন উপলব্ধি করেন যে, বাংলাদেশ সরকারের শাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রেজারের পরিকল্পনার কিছুটা সম্প্রসারণ করা দরকার।

লর্ড কার্জন বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল ও আসাম নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ভারত সচিব ব্রডারিক এটি অনুমোদন করেন। বঙ্গভঙ্গের এ পরিকল্পনা ১৯০৫ সালের ১০ জুলাই প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলো নিয়ে (দার্জিলিং বাদ দিয়ে, কিন্তু মালদহ ও পার্বত্য ত্রিপুরা জেলাগুলো অন্তর্ভুক্ত করে) পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। এ নতুন প্রদেশের অয়তন ১,০৬,৫০৪ বর্গমাইল ও এর লোকসংখ্যা প্রায় ৩,১০০,০,০০০ ছিল। এর অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় ১৮,০০০,০০০ মুসলমান ও ১২,০০০,০০০ হিন্দু ছিল। পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় স্থাপিত হয়। নবগঠিত প্রদেশের জন্য একজন ছোটলাট, একটি ব্যবস্থাপক পরিষদ ও একটি রাজস্ব বোর্ডের ব্যবস্থা হয়। প্রদেশের বিচার বিভাগ কলকাতা হাইকোর্টের অধীনে রাখা হয়। পশ্চিম বাংলা পুরাতন বঙ্গদেশ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আয়তন ১,৪১,৫৮০ বর্গমাইল ও

www.pathagar.com

লোকসংখ্যা ৫,৪০,০০,০০০। এদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা ৪,২০,০০,০০০ ও মুসলমানদের সংখ্যা ৯০,০০,০০০ ছিল।

লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলাদেশ বিভাগ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ হলে সেখানকার অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসায় প্রভৃতির উন্নতির পথ সুগম হবে। তিনি আশা করেন যে, এই নতুন প্রদেশ কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের অন্যতম ঐশ্বর্যশালী প্রদেশে পরিণত হবে। এটি অস্বীকার করা যায় না যে, বাংলাদেশ বিভাগের পেছনে রাজনৈতিক কারণও বিদ্যমান ছিল। ভারতের রাজনীতিতে তখন বাঙালী হিন্দুদের খুব প্রভাব ছিল। বাংলাদেশ বিভক্ত করে ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালীদের প্রভাব নষ্ট করা কার্জনের পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাছাড়া তিনি মুসলমানদেরকে হিন্দুদের থেকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন যাতে হিন্দুগণ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দাবী করতে না পারে। ১৯০০ সালে লর্ড কার্জন লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস যে, কংগ্রেস এখন পতনের মুখে এসে পড়েছে ; এবং ভারতে থাকাকালে কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা আমার একটি বড় আকাংখা।" ফ্রেজার মন্তব্য করেছিলেন যে, ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হলে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের উপর হতে হিন্দু নেতাদের প্রভাব লোপ পাবে।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ বিভাগ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। স্যার বেম্পফিলড ফুলার পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট নিযুক্ত হন। ঢাকায় তাঁর বিপুল সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়। বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে নবাব সলিমুল্লাহ লিখেছিলেন যে, নবপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা আছে। জনসাধারণ ক্রমশঃ বুঝতে পারছে যে, পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের জন্য বাংলাদেশ বিভাগ করা হয়েছে। এই প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ; এই কারণে তারা সরকারের নিকট হতে বিশেষ বিবেচনা লাভ করবে। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়েছে। এতদিন দরিদ্র মুসলমান যুবকরা কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষায় পাস করেও উপযুক্ত চাকরি পেত না, নতুন প্রদেশে তারা উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছে। ফলে দরিদ্র পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়া শিখাতে উৎসাহ পাচ্ছে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দুদের আন্দোলনের উল্লেখ করে নবাব সলিমুল্লাহ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বলেন যে, হিন্দুগণ কালক্রমে বুঝতে পারবে যে, পূর্ব বাংলা প্রদেশ স্থাপিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীগণ বিভক্ত হয়নি ; বরং দু'টি সহোদরা প্রদেশের শাসন, শিক্ষা প্রভৃতি উন্নতির সুব্যবস্থা হবে এবং বাঙালী জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সাম্বাৎসরিক উপলক্ষে ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম ইরা পত্রিকা লিখেছে যে, নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পূর্বাঞ্চলের নিম্নলিখিত সুবিধা হয়েছে ঃ (১) ঢাকা নগরের পুনর্জন্ম ও চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি ; (২) নদী ও খালগুলোর উন্নতি এবং রেল লাইনের সম্প্রসারণ ও চট্টগ্রামের সঙ্গে এদের সংযোগ স্থাপন ; (৩) নতুন প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার ফলে জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের পক্ষে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সুযোগ-সুবিধা ; (৪) সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা ও জনসাধারণের জানমালের অধিকতর নিরাপত্তা ; (৫) পূর্ব বাংলার শিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সংস্পর্শে আসায় অনুন্নত আসামের অধিবাসীদের উপকার ; (৬) পূর্ব বাংলার জন্য কর্মদক্ষ পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা ; (৭) প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ; (৮) এক বছরের অভিজ্ঞতা হতে দেখা

www.pathagar.com

যাচ্ছে যে, জনসাধারণ এখন প্রদেশের প্রধান কর্মকর্তার সংস্পর্শে আসতে পারে এবং পূর্বে এটি সম্ভব ছিল না।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ঃ হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং তাঁরা এর বিরুদ্ধে তুমূল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁরা একে জাতীয় সংহতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আঘাত বলে বর্ণনা করেন। তাঁরা একে মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব এবং মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণ বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হবে ; বাঙালী হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হবে। আমাদেরকে নিজেদের দেশে আগন্তুকের মত থাকতে হবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি। আইনজীবিগণ বঙ্গভঙ্গের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। বুদ্ধিজীবীরা একে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক বলে অভিমত প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক নেতাগণ সমালোচনা করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি রোধ করার জন্য এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার বাংলাদেশ বিভাগ করেছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, বৃটিশ শাসক ও মুসলমানদের মধ্যে মিত্রতার ফলে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়েছে।

খ্যাতনামা নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন যে, বাংলাদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে। কলকাতার হিন্দুরা ১৬ অক্টোবর জাতীয় শোক দিবস পালন করে। সভায় নেতাগণ বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কংগ্রেস ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করে। বিলাতী দ্রব্য বয়কট করা হয়। বিলাতী দ্রব্যে প্রকাশ্যে আগুন লাগানো হয়। ছাত্ররা সরকারী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করে। জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয় ; কিন্তু এটি কার্যকরী হয়নি। কংগ্রেসের মারাঠী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তা সুসংহত করার জন্য মারাঠাদের নায়ক শিবাজীকে ভারতের সকল হিন্দুদের জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। দেশের সর্বত্র শিবাজীর জন্মবার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিপালিত হয়। সভায় সভায় কংগ্রেসের নেতাগণ মুসলমান সম্রাটের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রামের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে হিন্দুদের জাতীয় বীর ও তাঁর সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। এতদ্ব্যতীত, এ সময় বাংলাদশের হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা গড়ে উঠে। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদেরকে হত্যা করে বঙ্গভঙ্গ রদ করা এর উদ্দেশ্য ছিল।

www.pathagar.com

বঙ্গ বিভাগ

আবদুল মওদুদ

বঙ্গ বিভাগ আলোচ্য কালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা এবং কার্জনের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। নিন্দা ও প্রশংসা সমভাবে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে এ কর্মের জন্যে। হিন্দু সম্প্রদায় তাঁকে অভিশাপ দিয়েছে 'বঙ্গমাতার' অঙ্গচ্ছেদের জন্যে। আর মুসলমানরা তাঁর প্রশংসা করেছে তাদের জীবন-মরণ সমস্যাটার বাস্তব সমাধানের জন্যে এবং তাদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ পরিষ্কারের জন্যে।

ব্রিটিশের বাংলা প্রেসিডেন্সি প্রশাসনিক দিক দিয়ে একটা সমস্যা প্রদেশ হয়ে উঠেছিল। তার প্রশাসনিক গুরুত্ব আরম্ভ হয় ১৭৬৪ সাল থেকে, যখন ক্লাইভ বাদশাহ শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করেন। তারপর বাংলাকে কেন্দ্র করে এবং কলকাতাকে প্রশাসনিক স্নায়ুকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করে চললো ভারতের বুকে ইংরেজের অধিকার বিস্তার। উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে ইংরেজের ভারত বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ। ভারতের এ-প্রান্তে সে-প্রান্তে যে সব স্বাধীন রাজ্য বিরাজ করতো বিশাল জমিদারীর ছিটমহলের মতো, বিশেষত উত্তর-পশ্চিম ভারতে যে-দুএকজন দেশীয় রাজা-আমীর সদম্ভে মাথা উঁচু করে তখনও দাঁড়িয়েছিলেন, ইংরেজের সাময়িক বল ও ততোধিক কুটবুদ্ধি সে সকল গ্রাস ও সে সব রাজা-আমীরের মস্তক চূর্ণকরণে ব্যাপৃত। কিন্তু যে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ইতিমধ্যেই অধিকৃত হয়েছিল, সেখানে চলেছিল বিশাল সাম্রাজ্যিক ভিত্তি স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনা। ১৮১০ সালের মধ্যে দিল্লী ও শিখ সীমান্ত পর্যন্ত হয়েছিল এ অধিকারের ব্যাপ্তি। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী আগরাকে রাজধানী করে সৃষ্ট হয়েছিল ১৮৩৬ সালের চার্টার আইন বলে। তখন বাংলা পুনরায় হয়ে পড়ে মোগল বাদশাহী আমলের বাংলা-বিহার উড়িষ্যা সুবাসমূহের প্রধান কেন্দ্র। ১৮৫৪ সালে এ সব অঞ্চলে একজন লেফটেনান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন ভারত-সাম্রাজ্য

www.pathagar.com

বিধয়ক গভর্ণর জেনারেলের অধীনে। বলা বাহুল্য, দু'জন প্রশাসনিক অধিপতির অধিবাস ছিল কলকাতাতেই। ১৮৭৪ সালে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে একজন চীফ কমিশনারের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে পশ্চিমে ঘাগরা ও গোদাবরীর তীর পর্যন্ত বিশাল অঞ্চলের প্রশাসনিক সমস্যা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে প্রবল আকার ধারণ করে। লোকসংখ্যা ওঠে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। পূর্ব-বাংলার বিচ্ছিন্নাবস্থা, যোগাযোগের দারুণ অসুবিধা প্রভৃতির অজুহাতে এদিকটায় দেড়শো বছরে কোনও উন্নতি হয়নি, অথচ পশ্চিম বাংলা ধনে-সম্পদে শিক্ষার প্রসারে ভারতের স্বর্গখন্ডে পরিণত হয়ে চলেছে। পূর্ব-বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাধিক এবং পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা, এজন্যে পার্থক্যটা আরও প্রকটভাবেই ধরা পড়তো। অথচ পূর্ব-বাংলাই ছিল যুক্ত বাংলার বৃহদাংশ-আয়তনে, লোকসংখ্যায়, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভারে। কিন্তু তখন পূর্ব বাংলার অস্তিত্ব বিবেচিত হতো। মাত্র পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে, কলকাতার উন্নয়ন ও সুখৈশ্বর্যের নির্ভরশীল পাদপীঠ হিসেবে।

কার্জনের পূর্বে প্রশাসনিক সমস্যার দিকটা বহুবার বিবেচিত হয়েছে এবং বহু পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু কোনও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সৎসাহস কারও হয়নি। কার্জন সেগুলো স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি আসাম এবং চট্টগ্রামসহ পনেরটা জিলা নিয়ে পূর্ববংগ ও আসাম নামাংকিত নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর।

এ ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে বহু মত প্রকাশিত হয়েছে। কার্জন কোনও মুসলিম-প্রীতির নেশায় এ কাজ করেননি। প্রশাসনিক সুবিধা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই তিনি চালিত হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত অঞ্চলটি পৃথক করে পৃথক প্রশাসনিক বন্দোবস্ত করা হয়। পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরা ও পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা অতঃপর ঘনিষ্ঠভাবে গঠিত হয়ে নিজ নিজ উন্নতি ও জাতীয় জীবনের বিকাশক্ষেত্র খুঁজে পাবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ অভাব-অভিযোগ দূরীকরণ ও বিশিষ্ট সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের সুযোগ লাভ করবে।

কার্জন একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেননি ঃ হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর লাভ-লোকসান ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টা এবং এটিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তার উন্মাদনা ও আবেগ সৃষ্টির প্রবণতার কথাও। তিনি বর্ণ-হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয়তাবোধের সততায় সন্দেহ পোষণ করতেন। ১৯০০ সালে তিনি একবার বলেছিলেনঃ আমার বিশ্বাস, কংগ্রেস এখনি পতনোন্মুখ এবং আমার ভারতে অবস্থানকালে তার শান্তিপূর্ণ সমাধি রচনা করে যাব। এ জন্যে বাংলার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় যখন স্বার্থের তাগিদে এ কাজটিকে 'বঙ্গমাতার' অঙ্গচ্ছেদ বলে রূপ দিয়ে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে এবং প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকে যে, এ কাজের ফলে বাংলার (অর্থাৎ হিন্দু বাংলার) জাগরণ ও উন্নতি ব্যাহত হয়ে তাদের স্বাসরোধ করা হবে, তখন কার্জন সেসত্রে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে দৈব বাণীলব্ধ নির্দেশের মতো বঙ্গ-বিভাগ সম্পূর্ণ করেন।

হিন্দু ঐতিহাসিক মিশ্র বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

এ বিষয়ে কার্জন প্রশাসনিক বিবেচনায় চালিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়। ইউরোপীয় প্লান্টারদের দুর্ব্যবহার এবং তাদের কারণে বিচারে তারতম্য হওয়ায় তিনি উত্ত্যক্ত হয়ে ১৯০২ সালে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করেন সংস্কারের নীতি নির্ধারণের জন্যে। কমিশন সুপারিশ করে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করার। বাংলার পূর্বাঞ্চলের জিলাসমূহ বহু দশক ধরে অবহেলা পাচ্ছে এবং দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের নিরাপত্তা হেতু এসব ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পুলিশ ব্যবস্থা একেবারে অকিঞ্চিৎকর-এসব দিকে দৃষ্টিপাত

www.pathagar.com

করে কার্জন দুটি কাজ করেন। তিনি প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে শাসনকর্ম আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করেন এবং শাসন সৌকর্যের হেতু প্রদেশটি দু'ভাগ করেন। কিন্তু এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বার্থে দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সকলেই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও সংকুচিত হয়ে গেল; বিশেষত তখন বিধানসভাগুলির সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ভিতিচক্ষে দেখলো, উভয় বাংলার বিধানসভায় তারা একেবারে সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে- পূর্ব বাংলায় অসমীয়া ও মুসলমানদের দ্বারা এবং পশ্চিম বাংলায় বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা। এ জন্যে তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠলো।

এবার একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, যিনি পূর্ব-বাংলার মানুষকে এই বিভাগক্ষণে দেখে বলেছিলেন, 'তাদের এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারে, তাঁর বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

আগেকার বঙ্গদেশ এতো বৃহদায়তন ছিল যে, একটি প্রাদেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা' সুষ্ঠুভাবে শাসন করা অত্যন্ত গুরুভার বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল এবং এর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ ছিল বলে প্রদেশের সাধারণ অগ্রগতির সাথে তাল রক্ষা করতে পারছিল না। সংবাদপত্রও পূর্বাঞ্চলের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কাজেই এই অঞ্চলের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সরকারের যথাযথ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। বস্তুত, বঙ্গ-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল, দ্বি-বিধ প্রথমতঃ বঙ্গদেশের বাড়তি অংশটি কেটে নিয়ে এর অবাঞ্ছিত গুরুভার লাঘব করা। দ্বিতীয়তঃ এর জন্য একটি স্থানীয় বলিষ্ঠ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা-যাতে করে পূর্ব-বাংলার স্বার্থ অধিকতর নিষ্ঠার সাথে রক্ষিত হয় ও এর সাধারণ অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। জাতীয় বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেই বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ও গৃহীত হয়েছেল। আগেকার প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষের উপর। অথচ মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর হিন্দু সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি উত্থাপিত করা হয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই যে, যে সব আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি একটি প্রাচীন প্রদেশকে পুরাতন বন্ধনডোরে বেঁধে রেখেছিল, এই ব্যবস্থার দ্বারা সেগুলোকে ছিন্ন করা হয়েছে এবং প্রদেশটিকে খন্ড বিখন্ড করা হয়েছে। বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যমাত্র জ্ঞানও যাঁর আছে, তাঁর কাছেই এ-যুক্তির অসারতা ধরা পড়বে। মুসলমান শাসনামলে বঙ্গদেশে কোন ঐক্য এবং এর দীর্ঘস্থায়ী কোন আয়তন ছিল না। পর পর যে সব সুব্যবহার এদেশ শাসনের ভার পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই রাজধানীও পরিবর্তন করেছেন। তাই শুধু নয়-তৎকালে এ প্রদেশ যেভাবে গঠিত ছিল, তার সাথে বৃটিশ আমলের বাংলা প্রদেশের কোন সাদৃশ্যই নেই। সে যুগে প্রায়শই বিহার ও উড়িষ্যার জন্য সরাসরি দিল্লী থেকে পৃথকভাবে সুবাহদার নিযুক্ত করা হতো। ছোট নাগপুর ও দামন-ই-কোহ্, তখনো প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে বিজিত হয়নি। আবার খোদ্ বাংলা প্রদেশকে নায়েব-নাযিমদের (Deputy Governor) অধীনে ক্রমাগত বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের উপরে ছিলেন সুবাহদার। একজন লেফটন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার আকার বা গঠনবিন্যাস সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর একটি হাল-আমলের পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনা বৃটিশ শাসনকাল দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্যকরী করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলার ঐ অবয়বের বয়স ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবরে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের দিনে একশত বৎসরেরও অনেক কম।

www.pathagar.com

বস্তুত, বাংলা-বিভাগ সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের অভিনন্দন লাভ করেছে। এর দ্বারা যে অদূর-ভবিষ্যতে তাদের প্রভূত কল্যাণ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব-বাংলায় প্রায় সকল অঞ্চলের মুসলমানগণ নিরতিশয় অজ্ঞ এবং পশ্চাদ্‌পদ। আধুনিক অবস্থার সাথে হিন্দুরা যেমন ত্বরিতগতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে, তা' তারা পারেনি বা সে দিকে কোন আগ্রহও দেখায়নি। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই হিন্দুদের হাতে। আন্দোলনের কুশলতা জানা না থাকায় ও নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি কিভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়, তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন থাকার ফলে অপরিহার্যরূপে মুসলমানেরা পেছনে পড়ে থাকে। এখন এই নয়া প্রদেশে তারা হবে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই প্রদেশের আয়তন ১,৬০,০০০ বর্গমাইল। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ন নবগঠিত প্রদেশটিতে তারা স্থানীয় শাসকদের কাছে পূর্ণ বিবেচনা লাভ করবে।

এবার উদ্ধৃত করা যায় একজন মহাপ্রাণ বাঙালী হিন্দুর অভিমত, যার দৃষ্টিভঙ্গি স্বার্থের ধুম্রজালে বিভ্রান্ত হয়নি এবং বহু বছর পূর্ব-বাংলায় বাস করে যিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যাগুলো সম্বন্ধ প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর নাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি বংগভংগ সম্বন্ধে নিজের 'আত্মজীবনীতে বলেছেন ঃ

আমি বংগভংগ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস, এতদ্বারা পশ্চাদ্‌পদ অনুন্নত ও নানা অভাবগ্রস্ত পূর্ব-বংগের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী এবেং পূর্ববংগের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্যস্থান হইতে চলিল, পূর্ববংগবাসীদিগের অর্থাগমের পথ স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আসাম প্রদেশও পূর্ববংগের সংগে ঘনিষ্ঠ সূত্রবদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহ্‌লাদ হইয়াছে।

বংগভংগ পূর্ব-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে স্বতঃফূর্তভাবে আনন্দের জোয়ার এনেছিল। ২২শে অক্টোবর ঢাকার মুসলমানরা এক মহতী সভায় মিলিত হয়ে বংগভংগের দরুন পরিবর্তিত শাসন আমলে কী সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা করেছিলঃ 'বংগভংগের ফলে এতকাল যেসব উৎপীড়ন তারা হিন্দুদের নিকট থেকে সহ্য করেছে, সে সবের মূলোচ্ছেদ হবে।' ১৯০৬ সালে বংগভংগরে প্রথম বার্ষিকী উৎসবে মুসলমানরা মিলিত হয়ে শোকরানা আদায় করে এবং ভারত সচিব এটিকে 'সেটেল্ড ফ্যাক্ট' ঘোষণা করায় তাঁকে অভিনন্দন জানায়। ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগ একটি সংকল্প গ্রহণ করে এই আশা প্রকাশ করে যে, বৃটিশ সরকার এই 'নিশ্চিত ব্যবস্থার সুদৃঢ় থাকবেন।'

বাংলা-বিভাগ উপ-মহাদেশের একটি ক্রান্তিকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা। শাসক ইংরেজরা এটাকে দেখেছিল প্রশাসনিক সৌকর্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব-বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা দেখেছিল তাদের ভাগ্যোদয়ের প্রথম প্রভাব হিসেবে, আর শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় দেখেছিল তাদের দেড়শো বছরের নির্মিত আর্থিক ও রাজনৈতিক ৬ন্নয়ন ক্ষেত্রের সমাধি রচনা হিসেবে : এ জন্যেই শিক্ষিত হিন্দুদের আঁতে ঘা লেগেছিল বাংলা বিভাগ কর্মে এবং সর্বশক্তি দিয়ে এটিকে রোধ করতে চেষ্টা করেছিল।

www.pathagar.com

সময়তো চলে যায়

সৈয়দ আলী আহসান

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢাকায় ফিরতে পারিনি। জানুয়ারী মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে আমাকে ফিরতে হয়েছিল। সবাই যখন চলে গেল তখন আমাকে ফিরতে হয়েছিল। সবাই যখন চলে গেল তখন আমাকে কয়েকটি কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল। একটি হচ্ছে ঃ সুতারকিন স্ট্রীটে বাংলাদেশ আরকাইভসের কাগজপত্র গুছিয়ে নিজের কাছে রাখা। এ কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে আমার কয়েকদিন সময় লেগেছিল। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর এ ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। আবু জাফর তখন ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বর্তমানে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছে। আরকাইভসের কাজে আবু জাফর অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং সততার পরিচয় দিয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে সে পরবর্তীতে গবেষণার কাজে লিপ্ত থাকবে এবং কিছু গ্রন্থ রচনা করবে। কিন্তু কেন যেন সে এসব দিকে বেশী মনোযোগ দিচ্ছে না। এক সময় যখন সে আমার সঙ্গে ছিল তখন আমার 'ইডিপাস' নাটকের জন্য সফোক্লিস সংক্রান্ত একটি ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ সে করে দিয়েছিল। সেটি আমার গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত আছে। আরকাইভসের সঙ্গে ইতিহাসে অনার্সের ছাত্র আমার বড় ছেলেও যুক্ত ছিল এবং কিছু তরুণ ছাত্রকর্মীও যুক্ত ছিল। আরকাইভসের কাগজপত্র আমি গুছিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু কিছু বই, একটি টেপরেকর্ডার এবং একটি টাইপরাইটার সুতারকিন স্ট্রীট থেকেই উধাও হয়ে যায়। সেগুলোর সন্ধান আর আমি পাইনি।

প্রায় সবাই যখন কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে গেল, তখন আমি কলকাতায় যারা আমাদের সাহায্য করেছিল, তাদের কারও কারও সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলাম। তাদের মাঝে একজন হচ্ছেন মৈত্রেয়ী দেবী। তিনি থাকতেন পাম এভিনিউতে, ব্যারিস্টার সালামের বাসার উল্টো দিকের গলিতে।

www.pathagar.com

তখন আমি প্রায়ই পায়ে হেঁটে চলতাম, উপায়ও ছিল না। ঢাকায় গিয়ে যেন অর্থকড়ির বিপাকে না পড়ি সেজন্য কিছু টাকাও সঞ্চয় করতে হয়েছিল। সুতরাং তখন পায়ে হেঁটেই চলতাম। একদিন সময় করে ব্যারিস্টার সালামের বাসায় গেলাম। সালাম তখন বাসায় ছিল না। তার বাবুর্চি আমাকে রাতে খেয়ে যেতে বলল। বাবুর্চি বলল যে, সালাম তাকে বলে রেখেছে, আমি যদি কখনও আসি এবং যখনই আসি আমাকে না খাইয়ে যেন বিদায় করা না হয়। সালাম আমার ছাত্র ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার প্রচুর সহানুভূতি আমি পেয়েছি। অর্থসাহায্য সে করেনি, আমি নেব না বলে। তবে একদিন একজোড়া স্যান্ডেল এবং একটি দামী লুঙ্গি সে কিনে দিয়েছিল। একটি মোড়কের মধ্যে পুরে তার ওপর আমার নাম লিখে আমার বিছানার ওপর রেখে দিয়েছিল। আমি জিনিসগুলো ব্যবহার করেছি, কিন্তু এ নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা কিছু হয়নি।

সালামের ওখান থেকে আমি মৈত্রেয়ী দেবীর বাসায় গেলাম। ফ্লাটবাড়ি–তিনি উপর তলায় থাকতেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে বারান্দায় দেখলাম, তাঁর স্বামী ডঃ সেনও সেখানে দাঁড়িয়ে। মৈত্রেয়ী দেবী বালতিতে করে একটি ছোট ছেলের মাথা ধোয়াচ্ছিলেন। সম্ভবত ছেলেটি তার নাতি। ডঃ সেন আমাকে ভিতরে এনে বসালেন এবং নিজেও আমার কাছে বসলেন। ভদ্রলোক ধীরস্থির প্রকৃতির, কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। কিছুক্ষণ পর মৈত্রেয়ী দেবী এলেন। আমি শুরুতেই বললাম, "আমি শিগগিরই ঢাকায় ফিরে যাব। আমার সঙ্গীরা প্রায় সবাই চলে গেছেন। আমি এখনও সবকিছু গুছিয়ে উঠতে পারিনি। আজ আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এসেছি। আপনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন, বিশেষ করে আমার জন্য। বিভিন্ন জায়গায় আমাকে নিয়ে গেছেন, আমাকে পরিচিত করিয়েছেন। আমার প্রতি মর্যাদা দেখিয়েছেন। আসলে তো আমার প্রতি নয়, বাংলাদেশের প্রতি। আপনার সঙ্গে হয়ত আর দেখা হবে না কখনও, তবে আপনার কথা চিরকাল মনে থাকবে। বাংলাদেশে যদি কখনও আসেন, দেখা হতে পারে।" মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, "ভারতের কথা কখনও ভুলবেন না। ভারতের ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকলে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব ছিল না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক্ষেত্রে আপনাদের জন্য যা করেছেন কখনও ভুলবার নয়।"

আমি বললাম, "ভারতের কথা অবশ্যই মনে রাখব, বিশেষ করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথা। তবে একটি কথা কি জানেন একটি স্বাধীনতার আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তখন শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ করা যায় না। আমরা কোন প্রকার সাহায্য না পেলেও সংগ্রাম করে যেতাম এবং একদিন না একদিন স্বাধীন হতাম। তবে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতার দাবী করাটা বোধহয় ঠিক নয়।"

কথা বলে আমি হাসলাম। মৈত্রেয়ী দেবী আমার কথায় মনে হল বিব্রতবোধ করলেন। তিনি বললেন, "আমি সে অর্থে বলিনি। আমি আপনাদের কল্যাণ চাই। আপনাদের সঙ্গে এতদিন কাজ করলাম। তাতে বন্ধু হিসেবে কিছু বলবার অধিকার তো আমার আছে। প্রথম থেকে আপনাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের সমর্থনে আমি ছিলাম, কোন ব্যক্তি কোন আদর্শকে যদি সমর্থন করে তাহলে সে আদর্শ কি করে বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে সে ভাবে।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি আমাদের সম্পর্কে এখন কি ভাবছেন?"

মৈত্রেয়ী দেবী বললেন, "দেখুন, পাকিস্তান একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল। তারা মৌলবাদের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে। এর ফলে আপনারা বিক্ষুব্ধ হলেন এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে আপনাদের রাষ্ট্রের একটি আদর্শ হিসেবে

www.pathagar.com

স্থির করেছেন। সেই আদর্শ যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, তাই আমি চাই।" পরে একটু হেসে বললেন, "দেখুন দেশটা যেন মুসলমানী দেশ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।"

মৈত্রেয়ী দেবীর শেষ কথায় আমি যেন চাবুকের আঘাত পেলাম। আমি কখনও কল্পনা করতে পারিনি তাঁর মত হিতৈষী মহিলা যিনি একটি প্রাজ্ঞ পরিবারের কন্যা এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা, তিনি এরকম মন্তব্য করতে পারেন। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। আমার ক্রোধকে প্রশমনের প্রয়োজন ছিল। আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আপনার শেষ কথায় আমি দুঃখ পেলাম। বাংলাদেশে যে সমস্ত লোকদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে, যেমন আমি ও ডঃ মল্লিক, আমরা আধুনিক পৃথিবীর মানুষ, আমরা ধর্মকে মানব সত্তার বিরোধী মনে করি না, বরঞ্চ বিশ্বাস করি যে, মানুষের জীবনে একটি ধর্মীয় প্রজ্ঞার স্থিতি না থাকলে মানুষ বিপর্যস্ত হয়। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে, ইসলাম মানুষে মানুষে বিরোধ শেখায় না এবং ইসলাম ধর্মের যথার্থ তাৎপর্যের মধ্যে মৌলবাদ বলে কিছু নেই। সুতরাং আমরা আমাদের দেশকে যথার্থ মানুষের দেশ হিসেবেই গড়ে তুলতে চাইব, যে মানুষ বিশ্বাসী ও অনুভূতিপরায়ণ। আপনাদের ভারত ঘোষণাপত্রে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, কিন্তু এখানে প্রতি বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। এসব দাঙ্গায় যারা নির্যাতিত হয় তারা হয় মুসলমান, অথবা নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। সুতরাং আপনারা ধর্মনিরপেক্ষতার গর্ব করতে পারেন না। আমি স্বীকার করি এবং বিশ্বাসও করি যে নেহেরু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও সাম্প্রদায়িক নন। কিন্তু ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আছে, যেটা বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলেও ছিল না। পাকিস্তান আমলে অবাঙ্গালীদের দ্বারা দাঙ্গার প্ররোচনা এসেছে এবং দাঙ্গা দু' একটি বেঁধেছেও, কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমানদের চেষ্টায় এসব দাঙ্গা বন্ধ করাও গেছে। আপনি আমাদের শুভ কামনা করুন, আমাদের জন্য আপনার সহানুভূতি আছে, বিশ্বাস করি। সে সহানুভূতিটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট।"

মৈত্রেয়ী দেবীর মুখকান্তি রক্তিম হল। তিনি বোধহয় এ ধরনের প্রতিবাদ শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুক্ষণ পর বললেন, "আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি পাকিস্তান আমলের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছিলেন, তার বেশী কিছু নয়।"

আমি হেসে বললাম, "আপনি মুসলমানি শব্দটি ব্যবহার করায় আমার মনে হয়েছিল আপনি হিন্দু হিসেবে কথা বলছেন, মানুষ হিসেবে নয়।"

www.pathagar.com

বঙ্গ বিভাগ ঃ রাজনৈতিক পদক্ষেপ

এমাজ উদ্দীন আহমদ

বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা অনেক বৃটিশ কর্মকর্তাদের লেখায়ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রিজলীর সহকারী স্টোকস্ লিখেছিলেনঃ

> "এ পরিকল্পনা এদিক থেকেও-আপত্তিকর এ জন্য যে, পূর্বাঞ্চলে বাংলার কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে, আবার পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশ বাংলার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। একদিকে উড়িয়া জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করা হচ্ছে, অন্যদিকে আবার বাংলায় জাতীয়তাবাদের দাবি অগ্রাহ্য করা হচ্ছে।"

১৯০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রিজলী তার প্রতিবেদন সমাপ্ত করেন। ফলে, বৃহত্তর বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের ক্ষমতা দ্বিধাবিভক্তসিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। "জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে"- এ যুক্তির উত্তরে রিজলী ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর বলেছিলেনঃ

> "বাঙ্গালী ভদ্রলোকরা সব সময় পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এতদিন পর্যন্ত ঢাকার নবাবদের প্রভাবের দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। [পূর্বাঞ্চলে] মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠন করার ফলে কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। যদি ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় তাহলে সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হবে"।

বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার প্রশাসনিক যুক্তির পক্ষে বলা হয়েছে (আর কার্জন নিজেও তা বলেছেন), ২০ বছর আগে থেকেই এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। এ প্রসংগে এটা উল্লেখ্য যে, অতীতে একইভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশাসনিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১৮৯২ সালে লুসাই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বৈরীভাব যখন বৃদ্ধি পায় আর যখন তাদের লুটতরাজ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠে তখন পূর্বাঞ্চলে

www.pathagar.com

উপজাতীয়দের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির জন্য গভর্নর জেনারেল ল্যান্সডাউন লুসাই অঞ্চল ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আসাম ছিল একটি ননরেগুলেশন প্রদেশ। এ প্রদেশের সাথে লুসাই অঞ্চল ও চট্টগ্রাম সংযুক্ত হলে ব্যক্তিগত শাসনের নিগড়ে সেখানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হবে। পরে যখন ঐ অঞ্চলে লুসাই উপজাতীয়দের আক্রমণের মাত্রা কমে আসে তখন সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত আর কার্যকরি হয়নি।

পূর্ব বাংলায়, বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য ত্রিপুরায় হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ওল্ডহ্যাম চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগের একাংশ আসামের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তিনি ইঙ্গিত দেন যে, এ অঞ্চলের হিন্দুদেরকে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে রাজনৈতিক তৎপরতার মাত্রা হ্রাস পাবে। এভাবে দেখা যায়, ঔপনিবেশিক ভারতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের পশ্চাতে রয়েছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

সংক্ষেপে, ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ছিল মূলত রাজনৈতিক। বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার হিন্দু ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক তৎপরতা, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের ঢং-এ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন ও পাশ্চাত্যের ভাবে ও ভাষায় নিজেদের দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা বৃটিশ কর্মকর্তাদের শঙ্কিত করে তোলে। কার্জনের মত ধীশক্তিসম্পন্ন কর্মচঞ্চল ও তরুণ গভর্নর জেনারেল এ সমস্যা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেন আর স্থায়ীভাবে তার সমাধান আনয়নে সচেষ্ট হন। বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ছিল এরই অভিব্যক্তি। অতীতের আলাপ-আলোচনার সুযোগ নিয়ে প্রথমে তিনি এ পরিকল্পনাকে প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে চালাতে চান। ভারতে এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে আর বৃটেনে এ সম্পর্কে যে–সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সে প্রেক্ষিতে কার্জন বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার রাজনৈতিক দিকটির উন্মোচন করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যায়ে এ পরিকল্পনার পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি এতে সাম্প্রদায়িক রং-এর ছোপ লাগান। তবে আগাগোড়া ব্যাপারটি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল–তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ

কে এম মোহসীন

বাংলা বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের জনসাধারণ একে সারা বাংলার উন্নয়নের পক্ষে এবং তাঁরা যে সব গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন তার জন্যে 'মারাত্মক ক্ষতিকর' বলে ভাইসরয়ের নিকট এক স্মারকলিপিতে এ প্রস্তাবের নিন্দা করেন।[১] ঢাকা ও চট্টগ্রামের অধিবাসীগণ যুক্তি পেশ করে যে প্রস্তাবিত প্রশাসনিক কাঠামো তাদেরকে একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একে বাংলার ঐক্য দুর্বল করার একটি প্রতারণামূলক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করে।

১৯০৪ সালের প্রথম দিকে লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলার জেলাসমূহের এলাকা পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক আলোচনা এবং সম্ভবত এর পক্ষে জনসমর্থন আদায় করার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাংলা পরিদর্শনে আসেন। বিভিন্ন জায়গায় প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উল্লিখিত জনসাধারণের আশা আকাঙখা অনুযায়ী লর্ড কার্জন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে ঘোষণা করেন যে, একজন লেফটেনেন্ট গভর্নরের অধীনে পূর্ব বাংলাকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশে পরিণত করাই সরকারের ইচ্ছা।[২] তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মুসলমান অদ্যুষিত এলাকার জনসাধারণের সমর্থন প্রয়োজন ছিল এবং এজন্য নূতন ব্যবস্থাধীনে তাঁদের উন্নততর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুলে ধরেন।[৩] এরপর এক বৎসরের মধ্যেই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয় এবং ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর করা হয়। তিন কোটি দশ লক্ষ জনসংখ্যা এবং ১,৮৬, ৫৪০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। বাংলা, তার হিন্দী ভাষী পাঁচটি রাজ্য সেন্ট্রাল প্রদেশের নিকট হস্তান্তর করে এবং উড়িষাভাষী পাঁচটি রাজ্য সেন্ট্রাল প্রদেশের নিকট হস্তান্তর করে এবং উড়িষাভাষী পাঁচটি রাজ্য ও সম্বলপুর লাভ করে-পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা আটাত্তরজন হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত।[৪]

www.pathagar.com

নূতন ব্যবস্থাধীনে পশ্চাৎপদ এলাকা সমূহ উন্নত পশ্চিম বাংলা হতে পৃথক করা হয় এবং আশা করা হয় যে, এখন থেকে এ এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ এলাকা যখন মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ আকারে চূড়ান্তরূপ লাভ করে তখন মুসলমান জনসাধারণ স্বাভাবিক ভাবেই একে সমর্থন করে। তাঁরা মনে করেন, এ ব্যবস্থায় নূতন প্রদেশের মুসলমানরা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা এবং প্রশাসনে বৃহত্তর অংশ লাভ করবে। অবশ্য কয়েকজন মুসলমান নেতা ও সমাজকর্মী বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানরা একে স্বাগত জানায়। বাংলার মুসমানদের মধ্যে প্রভাবশালী নেতা ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ মন্তব্য করেন যে, এ বিভাগ মুসলমানদের নিষ্ক্রিয় অথবা থেকে জাগিয়ে তুলেছে, "সংগ্রাম ও কাজের" দিকে তাদের শক্তিকে গতিশীল করেছে এবং বাংলার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনাকারীরূপে পুর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশকে তিনি অভিনন্দন জানান।[৫] পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নূতন প্রদেশ সৃষ্টির প্রতি কলকাতার মুসলমানদের সমর্থন তাৎপর্যপূর্ণ। এ সমর্থন পূর্ব-বাংলা ও আসামের পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাই বঙ্গভঙ্গবিরোধী রাজনৈতিক সভা ও আন্দোলন তাঁরা পরিহার করে চলে এবং এতে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রকাশ পায়। মুসলমানদের এ ভূমিকার প্রতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলিম সংস্থা কলিকাতা মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটিও ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন সমর্থন দান করে। 'মোসলেম ক্রনিকল পত্রিকা এক বৎসর পূর্বে এ বিভাগের বিরোধিতা করে থাকলেও পরিশেষে স্বাগত জানায়।[৬] অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নওয়াব সলিমুল্লাহর ভাই আতিকুল্লাহ ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। ১৯০৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস সম্মেলনের তিনি বক্তৃতা করেন এবং বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তবে সম্ভবত তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিবাদের তীব্রতা কমে আসে। প্রথমদিকে তাঁর এরূপ বিরোধিতার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়- পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভাই সলিমুল্যাহর সাথে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিরোধ ও কলহ এবং এ জন্যে সলিমুল্লাহকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।[৭]

অপর পক্ষে বাংলার হিন্দু নেতাদের সমর্থন পেয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃত্ব করবে-এমন একটি প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রাসবিহারী ঘোষ এবং অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রমুখ খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। কংগ্রেসের এ আন্দোলন বাংলার হিন্দু জনসাধারণ সমর্থন করেনি—একমাত্র তফলিসী সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসী (scheduled cste) যাদের ছিল বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র আর্থিক ও সামাজিক ক্ষোভ। হিন্দু মনোভাব স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিভাগকে যখন একটি মীমাংসিত বিষয় (settled fact) বলে ঘোষণা করা হয় তখন নুতন প্রদেশের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতা স্বভাবতঃই মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হয়।

পক্ষান্তরে, নূতন প্রদেশ মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। মুঘল রাজধানী ঢাকা, এর লুপ্ত গৌরব ফিরে পায় এবং দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রতি ক্ষেত্রেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৮] এ প্রদেশের প্রথম লেফটেনেন্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুরার সচেতন ছিলেন যে

www.pathagar.com

মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং সরকারী চাকুরীতে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। অতএব নূতন প্রদেশের উন্নয়নের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নবান হন। তদনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও আভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সড়ক পথের উন্নতি সাধনের জন্য এক বৎসরের মধ্যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি সাধন করা হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন স্থানীয় বণিক ও বাণিজ্যিক পণ্যের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নৌ পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। গ্রামের সংগে শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের সংযোগের জন্য পুরাতন রাস্তাসমূহের সংস্কার এবং নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।[৯]

মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার সাধন করা হয়। মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারের মঞ্জুরীকৃত বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়- এতে অল্পকালের মধ্যেই স্কুল কলেজের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যায় এবং বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্যও শিক্ষা প্রসারের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসাবে বেশী সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক ও স্কুল পরিদর্শন নিযুক্ত করা হয়।[১০] আশা করা হয় এরা নিজ স্বার্থেই সরকারী নীতি বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে এবং এদেশব্যাপী সকলকে শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হতে উৎসাতিত করবেন। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে মুসলমানরাই বেশী সুবিধা ভোগ করে এবং তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাসমূহও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তাই ১৯১২ সালে লর্ড কার্জন তাঁর এ অবদানের জন্য গর্ব অনুভব করেন যে "নূতন প্রদেশ শিক্ষা, প্রশাসন এবং উন্নতির প্রতি ক্ষেত্রেই অগ্রগতি সাধন করেছে।"

মাত্র ছয় বৎসর অসম্ভব কিছু সাধন করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু এ অল্প সময়েই যা কিছু করা সম্ভব এবং যে সব পলিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এতেই নূতন প্রদেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।[১১] তাছাড়া এটা এ ইংগিতও বহন করে যে, একটা পশ্চাৎপদ অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে কতখানি উন্নয়ন সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আরো অগ্রগতি সম্ভব হত যদি এ বিভাগ বিলুপ্তির জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা না হতো।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বাংলা বিভাগে হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলন শুরু করে যা অচিরেই 'বয়কট' আন্দোলনে রূপ লাভ করে। প্রাচীন শিল্প কারখানা ও হস্তচালিত শিল্পসমূহ পুনঃপ্রচলন করার উদ্দেশ্যে একটি অর্থনৈতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও স্বদেশী আন্দোলন বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। স্বদেশী আন্দোলন ও বৃটিশ পণ্যবর্জন সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদেধ এ আন্দোলন হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে মুসলমানদের জন্য কোন আন্তরিক অনুভূতির ফপলশ্রুতি ছিলনা বা তা তাদরে স্বার্থমুক্তও নয়। এ বিভাগের ফলে কলকাতার পেশাগত ও শিক্ষিত শ্রেণীর যে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল এবং বিরোধীতার ক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে প্রতিবাদ মুখর। বাংলা বিভাগের প্রথমবর্ষ পূর্তি দিবসে তাঁরা জাতীয় শোক দিবস' হিসাবে পালন করেন।[১২]

অপরদিকে ফুলার হিন্দু নেতাদের তীব্রতম আক্রমণের শিকার হলেন। সরকারী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য তাঁদের দৃঢ় প্রচেষ্টার জন্য তিনি তাদের চক্ষুশুলে পরিণত হন। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মুখে ফুলারকে পদত্যাগ করতে হয়। আন্দোলনের সংকটাপন্ন মূহূর্তে তাঁর পদত্যাগের অর্থ ছিল আন্দোলনকারীদের জয় এবং সরকারের নতি স্বীকার। ফুলারের পদত্যাগের সরকারী সিদ্ধান্তে মুসলমানরা বিস্মিত হন এবং একে রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব

www.pathagar.com

প্রসূত বলে অভিহিত করেন। মুসলমানরাও একই ভাবে বাংলা বিভাগকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং তারা বঙ্গভঙ্গের দিনটি বিরাট উৎসব ও আনন্দের সাথে উদযাপন করেন। তবুও ফুলারের পদত্যাগ এবং হিন্দুলের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে উপমহাদেশের মুসলমানগণ সতর্ক হয়ে যান এবং বাংলা বিভাগের প্রতি কংগ্রেসের হুমকি মোকাবেলা করার জন্য ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-নিখিল ভারত মুসলিম লীগ গঠন করেন। মুসলীম লীগ গঠনের আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু বাংলা বিভাগের প্রতি এর সমর্থন ছিল প্রত্যক্ষ এবং সুদৃঢ়"। এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় "এই বিভাগ নূতন প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণের পক্ষে অবশ্যই উপকারী প্রমাণিত হবে এবং আন্দোলনের সমস্ত পন্থা যথা 'বয়কট' কঠোরভাবে নিন্দা ও দমন করতে হবে।[১৩]

জন মর্লে ভারত সচিব নিয়োজিত হওয়ায় কংগ্রেস নেতাগণ আশা করেছিলেন যে বাংলা বিভাগ রদ করা হবে। কিন্তু তাঁদের চরম হতাশার মুখে ঘোষণা করা হয় এ বিভাগ একটি 'মীমাংসিত' বিষয়। সুতরাং হিন্দু নেতাগণ তাঁদের আন্দোলন পুনরায় শুরু করেন এবং একে তীব্রতম রূপদান করেন। বাংলা বিভাগ বাতিল ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে এবং পূর্ব বাংলার কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ শুরু হয়। পাঁচ বৎসরের সংগ্রাম অবশেষে বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। ভারত সরকার আন্দোলনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন এবং নতুন প্রদেশের বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ বাংলা বিভাগের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

পূর্ব বাংলা আসাম প্রদেশ বাতিল করা হয়। এতে হিন্দু-মুসলমান, এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের কারণ দৃঢ়তর হয়। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও বাংলা বিভাগ ও নূতন প্রদেশের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও শ্রেণী প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বলে মুসলমানগণ অভিযোগ করেন। আম্বেদকর বলেন; "সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এবং এমন কি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি। এ সব প্রদেশের সিভিল সার্ভিসই তাঁরা দখল করে নিয়েছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল এ চারণভূমি হ্রাসকরণ। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে বাধা দেয়া।"[১৪] এন, সি, চৌধুরী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "বাংলা বিভাগ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি স্থায়ী বিরোধের কারণ রেখে যায় এবং মুসলমানদের প্রতি একটি চরম ঘৃণা আমাদের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করে; ফলে বন্ধুত্বের সর্বপ্রকার অন্তরঙ্গতা দূরীভূত হয়। স্কুল, রাস্তাঘাট এবং হাট-বাজারের সর্বত্রই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে, কিন্তু সর্বোপরি মানুষের মনের মধ্যে তা স্থায়ী চিত্র রেখে যায়।"[১৫]

এমনকি বঙ্গভঙ্গ রদ করার পরে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক প্রতিশ্রুত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেরও বিরোধিতা করেন কলকাতায় বসবাসকারী হিন্দু অধিবাসীগণ। আশা করা হয়ে ছিল। নুতন প্রদেশে ছয় বৎসরের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় এ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখবে। কলকাতার হিন্দু নেতাগণ ভাইসরয়কে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলমান কৃষককুলের কোন কাজে আসবে না।[১৬] অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কোনক্রমেই একটি নূতন প্রদেশের বিকল্প ব্যবস্থার সমতুল্য ছিলনা। মুসলমানগণ তাঁদের স্বার্থের প্রতি সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার কথা ভুলতে পারেনি। তাঁরা বুঝতে সক্ষম হন যে, একদিকে

www.pathagar.com

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় এবং অপরদিকে বিদেশী শাসকশ্রেণী-এ দুই শক্তি বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কেবলমাত্র তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্ভব। আস্তে আস্তে সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়-পরিশেষে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভাগ ও দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাময়িকভাবে এর পরিসমাপ্ত ঘটে।

---

১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩।

২. S. Sarkar: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১১।

৩. P. Mukhejee; All about Partition (1905), পৃষ্ঠা ৪৯।

৪. ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য A. R. Mallick : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১০।

৫. পূর্বেক্ত, পৃষ্ঠা ১৬।

৬. The moslem Chronicle, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য S. Ahmad: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৬।

৮. Bradley Birt: Romance of an Eastern Capital, পৃষ্ঠা ২১-২২ ও A. H. Dani: Dacca (1956), ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা।

৯. নূতন প্রদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে S. Ahmad: পূর্বোক্ত, ৩৯৯ ৪১০ পৃষ্ঠা।

১০. উদ্ধৃতি S. Ahmad পূর্বোক্ত, ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

১১. M. K. Molla তার DhD. thesis এ New province of East Bengal and Assam (University of London 1966) নূতন প্রদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১২. N. C. Chaudhuri: An autobiography of an Unknown Indian, পৃষ্ঠা ২১৯।

১৩. উদ্ধৃতি S. Ahmad: পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৮৩।

১৪. পৃষ্ঠা ১১ B. R. Ambedker: Pakistan or Partition of India

১৫. N. C. Chowdhuri: পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯।

১৬. S. Ahmed, পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা ৩৩১-২।

www.pathagar.com

বঙ্গ-ভঙ্গ বনাম স্বাধীন বঙ্গ

অলি আহাদ

বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীন অখন্ড বঙ্গ-আন্দোলন প্রয়াসে লিপ্ত থাকাকালীন অবাঙ্গালী হিন্দু নেতা আচার্য কৃপালনী, পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু মহাসভা নেতা বঙ্গসন্তান শ্রী শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী সৃষ্ট বঙ্গ-ভঙ্গ দাবীকে সর্বভারতীয় প্রবল হিন্দু দাবীতে পরিণত করিয়াছিলেন। পরিহাস ও পরিতাপের বিষয়, যে হিন্দু সম্প্রদায় ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার উদ্দেশ্যে ভারতে ও ভারতের বাহিরে এক অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন করিয়া সম্রাট পঞ্চম জর্জকে ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ দাবীতে সমগ্র হিন্দু ভারতকেই প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, ইংরেজ রাজের কুটিল সহায়তায় বঙ্গ-ভঙ্গ হইয়া গেল। বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলিম নেতারা বাঙ্গালী জাতিকে সুসংঘবদ্ধ করার নিমিত্তে হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে বাস্তব দৃষ্টিতে মোকাবিলা করিতে স্বতঃই প্রয়াস পাইতেছিলেন। দূরদর্শী বিচক্ষণ বাঙ্গালী রাজনীতিজ্ঞ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ২৩শে এপ্রিল (১৯২৪) বেঙ্গল প্যাকট করেন। কিন্তু অবস্থা বৈগুণ্যে বিভ্রান্ত হইয়া তদীয় অনুগামী সুভাষ চন্দ্র বসু নিজ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনগর কনফারেন্সে (১৯২৯) বেঙ্গল প্যাকট বা বঙ্গ চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে নেতাজী এই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না-ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্মেলনে দ্বিতীয়বারের জন্য কায়েমী স্বার্থের তীব্র বিরোধিতা সত্বেও তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইলেন বটে, তবে অবাঙ্গালী উর্ধতন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কারসাজিতে অচিরেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। স্পষ্ট হইয়া গেল যে, অবাঙ্গালীরা কখনই বাঙ্গালী নেতৃত্বকে বরদাশত করিতে রাজী ছিল না। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্বীয় ভ্রম উপলব্ধি করিলেন ও তাঁহার রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্থানীয় সমঝোতার মাধ্যমে কলিকাতা মুসলিম লীগ নেতা আবদুর রহমান সিদ্দীকীকে কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র মনোনীত ও নির্বাচিত করিলেন। এইবারও বাঙ্গালী জাতির সঙ্কট মুহূর্তে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, কিরণ শঙ্কর রায় ও শরৎ চন্দ্র বসু এবং হিন্দু মুসলমানের স্বাধীন ও সার্বভৌম বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ

www.pathagar.com

করিলেন। তাঁহারা মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজমকে উপরে বর্ণিত খসড়া চুক্তির মর্ম অবহিত রাখিয়া চলিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতৃদ্বয় স্ব স্ব অহমিকা ও কর্তৃত্বের বশবর্তী হইয়া বঙ্গ-ভঙ্গ অপরিহার্য করিয়া তুলিলেন। আর সেই মুহূর্তেই বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশা বিষপানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বঙ্গীয় কংগ্রেস-লীগ খসড়া চুক্তির কপিসহ ২৩শে মে (১৯৪৭) শ্রী শরৎ চন্দ্র বসু কর্তৃক লিখিত পত্রোত্তরে গান্ধীজীর ৮ই জুনের লিখিত জবাবের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ

I have gone through your draft. I have now discussed the scheme roughly with Pandit Nehru and Sardar Patel. Both of them are dead against the proposal, ... you should give up the struggle for Unity of Bengal & cease to disturb the atmosphere that has been created for the partition of Bengal.

অর্থাৎ "আপনার খসড়া আমি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়াছি। পন্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সহিত স্কীমটি মোটামুটি আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা উভয়েই প্রস্তাবটির ঘোর বিরোধী–অখন্ড বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আপনার ত্যাগ করা উচিত এবং বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিনষ্ট করা হইতে বিরত হউন।।"

কত কৌশলই না জানেন নেতারা! পূর্বাহ্নে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানকে বানচাল করার জন্য বঙ্গ-আসাম গ্রুপিংয়ের বিরুদ্ধে প্রদেশের সাম্প্রদায়িক প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বরদৌলীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিবাদের ঝড়কে কতই না উৎসাহ দিয়াছেন মহাত্মাজী! শ্রদ্ধাভাজন নেতারা বারবার সংকীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর দেশবাসী ও আমাদের মত তরুণ কর্মীরা হই তাহাদের হুতাশন-যজ্ঞের কাঠ খড়ি। আফসোসের বিষয়, এতদসত্ত্বেও বাঙ্গালী হিন্দুদের নিকট সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদই গৃহীত হইল-বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ নহে। আমার ধারণা, বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও রাষ্ট্রীয় সীমারেখা যাহাই হউক না কেন, ঐতিহাসিক অগ্রগতির এক পর্যায়ে লাহোর প্রস্তাবের সার্থক বাস্তবায়ন হইবে ও বৃহত্তর বঙ্গদেশ রাষ্ট্র গঠিত হইবে। ইহারই ইংগিত রাখিয়া গিয়াছেন শরৎ চন্দ্র বসু ও আবুল হাশিম। এই নেতৃদ্বয় ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৪৭) এক গোপন দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর বঙ্গদেশ গঠনের খসড়া প্রণয়ন করেন। প্রণীত খসড়া অনুযায়ী বিহার প্রদেশের বাংলা ভাষাভাষী পুর্নিয়া জেলা ও বঙ্গদেশের বর্ধমান ডিভিশনভুক্ত জেলাগুলি সমবায়ে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ, প্রেসিডেন্সী ডিভিশন, রাজশাহী ডিভিশন, ঢাকা ডিভিশন, চট্টগ্রাম ডিভিশন ও শ্রীহট্ট জেলা সমবায়ে মধ্যপ্রদেশ এবং শ্রীহট্ট জেলা ব্যতিরেকে আসাম প্রদেশের জেলা সমবায়ে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠিত হইবে। আর এই প্রদেশগুলির সমবায়ে গঠিত হইবে বৃহত্তর বঙ্গদেশ রাষ্ট্র।

আমরা ঢাকায় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলাম। ছাত্র মহলই ছিল আমাদের কর্মক্ষেত্র। স্বাধীন ও সার্বভৌম অখন্ড বঙ্গদেশ পরিকল্পনা সমর্থনে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা পরিচালনাকালে ছাত্র নেতা শ্রী সরোজ দাস ও শ্রী অজিত কুমার হাজরার সহিত আমার হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়। তখনকার উগ্র সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত হাওয়ায় দেশ জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও সংকল্প ও আদর্শের মিল আমাদিগকে ভ্রাতৃত্বের রাখী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল।

পূর্বসূরী শরৎ চন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের স্বপ্ন বাস্তবায়নের ভার উত্তরসূরী বংশধরদের উপর ন্যস্ত।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ ও বাংলার মুসলমান

আব্বাস আলী খান

এ বিষয়ের উপর বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক তথ্যনির্ভর আলোচনা ও তার থেকে মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণ করতে হলে পলাশী থেকে বঙ্গভঙ্গ পর্যন্ত দেড় শত বছরের ইতিহাসের মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক। অতঃপর বঙ্গভঙ্গ থেকে বঙ্গভঙ্গ রদ পর্যন্ত সাত বছরের বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল বাবু শ্রেণীর প্রচণ্ড সহিংস আন্দোলন এবং পরিশেষে বিভিন্ন ধারাবাহিক ঘটনাপুঞ্জের ভিতর দিয়ে ছত্রিশ বছর পর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ এ আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। তার অবকাশ এখানে নেই বলে সংক্ষেপেই কিছু কথা বলতে হচ্ছে।

পলাশীর পর থেকে বঙ্গভঙ্গ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতাহরণের পর মুসলিম সমাজের যে সীমাহীন দুর্দশা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণও এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিজয়ীর বেশে বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আগমন করেন। এ দেশকে তাঁরা তাঁদের আপন প্রিয় দেশ মনে করে এটাকে তাঁদের চিরদিনের আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন। বিজয়ী হিসেবে স্বভাবতই তারা সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার রাখতেন। হান্টার বলেন, একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার তিনটি প্রধান সূত্র থেকে সম্পদ আহরণ করতো। সামরিক বিভাগের নেতৃত্ব, রাজস্ব আদায় এবং বিচার বিভাগ ও প্রশাসন ক্ষেত্রে চাকরি। আরও একটি সূত্র ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা দান পেশা।

www.pathagar.com

প্রথম সূত্রটি ছিল প্রায় তাদের একেবারে একচেটিয়া। কোম্পানি শাসনের সাথে সাথে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয়, মীরজাফর তথাকথিত নবাব হওয়ার পর স্বয়ং আশি হাজার মুসলিম সৈন্য চাকরি থেকে অপসারিত করেন। ফলে বাংলা-বিহারের কয়েক লক্ষ মুসলমান বেকারত্ব ও দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে থাকে।

হান্টার বলেন, জীবিকার্জনের সূত্রগুলোর প্রথমটি হচ্ছে সেনাবাহিনী সেখানে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হয়ে গেল। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে পারে না। যদিও কদাচিৎ আমাদের প্রয়োজনের জন্য তাদেরকে কোন স্থান দেয়া হতো, তার দ্বারা তার অর্থোপার্জনের কোন সুযোগই থাকতো না।

তাদের অর্থ উপার্জনের দ্বিতীয় সূত্র ছিল রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদ। কিন্তু নিম্নপদস্থ হিন্দু রাজস্ব আদায়কারীগণ কোম্পানির অনুগ্রহে এক লাফে মুসলমানদের জমিদারীর মালিক হয়ে বসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে এবং সরকারের বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত মুসলিম কর্মচারী এবং প্রকৃত ভূমির মালিকের স্থান অধিকার করে বসে ইংরেজ ও হিন্দু।

আবহমানকাল থেকে ভারতের মুসলমান শাসকগণ জনগণের শিক্ষা বিস্তারকল্পে মসজিদভিত্তিক বহু দারুল উলুম তথা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সবের সকল ব্যয়ভার বহনের জন্য মুসলিম মনীষীগণকে ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে জায়গীর তমঘা, আযমা, মদদে মায়াশ, সুয়াফী তথা লাখেরাজ ভূসম্পত্তি দান করা হতো। কোম্পানি আমলে নানা অজুহাতে এসব ভূসম্পত্তির মালিকদেরকে মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। এর ফলে উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান ধ্বংসের কবলে পতিত হয়, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। একজন মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে শিক্ষায় প্রয়োজন ছিল তাও বন্ধ হয়ে যায়।

পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু পর্যন্ত তাঁর The Discovery of India গ্রন্থে বলেন ঃ

> ইংরেজরা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে বহু 'মুয়াফী' অর্থাৎ লাখেরাজ-ভূসম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল। তাদের অনেক ছিল ব্যক্তিগত কিন্তু অধিকাংশই ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত। প্রায় সকল প্রাইমারী, মাদরাসা, মকতব এবং বহু উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এসব মুয়াফীর আয়নির্ভর ছিল। .... প্রায় সকল লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। বহু বনেদী ভূম্যাধিকারী স্বত্বচ্যুত হলেন। বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। বহুসংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী বেকার হয়ে পড়লেন।

(Pandit Jawaherlal Nehri, The Discovery of India, PP. 376-77)

হান্টার সায়েবও এসব সত্য স্বীকার করে বিদ্রূপের স্বরে বলেছেন

> "এখন জেলখানায় দু'একটা অধঃস্তন চাকরি ছাড়া আর কোথাও ভারতে এই সাবেক প্রভুরা ঠাঁই পাচ্ছে না। বিভিন্ন আপিসে কেরানীর চাকরিতে, আদালতের দায়িত্বশীল পদে, এমন কি পুলিশ সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন পদগুলোতে সরকারী স্কুলের উৎসাহী হিন্দু যুবকদেরকে নিযুক্ত করা হচ্ছে।"

এ পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সুফল ভোগ করে। বিভিন্ন কলেজ থেকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে তারা সর্বত্র সরকারী চাকরিতে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অঙ্গনে পটপরিবর্তনের ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারসমূহ জীবিকার্জনের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র্য, অনাহার ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, কৃষক ও তাঁতীদের জীবনেও চরম বিপদ নেমে এসেছিল।

www.pathagar.com

মোটকথা, পলাশীর যুদ্ধে এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে তুলে দেয়ার পর থেকে একশত বছরের সঠিক ইতিহাস ও বিভিন্ন তথ্যাবলী থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, এ সময়কালের ইতিহাস বাংলার মুসলমানদের শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও হত্যাযজ্ঞের ইতিহাস। আর এ কাজে ইন্ধন যুগিয়েছে, সর্বপ্রকারে সাহায্য - সহযোগিতা করেছে কোম্পানি সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় 'বাবু শ্রেণী'। মুসলমানদের এ চরম দুরবস্থার পরও তারা পরাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। সাইয়েদ আহমদ শহীদের মুজাহিদ আন্দোলন, বাংলায় ফারায়েযী ও সাইয়েদ তীতু মীরের আন্দোলন এবং ১৮৫৭ সালে দেশব্যাপী আযাদী আন্দোলন ইংরেজ সরকারকে বিব্রত ও শঙ্কিত করে তুলেছে। অতঃপর তারা এ আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের রাজনীতিতে পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করে। তবে শেষের দশকে এ নীরবতা ভঙ্গ করে। বালগঙ্গাধর তিলকের প্রতিষ্ঠিত গোরক্ষা প্রতিরোধ সমিতি (Anti cow killing society) সারাদেশে তাদের প্রচারপত্র বিতরণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম উস্কানিমূলক প্রচারণা চালায় যার ফলে দেশের বহু স্থানে ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে।

বঙ্গভঙ্গ ও তার কারণ

সারাদেশে যখন চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, সে সময়ে ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন ভারতের বড়ো লাট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল কোলকাতা। প্রথম কয়েক বছর কার্জন বাঙালী হিন্দুদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর মধ্যে যে প্রশাসনিক যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা ছিল তা অনেকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি যখন প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অযোগ্যতা, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা প্রভৃতি উচ্ছেদ করে প্রশাসনের মানোন্নয়নে মনোযোগ দেন, তখন স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর প্রশংসা, মাহাত্ম্যকীর্তন ও স্তুতির পরিবর্তে নিন্দা ও সমালোচনা শুরু করে। কার্জন প্রশাসন ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তার সবগুলো বিনা বাক্যে গৃহীত হয়। কিন্তু বহু কল্যাণকর ও বহু বাঞ্ছিত তাঁর বঙ্গ বিভাগ প্রতিক্রিয়াশীলদের অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত করে তোলে।

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল সুষ্ঠু ও সুফলপ্রসূ প্রশাসনিক কারণে। বাংলা তখন ব্রিটিশ ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ ছিল- আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৮ কোটি। এতো বড়ো একটি বিশাল প্রদেশ একজন গভর্নরের শাসনাধীন ছিল। এর সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা করা, আইন-শৃঙ্খলা মজবুত রাখা এবং সকল অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখা ছিল একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো যেহেতু নদীবহুল এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা না থাকায় ছোট লাটের পক্ষে এ অঞ্চল দেখাশুনা করা সম্ভব ছিল না। ছোট লাটের পাঁচ বছরের কার্যকালের মধ্যে একবারও এ অঞ্চল পরিবদর্শন করার সুযোগ হতো না বলে এ অঞ্চল ছিল অত্যন্ত অবহেলিত ও অনুন্নত। অন্যান্য বহু কারণে এ অঞ্চলটি ছিল অনুন্নত। হিন্দু জমিদারগণ এ অঞ্চলের কৃষক-প্রজাদের শোষণ করে সে শোষণলব্ধ অর্থ কোলকাতায় বসে বিলাসিতায় উড়িয়ে দিতেন। প্রজাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রতি ছিল তাদের চরম অবহেলা ঔদাসিন্য। কোলকাতা ও পশ্চিম বাংলা উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছিল। প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তার জন্য পূর্বাঞ্চলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল।

www.pathagar.com

এ অঞ্চল নদীবহুল ছিল বলে নৌকাযাত্রীদের ধন-সম্পদ জলদস্যুগণ নির্বিবাদে লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো যার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পুলিশ বাহিনী ছিল অপর্যাপ্ত ও দুর্বল, যার ফলে সমাজের সর্বস্তরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতো। প্রদেশের শাসকগণ এ অঞ্চলের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পরিহার করে বসেছিলেন এবং তাঁদের সকল সময় ও শ্রম কোলকাতার জন্য ব্যয়িত হতো। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দও হতো না।

কর্মচারীগণ পূর্বাঞ্চলের নামে ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়তেন এবং পূর্বাঞ্চলে বদলি শাস্তি মনে করতেন। উপরে বর্ণিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের পর নতুন প্রদেশ আসাম, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত হলো যার মধ্যে ১৫টি জেলা ছিল এবং আয়তন দাঁড়ালো ১,০৬,৫০০ বর্গমাইল—যার দুই – তৃতীয়াংশ ছিল মুসলমান। অর্থাৎ প্রদেশটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হলো। আর এটাই হিন্দুদের হিংসার প্রধানতম কারণ।

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই নতুন প্রদেশের ঘোষণা হলো এবং ১৬ অক্টোবর থেকে এর কাজ শুরু হলো। হিন্দু বাংলা বঙ্গভঙ্গের ফলে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। হিন্দু মহল এটাকে প্রথমত জাতীয় ঐক্যের প্রতি আঘাত বলে। নানাভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে। যেমন, মুসলমানদের পক্ষে সরকারের পক্ষপাতিত্ব 'মুসলমানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা' মা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা, ব্রিটিশ সরকার ও দেশদ্রোহী মুসলমানদের মধ্যে অশুভ আঁতাত প্রভৃতি।

বঙ্গভঙ্গ রদ করতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য যতো পন্থা অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে একটি সন্ত্রাসী আন্দোলন। মনে হয় সারা বিশ্বের সন্ত্রাসী আন্দোলন সর্বপ্রথম বাংলায় শুরু হয় এবং তা এ বঙ্গভঙ্গের পর। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ্যের চাকরি ছেড়ে বাংলায় আসেন সন্ত্রাসী তৎপরতার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য।

কোলকাতার যুগান্তর পত্রিকা (৩০ মে, ১৯০৮) হিন্দুদের প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বঙ্গমাতার খণ্ডনকারীদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে হিন্দু জনতাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। বলা হয়, "মা জননী পিপাসার্ত হয়ে নিজ সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করছে একমাত্র কোন্ বস্তু তার পিপাসা নিবারণ করতে পারে। মানুষের রক্ত এবং হিন্দু মস্তক ব্যতীত অন্য কিছুই শান্ত করতে পারে না। অতএব জননীর সন্তানদের উচিত মায়ের পূজা করা এবং তার ইপ্সিত বস্তু দিয়ে সন্তুষ্টি বিধান করা। .... যেদিন গ্রামে গ্রামে এমনিভাবে মায়ের পূজা করা হবে সেদিনই ভারতবাসী স্বর্গীয় শক্তি ও আশীর্বাদে অভিষিক্ত হবে।" এ আহবানে শুরু হয় হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও রক্তের হোলিখেলা।

এ সন্ত্রাসী আন্দোলন বাঙালী হিন্দুদের জন্যে সীমিত না রেখে সর্বভারতীয় করায় প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। এসবের পেছনে যে মানসিকতা বিরাজ করছিল তা হলো চরম মুসলিম বিদ্বেষ। মুসলমানকে তারা তাদের চিরশত্রু মনে করে। বঙ্গভঙ্গের পর নতুন প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এবং তারা কিছুটা সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে- এ তারা কিছুতেই বরদাশত করতে রাজি নয়। এই যে বাংলা মায়ের জন্য তাদের কান্না, তার মধ্যে কি তাদের কোন আন্তরিকতা ছিল? ১৯৪৭ সালে তাদের এ আরাধ্য দেবী বঙ্গমাতাকে তারা নিজেরাই দ্বিখণ্ডিত করলো কেন? আসল কথা মুসলিম স্বার্থে আঘাত হানার জন্য তারা যে, কোন পন্থা ও নীতি অবলম্বন করতে পারে।

কোলকাতা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে এ বিপ্লব আন্দোলন গড়ে উঠে। কোলকাতার বিপ্লববাদীরা 'যুগান্তর' এবং ঢাকার বিপ্লববাদীরা 'অনুশীলন' নামে তাদের সমিতি গঠন করে। এরা বোমা তৈরি ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করে।

www.pathagar.com

মুসলিম স্বার্থবিরোধী এ আন্দোলন ভাগ্যক্রমে মুসলমানদের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে আনে। তাদের মরা গাঙে নতুন প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা শহরে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন নামে এক সম্মেলন আহবান করেন। আট হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুহসিনুল মুল্‌ক ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী। সর্বসম্মতিক্রমে এ সম্মেলনেই বাংলা তথা সারা ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে 'মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে হিন্দু বিদ্বেষ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার বহ্নি প্রজ্বলিত হয় তাই মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল।

বাঙালী হিন্দু সন্ত্রাস ও খুন-খারাবীর মাধ্যমে তাদের বিভাগবিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে থাকে। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়। অবশেষে ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে ভারত আগমন করেন এবং 'বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো' বলে ঘোষণা দেন।

এ ঘোষণার দ্বারা সরকারের প্রগলভতা, ডিগবাজি ও একটি অনুন্নত অঞ্চলের সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরে দিয়ে আবার তা কেড়ে নেয়ার অন্যায়-অবিচারমূলক মনোবৃত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

১৯১২ সালের মার্চ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ বলেন, "এ বিভাগ ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা দেখে আমাদের শত্রু ব্যথিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে বিভাগের ফলে আমরা তেমন বিশেষ কিছুই লাভ করিনি। যতোটুকু লাভ করেছিলাম আমাদের প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায় স্বর্গমর্ত আলোড়ন সৃষ্টি করে তাও আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নিল। হত্যা ও দস্যুবৃত্তি করে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করল। এসব হত্যাকাণ্ডে মুসলমান অংশগ্রহণ না করে সরকারের প্রতিই অনুগত রইল। হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হলো। একদিকে ছিল সম্পদশালী বিক্ষুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায় এবং অপরদিকে দরিদ্র মুসলিম এবং এরা ছিল সরকারের সাথে। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হলো। হঠাৎ সরকার বিভাগ রদ করলেন। এ বিষয়ে আমাদের সাথে কোন আলাপ-আলোচনাও করা হলোনা।

একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিভাগবিরোধী আন্দোলনের ধারা ক্রমশ অন্য একটি খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। তাহলো এই যে, মুসলমান জাতিকেই একেবারে ভারত ভূমি থেকে নির্মূল করে দেয়া। সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন ১৯১১ সালে ভারতে আগমন করেন তখন বহু হিন্দু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত আবেদনপত্রে বলা হয় যে, বিভিন্ন সংস্কারাদির দ্বারা মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করা হচ্ছে। হিন্দু পত্র-পত্রিকাগুলো বলে যে, মুসলমানরা দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য ভানমাত্র, ব্রিটেনের প্রতি তাদের দরদ মাত্র নেই। The Times London-এর সংবাদদাতা স্যার ভ্যালেন্টাইন বলেন, তিলক ও তাঁর ভাবাদর্শে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত স্কুল এবং পাঞ্জাব ও বাংলার জাতীয়তাবাদী হিন্দুগণকে একথা বলতে শোনা যেতো যে, স্পেন থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে যেমন মুসলমানদেরকে নির্মূল করা হয়েছে। তেমনি ভারত থেকেও তাদেরকে নির্মূল করা হবে।

বড়লাট কার্জনের ব্যক্তিগত স্টাফের জনৈক স্যার ওয়াল্টার লরেন্স (Sir Walter Lawrence) বলেন, তাঁকে প্রদত্ত নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ইদোরের মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংহ। তিনি তাঁর জীবনের বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার কাছে ব্যক্ত করেন। তার মধ্যে একটি

www.pathagar.com

হচ্ছে ভারত থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা। স্যার লরেন্স একটি অতি মোক্ষম সত্য উদঘাটন করেছেন। ভারতভূমি থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা স্যার প্রতাপ সিংহের মতো কেবলমাত্র দু'একজন হিন্দু ভদ্রলোকের অন্তরের কথাই নয়, বরঞ্চ এ হচ্ছে গোটা হিন্দু জাতিরই অন্তরের কথা। পরবর্তীকালে ভারতে পাকিস্তান আন্দোলনকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতিতে বারবার উপরোক্ত মনোভাব প্রকাশ করেন। সাম্প্রতিককালে ভারতে উগ্র হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলো একই কথা বার বার বলছে।

উপরের আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তথা মুসলমানদের কোন সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে হিন্দু ভারত ও ইংরেজদের মানসিকতা ও আচরণ কি ছিল।

বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে মুসলমানরা কি লাভ করল ও কি হারালো তাই-যাচাইপর্যালোচনা করে দেখা যক। সুষ্ঠু ও সুসামঞ্জস্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনে ভারতের ব্রিটিশ আমলাগণ বহুদিন যাবত কতিপয় প্রাদেশিক এলাকার পুনর্বন্টন ও পুনর্বিন্যাসের চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং এ বিষয়ে সেক্রেটারিয়েটে ফাইলের পর ফাইল তৈরি হয়েছিল। লর্ড কার্জন এসবকে ভিত্তি করে সর্ববৃহৎ প্রদেশ বাংলাকে বিভক্ত করে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। বাংলার মুসলমানদের এ বিষয়ে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না। অবশ্য, বিভাগের ফলে মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সর্ববিধ মঙ্গল ও উন্নতির সন্ধ্যা পরিলক্ষিত হয়। বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ভবিষ্যত সুযোগ-সুবিধায় নিছক ঈর্ষান্বিত হয়ে বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। সে আন্দালন পরে সন্ত্রাসবাদ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের রূপ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত ভূমিতে মুসলমানগণ তাদের অস্তিত্ব, তাহজীব-তমদ্দুন, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বিপন্ন মনে করে। আত্মরক্ষার জন্য মুসলিম লীগ' নামে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম হয়। ভারতের হিন্দু-মুসলিম মিলে এক জাতীয়তার ছদ্মনামে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করে তাদেরকে হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে একাকার করার ষড়যন্ত্রও মুসলমানরা উপলব্ধি করে। আগা খানের নেতৃত্বে ৩৬ জন বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল বড়লাটকে তাঁদের এ আশঙ্কা ব্যাখ্যা করে পৃথক নির্বাচন প্রথা দাবি করেন। পরে ব্রিটিশ সরকারও এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করেন। মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভ হয়।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু জাতির মুসলিম নির্মূল পরিকল্পনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের মুসলমান তাদের জন্য পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করল, তা বানচাল করে অখন্ড ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদী ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায় যে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে-তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে চলেছে বাংলাদেশের কিছু বর্ণচোরা মুসলমান। মুসলিম জাতিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন এ মহলটি সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত। এরা ভারতীয় স্বার্থ ও হিন্দু স্বার্থকে বাংলাদেশও মুসলিম স্বার্থ থেকে বড়ো করে দেখে। এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম সময়েরই দাবি। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ আমাদের সকল দিক দিয়ে মদদ করুন— আমীন।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ঃ (১৯০৫) ও তৎকালীন রাজনীতি

এ বি এম মাহমুদ

১৮৯৮ সনে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, দায়িত্বজ্ঞান এবং সর্বোপরি এই দেশের সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লইয়াই তিনি ভারতে আসেন। তাহার শাসনকাল (১৮৯৮-১৯০৫) বিভিন্ন দিক ইহাতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লর্ড কার্জনের শাসনকালের বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলা বিভাগ। তৎকালে সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ লইয়া ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল সমগ্র উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ। কার্জন প্রথম হইতে এতবড় প্রদেশকে একটিমাত্র প্রশাসনিক ইউনিটের অধীনে রাখা অনুচিত মনে করেন। সুদূর কলিকাতা হইতে পূর্বাঞ্চলের প্রশাসন ব্যবস্থা ও জনগণের প্রতি সুবিচার সম্ভব নয়। তাই প্রধানত প্রশাসনিক কারণেই তিনি ১৯০৩ সনে এই বিরাট প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের এই সিদ্ধান্ত একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে পরিগণিত হয়। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য তিনি উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন। এই নবগঠিত প্রদেশের নামকরণ হইল পূর্ব বাংলা ও আসাম। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত হইয়া আরেকটি প্রদেশ হয়-ইহার নাম হইল বাংলাদেশ।

নূতন প্রদেশ গঠনের ইতিহাস সুদীর্ঘ। সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি লইয়া ব্রিটিশ সরকার বহুদিন হইতে জল্পনা, কল্পনা করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৫৩ সনে স্যার চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দুইভাগে বিভক্তকরণের সুপারিশ করেন। ১৮৫৩ সনে স্যার চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্তকরণের সুপারিশ করেন। ১৮৫৪ সনে লর্ড ডালহৌসী প্রশাসনিক সুবিধার জন্য অনুরূপ মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

১৮৬৬ সনে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা সরকারের ব্যর্থতা এবং তাহার প্রশাসনিক দুর্বলতা যে অনেকাংশে দায়ী, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া তৎকালীন ভারত সচিব লর্ড নর্থকোর্ট বাংলা প্রদেশের সীমানা রদবদলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঠিক ঐ সময় বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম গ্রে শুধু বাংলাদেশকে লইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন, যেখানে প্রদেশের নিজস্ব এক্সিকিউটিভ ও লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল থাকিবে। এই সমস্ত বিষয়ে অভিহিত হইয়া ভারত সচিব, গভর্নর জেনারেল স্যার জন লরেন্সকে বাংলায় বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রদেশ গঠনের পরামর্শ দেন। গভর্নর জেনারেল তাঁহার চিঠিতে ভারত সচিবকে জানান যে, তিনি ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক ও জাতিগতভাবে স্বতন্ত্র আসামকে বাঙলা প্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া একজন চীফ কমিশনারের অধীনে আনিবার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই।

১৮৭২ সনে সর্বপ্রথম ভারতে আদমশুমারীর প্রবর্তন হয়। পূর্বে বাংলা প্রদেশের জনসংখ্যা সম্বন্ধে সরকারের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা ছিল না। লোক গণনাতে দেখা গিয়েছিল যে, বাংলা প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা ৬ কোটি ৭০ লক্ষ। সেই হেতু ১৮৭৪ সনে বাংলা প্রেসিডেন্সির তিনটি জেলা সিলেট, গোয়ালপাড়া এবং কাছাড়সহ আসামকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিট চীফ কমিশনারশীপ গঠন করা হইল। ১৮৯২ সনে প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া লুসাই পাহাড়কে আসামের সহিত সংযুক্ত করা হইল। ১৮৯৬ সনে আসামের চীফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড বাংলা হইতে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামকে আসামের সহিত যুক্ত করিয়া নতুন প্রদেশ গঠনের সুপারিশ করেন। কিন্তু এই প্রস্তাব বাংলার জনসাধারণের বিরোধিতার জন্য নাকচ হইয়া যায়, কারণ অনুন্নত আসামের সঙ্গে যুক্ত হইলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা নানাদিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। শেষ পর্যন্ত নতুন প্রদেশ গঠনের প্রকল্প কিছুদিনের জন্য বাদ পড়িল। ভাইসরয় নিযুক্তির অল্পদিনের মধ্যেই কার্জন ভারতের প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক সমস্যাগুলো পর্যালোচনা করেন এবং বিশেষভাবে বাঙলা প্রদেশের সীমারেখা তাঁহার নিকট অযৌক্তিক মনে হয়। সেই জন্য তিনি পূর্বের বিভিন্ন প্রস্তাব পুনরায় নিরিখ করিতে বসেন।

১৯০৩ সালে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যার এনড্রু ফ্রেজার উড়িয়া ভাষাভাষী সম্বলপুরকে বাংলা প্রেসিডেন্সির সাহত সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব করিলে নতুন প্রদেশ গঠনের বিষয়টি আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। কেননা, সম্বলপুরের সংযুক্তির ফলে বাংলার জনসংখ্যা এবং আয়তন আরও বৃদ্ধি পাইবে। সেই হেতু বাংলা গভর্নমেন্টের প্রশাসনিক দায়িত্ব লাঘব করিবার জন্য তিনি বিহারের ছোট নাগপুরকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং চট্টগ্রাম বিভাগ এবং পার্বত্য-ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে একত্রীকরণের পরামর্শ দেন।

ভারত সরকারের এই সমস্ত রদবদল দ্বারা প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনগণের উন্নতি বিধানই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনে যে ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে সেই বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন না। ১৯০৩ সনে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলোকে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে নূতন প্রদেশ গঠনের কথা অবগত করেন এবং বিশেষভাবে বাংলা ও আসামের ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তন সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য আহ্বান করেন। প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবটিকে পূর্ণ সমর্থন জানায়।

www.pathagar.com

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ রিইজলীর ১৯০৩ সনের ডিসেম্বরে লিখিত এক চিঠি হইতে জানা যায় যে, বাংলা সরকারকে বিরাট প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছাড়াও, রাজস্ব আদায়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রসার প্রভৃতি এবং আরও অনেক জটিল সমস্যার মোকাবিলা করিতে হয়। এই সমস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দায়িত্ব লাঘব অত্যাবশ্যক ছিল। রিইজ্‌লী ভৌগোলিক সীমারেখার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশাসনিক উন্নতির জন্য এই সমস্ত পরিবর্তন যে সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ—সেই বিষয়টি উল্লেখ করেন।

নূতন প্রদেশ গঠনের পশ্চাতে শক্তিশালী প্রশাসনিক যুক্তি ছাড়াও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও যথেষ্ট ছিল। ইহাতে একদিকে যেমন প্রশাসনিক উন্নতি হইবে, অন্যদিকে বহুদিনের উপেক্ষিত পূর্ব ও আসামে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিবে। বস্তুত ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিক হইতে এই এলাকা অবহেলিত হইয়া আসিতেছিল। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। ব্রিটিশ শাসনে এই দেশের যাহা কিছু উন্নতি ও কল্যাণমূলক কাজ হইয়াছিল তাহা ছিল রাজধানী কলিকাতাকেন্দ্রিক। বলা বাহুল্য, কলিকাতা ছিল ইংরাজ শাসনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে একমাত্র কলিকাতাতেই ২২টি কলেজ ও ১টি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। দীর্ঘদিনের অবহেলা, প্রশাসনিক ঔদাসিন্য এবং ফলপ্রসূ প্রকল্পের অভাবে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পূর্ব বাংলার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। কিন্তু কৃষি ও কৃষকের উন্নতির কোনরূপ প্রচেষ্টা না থাকার ফলে উৎপাদনমূলক কার্য বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। এই অঞ্চলের প্রধান অর্থকরী ফসল হইল পাট, যাহা সোনালী সূত্র হিসাবে জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের অধিকাংশ কলকারখানা এবং সকল চটকল স্থাপিত হয় কলিকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর তীরে। ফলে বেকারত্ব পূর্ব বাংলার এক বিরাট অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায়। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতেছিল। ইহার একটি কারণ ছিল যে, চাকুরী ক্ষেত্রে সুদূর কলিকাতায় তাহারা কোনরূপ সহানুভূতি পাইত না। কলিকাতার প্রতি সরকারের অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধতাই পূর্ববঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবনতির অন্যতম কারণ। বাস্তবিকপক্ষে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে কলিকাতার পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইত। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আসাম ও পূর্ববঙ্গের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে প্রসার হইতে পারিত, সেই দিকে সরকারের কোন নজর ছিল না। চট্টগ্রামের উন্নতি হইলে ব্যবসা ও বাণিজ্যের দিক হইতে কলিকাতার গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পাইবে—এই আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ বা উন্নতির কোন চেষ্টা করে নাই। এই অবহেলা ছিল অনেকটা সুপরিকল্পিত। পূর্ব বংগের অধিবাসীরা অধিকাংশই ছিল মুসলমান এবং কৃষিই হইল তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও জীবিকার প্রধান অবলম্বন। অথচ অধিকাংশ জমিদার ও মহাজন ছিল হিন্দু। চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার ত্রুটির জন্য ইহাদের অত্যাচারে কৃষককুল অতিষ্ঠ ছিল। সরকারী কর্মচারীদের শৈথিল্য এবং তাহাদের যোগসাজশে এই অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ, পুলিশ এবং ডাক ব্যবস্থা অত্যন্ত সাবেকী আমলের ছিল। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ চর ও হাওর অঞ্চল এবং নদীগুলোতে চুরি, ডাকাতি ও বেআইনী কার্যকলাপ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অভাব সর্বত্র

www.pathagar.com

অনুভূত হইতেছিল। এমতাবস্থায় লর্ড কার্জন প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করা ছাড়াও ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গ যাহাতে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিতে পারে—সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। কার্যক্ষম সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে জমিদার ও তাহাদের আমলাদের শোষণ কিছুটা হ্রাস পাইবে। সেই জন্য প্রদেশে সাবেকী সীমারেখা আধুনিকীকরণ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। কার্জন আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, যথারীতি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারিলে পূর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণের শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনেতিক জীবন উন্নত হইতে বাধ্য। অতঃপর কার্জন পূর্ব বাংলার সমস্যাসম্বলিত একটি প্রস্তাব ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন।

প্রশাসনিক উন্নতি ও সমতা বিধান ছাড়াও দেশ বিভাগের পশ্চাতে কার্জনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী মধ্য-বুদ্ধিজীবীরা ভারতে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্মদাতা। সেই জন্য প্রথম হইতে তিনি এই শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহাদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও মিউনিসিপ্যাল আইন পাস করেন। বাঙ্গালীদের প্রাগ্রসর চিন্তা, ক্রিয়াকর্ম, দাবী-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাহার কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না। সেই জন্য প্রধানত রাজনৈতিক কারণে তিনি কংগ্রেস ও নূতন জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করিতে মনস্থ করেন। অনেক লেখকের মতে, বাংলা বিভাগ তাহার সুপরিকল্পিত বিভক্তিকরণ নীতির বহিঃপ্রকাশ। ইহাতে একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গের মুসলমানদিগকে খুশী করা হইবে এবং তাহারা ক্রমশ সরকারের প্রতি অনুগত ও সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিবে, অন্যদিকে এই বিভাগ নীতি হিন্দু-মুসলমান বাঙ্গালীদের অখণ্ডতা তথা ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করিবে।

বঙ্গবিভাগ বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। নূতন প্রদেশের সম্ভাব্য সীমারেখা প্রকাশ হইবার পূর্বেই দেশময় প্রতিবাদের ঝড় রহিল। ইহা অপ্রত্যাশিত ছিল না। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠিল। বণিক সমিতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রগুলো একযোগে ইহার তীব্র নিন্দা করিল। সমগ্র দেশ সভা-সমিতির মাধ্যমে বংগ বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের শপথ নিল। জাতীয় কংগ্রেস ইহার বাৎসরিক সভায় এই বঙ্গবিভাগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলিয়া মন্তব্য করিল এবং ১৯০৩ ও ১৯০৪ সনে সরকারী নীতির প্রতিবাদ করিল।

এই সমস্ত প্রতিবাদের মূল বক্তব্য ছিল এই যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি বাঙ্গালীদের স্বার্থের পরিপন্থী। ইহা অখন্ড বাঙ্গালী জাতিকে দ্বিখন্ডিত করিবে এবং তাহাদের ক্রমবর্ধমান একাত্মতা-ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হইবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত উন্নয়নগামী বিভাগের জনসাধারণকে আসামের মত একটি অনুন্নত প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করিলে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই অঞ্চলের জনগণ লেঃ গভর্নরের প্রশাসন, লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল, রেভেনিউ বোর্ড ও হাইকোর্ট হইতে বঞ্চিত হইবে।

১৯০৪ সনের প্রথমদিকে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা সফর করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের অবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করা এবং সেখানকার নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের চেষ্টা করা। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ সফর করেন। তিনি সর্বত্র বঙ্গবিভাগবিরোধী উত্তেজনা লক্ষ্য করেন। এই আন্দোলনের কর্ণধার ছিল হিন্দু নেতৃবৃন্দ। এই উত্তেজনার পশ্চাতে যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগই বেশী ছিল। কার্জন গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেন যে, দীর্ঘদিনের অবহেলা ও অবিচারের জন্য

www.pathagar.com

পূর্ববঙ্গের প্রশাসনযন্ত্র প্রায় অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছাইয়াছে। ময়মনসিংহের এক জনসভায় তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ গঠন করিয়া সেখানে একটি সক্ষম শাসনযন্ত্র গড়িয়া তুলিবার ইঙ্গিত প্রদান করেন। এই ব্যাপারে তিনি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি আরও আভাস দিলেন যে, নূতন প্রদেশ একজন লেঃ গভর্নরের অধীনে থাকিবে এবং ইহার প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও নিজস্ব রেভিনিউ বোর্ড থাকিবে। ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর সঙ্গে কার্জনের দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেখানে লর্ড কার্জন পূর্ব বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন প্রদেশ গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা খুশী হইয়াছিল যে, প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদিগকে আর বিভিন্ন কাজে সুদূর কলিকাতা পর্যন্ত যাইতে হইবে না। ইহা ছাড়া পূর্ববঙ্গে নূতন প্রদেশ গঠিত হইলে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের উন্নতি এবং ঢাকার লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা ছিল। অনেকদিক ভাবিয়া সলিমুল্লাহ্ সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। কোন কোন লেখক প্রচার করেন যে, সরকার সুবিধামত শর্তে ঋণ দিয়া সলিমুল্লাহকে হাত করেন। কিন্তু তাহাদের এই বক্তব্যের বিশেষ নির্ভরশীল কোন প্রমাণ নাই। কারণ প্রদেশ বিভাগের দাবী মুসলমানদের তরফ হইতে আসে নাই। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে কোন কোন মুসলিম নেতা ও জমিদার ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইহার প্রতিবাদ করে। কিন্তু যখন ঢাকাকে রাজধানী করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব হয় তখন তাহারা কলিকাতার আধিপত্য হইতে নিস্তার পাইবে এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা দূর হইবে।

ইতিমধ্যে ১৯০৯ সনে মে মাসে সর্বপ্রথম লণ্ডনের "Standard" পত্রিকায় বঙ্গবিভাগ ভারত সচিবের অনুমোদন লাভ করিয়াছে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। খবরে আরও প্রকাশিত হয় যে, নূতন প্রদেশে আসামের সঙ্গে বাংলার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ যুক্ত হইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রদেশ সৃষ্টি হইবে। ১৯০৫ সনের ১৯শে মে বিভিন্ন পত্রিকায় নূতন প্রদেশের সীমারেখা প্রকাশিত হয়; দার্জিলিং নূতন প্রদেশ হইতে বাদ পড়িল কিন্তু জলপাইগুঁড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং মালদহ সংযুক্ত হইল। ঢাকা রাজধানী এবং চট্টগ্রাম বিকল্প রাজধানী নির্বাচিত হয়। এই নূতন প্রদেশের আয়তন হইল ১ লক্ষ ৬ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ এবং হিন্দু ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং বাকী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম হইতেই হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। তাহারা বিভিন্ন যুক্তি ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিফল হইল। হিন্দুদের প্রবল বাধা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার তাহাদের সিদ্ধান্তে অটল রহিল। নূতন প্রদেশের বিস্তারিত সীমারেখা প্রকাশিত হয় মে মাসে এবং ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর হইতে উহা কার্যকরী হইবে, এই সংবাদে হিন্দু নেতাদের মনে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। তাহারা যাহাতে নূতন প্রদেশ বাস্তবায়ন না হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহাদের পত্র-পত্রিকায়, বক্তৃতামঞ্চে ইহাকে বাঙ্গালিবিরোধী, জাতীয়বাদীবিরোধী এবং বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁহার 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয়তে ইহাকে 'জাতীয় দুর্যোগ এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সঙ্কটময় মূহূর্ত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তবে তাহার অনেক উক্তি যে স্ববিরোধী এবং রাজনৈতিক চালপ্রসূত ছিল—সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

লর্ড কার্জন তাঁহার জবাবে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এই বিভাগ দ্বারা এই অঞ্চলের নিপীড়িত জনসাধারণের শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে তাহারা ক্রমশঃ পশ্চিমাঞ্চলের

www.pathagar.com

অধিক ভাগ্যবান এবং উন্নত ভাইদের সমতুল্য হইতে পারিব। ইহাতে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতিরই উন্নতি হইবে। বর্তমানে তাহারা একটি অঞ্চলে নেতৃত্ব করিতেছে, ভবিষ্যতে তাহারা দুইটি অঞ্চলে কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। তিনি বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে নবগঠিত প্রদেশকে পূর্ণ সমর্থন জানাইতে আহবান করেন। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি তাহার উদ্দেশ্যের অপব্যাখ্যা করে এবং কার্জনকে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষারোপ করে। ইহারা আরও প্রচার করে যে, কার্জনের বিভেদ নীতির ফলে মুসলমানদের মনে উচ্চাকাংখা জাগিয়াছে এবং ইহার ফলে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের দ্রুত অবনহি ঘটিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত উক্তি ছিল অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং ফাঁকা। কারণ কার্জন হিন্দুমুসলিম বিরোধের জনক ছিলেন না। ঐতিহাসকি ডঃ স্ট্যানলী ওলপার্টের মন্তব্য এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য,

> "হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত নূতন নহে, ইহা ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি সামাজিক সমস্যা। দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর পরস্পরের সম-অবস্থান সত্ত্বেও ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘাত দূর হয় নাই।"

হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মূল কারণগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ করিলে এই বিরোধিতার তাৎপর্য কিছুটা স্পষ্ট হইবে। বাংলা বিভাগ সত্যই তাহাদের জন্য এক দুর্যোগের ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। নিছক ভাবাবেগ অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা করিয়াই হিন্দু নেতৃবর্গ ইহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শীঘ্রই নূতন ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে এই অঞ্চলের এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মত মুসলিম কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং তৎসঙ্গে নবজাগরণ দেখা দিবে। ফলে পূর্বের ন্যায় আর তাহাদিগকে শোষণ ও নিষ্পেষণ করা যাইবে না। পূর্ববঙ্গের জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হউক- তাহারা কোনদিনই সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করিতে রাজী হয় নাই। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়িত মুসলমান কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগরিত হইবে- এই ভয়ে রাজনৈতিক নেতারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ তাহাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। কাশিমবাজারের মহারাজা মহিন্দ্রচন্দ্রনন্দী এক প্রতিবাদ সভায় সভাপতির ভাষণে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন :

নূতন প্রদেশে মুসলমানরা হইবে সংখ্যাগুরু আর বাঙ্গালী হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে স্বদেশেই আমরা হইব প্রবাসী। আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমি উদ্বিগ্ন। বাস্তবিকপক্ষে ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনর্জাগরণ এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে হিন্দুদের মনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার বীজ মাথাচাড়া দিয়া উঠে। তখন এই আন্দোলন নিছক ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। ক্রমশঃ ইহা মুসলিমবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। হিন্দু নেতৃবর্গের কায়েমী স্বার্থ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধই তাহাদিগকে এত উত্তেজিত এবং মারমুখো হইতে বাধ্য করিয়াছিল। জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। ব্রিটিশ শাসনের শুরু হইতে ইহারা নানা প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেছিল। এই সমস্ত জমিদারদের অনেকেই এই অঞ্চলের সম্পদ অপরহণ করিয়া তাহাদের ঐশ্বর্যের নিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছিল কলিকাতায়। এই সমস্ত অঞ্চলের উন্নয়ন বা জনগণের সুখ-সুবিধার দিকে তাহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। অনুপস্থিত জমিদার তাহাদের নায়েব গোমস্তার সাহায্যে জমিদারী শাসন করিত। এই সকল ন্যায়েব গোমস্তাদের উৎপীড়নে পূর্ববঙ্গের কৃষকরা জর্জরিত ছিল এবং ক্রমশইঃ গ্রামের আর্থিক

www.pathagar.com

সমৃদ্ধি ধ্বংস হইতেছিল। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হইলে নূতন প্রদেশে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে এবং নূতন পুঁজিপতির জন্ম হইবে, ফলে তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসা এবং মুনাফা নষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিবে- এই ভয়ে কলিকাতার পুঁজিপতি এ ব্যবসায়ীরা এই নূতন প্রদেশে গঠনের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। শেরে বাংলা, এ. কে. ফজলুল হক একদা বলিয়া ছিলেন, "Politics of Bengal is in reality economics of Bengal"-"বাংলার অর্থনীতিই বাংলার আসল রাজনীতি।" শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, আইনজীবী এবং সাংবাদিকরাও অনুরূপ কারণে ভীত ছিল। ঢাকাতে নূতন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হইলে তাহাদের আইন ব্যবসায়ে ভাটা পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। কারণ অধিকাংশ মক্কেলই ছিল পূর্ববঙ্গের। ইহা ছাড়া ঢাকাতে নূতন সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রের চাহিদাও অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। এই কারণে এ্যাংলো ও হিন্দু পরিচালিত পত্রিকাগুলি বাংলা বিভাগের প্রতি বিরূপ ছিল। উপরোক্ত শ্রেণীর লোকরা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্যই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতা ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এবং সুরেন্দ্রনাথ, বিপিণচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি নেতারা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন।

কার্জন লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, কিভাবে কলিকাতার স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিক সারা দেশের জনমতকে নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করিতেছিল। তিনি কলিকাতা কেন্দ্রিক এই আন্দোলনকে সুনজরে দেখেন নাই। তিনি আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, নূতন প্রদেশে ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া এবং পাটনাতে জনমত গড়িয়া উঠিবে। বাংলার অধিকাংশ মুসলিম নেতারা প্রথম হইতেই নূতন প্রদেশে মুসলমনাদের সার্বিক উন্নতির সূচনা হইবে- এই আশায় ইহাকে স্বাগত জানায়। তাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যখন প্রবল বিক্ষোভ শুরু হয় তখন সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ নূতন প্রদেশের জন্মদিনটিতে মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে আগাইয়া আসেন। ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম ইনস্টিটিউট পত্রিকায় "নূতন প্রদেশ এবং ইহার ভবিষ্যৎ আলোচনা করেন। এই বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করিয়াই খাজা সলিমুল্লাহ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৮৭১ সনের ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে তাহার জন্ম হয়। তাহার পূর্ব পুরুষগণ ব্যবসা উপলক্ষে এই দেশে আসেন এবং পরে জমিদারী ক্রয় করিয়া ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পিতামহ খাজা আবদুল গনি এই অঞ্চলের সামাজিক এবং জনহিতকর কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৭৫ সনে সরকার কর্তৃক তিনি নবাব উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৮৭৭ সন হইতে ইহা তাঁহাদের বংশগত পদবীতে পরিণত হয়। ১৯০১ সনে পিতা খাজা আহসান উল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে পারিবারিক দায়িত্বভার তাহার উপর পড়ে। তখন তিনি মংমনসিংহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। জনহিতকর কার্যে সলিমুল্লাহ কেবল পারিবারিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ন রাখেন নাই বরং নিজে অনেকে নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এই সকল কাজের আরও ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), মিটফোর্ড হাসপাতল (সলিমউল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ), সলিমুল্লাহ্ এতিম খানা এবং ঢাকা কলেজ হোস্টেল (বর্তমানে শহীদ উল্লাহ হল) এখনও তাহার জনহিতকর কার্যের স্বাক্ষর বহন করে।

পারিবারিক ঐশ্বর্য এবং আরাম-আয়েসের মধ্যে মানুষ হইয়াও এই দেশের জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অনগ্রসরতা তাঁহাকে পীড়া দিত। ঢাকার অতীত ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা করিয়া এবং ব্রিটিশ শাসনে ইহার অধঃপতন সলিম

www.pathagar.com

উল্লাহ্‌কে সত্যই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত পূর্ব আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই আদর্শ এবং সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি নূতন প্রদেশ সৃষ্টির প্রস্তাবকে দৃঢ় সমর্থন দান করেন।

১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে উহা বঙ্গভঙ্গকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। প্রতি বৎসর লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গবিরোধী কার্যাবলীর নিন্দা করা হয়। ১৯১০ সনে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত Imperial Council এ বিষয়টি পুনরুত্থাপনের চেষ্টা করিলে বাংলার মুসলিম নেতা শামসুল হুদা এবং বিহারের মাযহারুল হক উহার তীব্র প্রতিবাদ করে। বস্তুতঃ নূতন প্রদেশটি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলিও নূতন প্রদেশ গঠনে আনন্দ প্রকাশ করে। কলিকাতার মুসলিম সাহিত্য সংসদ ইহাকে আশীর্বাদরূপে বর্ণনা করে এবং মুসলিম জনগণকে ইহার সহিত পূর্ণ সহযোগিতার আহবান জানায়। বাংলার তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা বাংলা বিভাগকে পূর্ণ সমর্থন দান করে। কেননা পূর্ব বাংলা ও আসামের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের স্বার্থ এবং ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বর্ণ হিন্দু কর্তৃক তাহারাও কম অবহেলিত ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেস মূলত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিংশ শতকের প্রথম দশকে কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দিয়াছিল এবং আন্দোলনে সেইটি কিছুদিনের জন্য ধামাচাপা পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে চরমপন্থী অরবিন্দ ঘোষ, বিপিণচন্দ্র পাল প্রমুখ আসিয়া যোগ দিয়া আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে। বাংলার বাহিরে চরমপন্থী নেতাও পূর্ববঙ্গের স্বার্থবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেন। বঙ্গভঙ্গকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া কংগ্রেস হিন্দুদের ভিতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে। তবে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের যে রূপ ছিল তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। কংগ্রেস ক্রমশঃ এই আঞ্চলিক বিরোধকে সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ দিতে থাকে।

যেইদিন বঙ্গভঙ্গ সরকারীভাবে ঘোষিত হইল সেইদিন কংগ্রেস দেশব্যাপী শোকদিবস পালন করে। বাঙ্গালীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক 'রাখী বন্ধন' অর্থাৎ বাহুতে লাল ফিতা ধারণ করে, ১৬ই অক্টোবর উপবাস করে, সর্বপ্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখে এবং আত্মশুদ্ধির জন্য সকালে খালি পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গাস্নানে যায়। হিন্দুদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগানোই ছিল উক্ত কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য। যে পর্যন্ত এই আন্দোলন দ্রুত মুসলিমবিরোধী আন্দোলনে মোড় নিল। ফলে পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হইল। স্বদেশ বন্দনার নামে আন্দোলনকারীরা নবহিন্দুবাদের জনক বঙ্কিম চন্দ্রের মুসলিম বিদ্বেষমূলক সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালু করিল। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্র নেতা তিলকের গো-রক্ষা আন্দোলন, শিবাজী প্রবর্তিত গণপতি উৎসবকে তাহাদের তালিকাভুক্ত করিল। নেতৃবর্গের উস্কানিতে আন্দোলন গুরুতররূপ ধারণ করে, ১৯০৫ সনে বারানসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থীরা কংগ্রেসকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করে।

পূর্ব বংলার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নূতন প্রদেশকে টিকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে সলিমুল্লাহ্ আপোষহীন সংগ্রাম করেন। পূর্ববঙ্গের উদীয়মান নেতা ফজলুল হক, ধানবাড়ীর জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁহাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ইঁহারা পূর্ববঙ্গের

www.pathagar.com

বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া নতুন প্রদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং ইহার স্বপক্ষে জনমত গঠনে সচেষ্ট হন।

ইতিমধ্যে ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন পদত্যাগ করেন। প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচিনারের সঙ্গে সামরিক প্রশাসনক্ষেত্রে মতবিরোধই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। লর্ড মিন্টো নূতন ভাইসরয় হইয়া আসিলেন তাহার নিকট ভারত সভার পক্ষ হইতে প্রদেশ বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু মিন্টোর জবাব বাঙ্গালী নেতা এবং দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ইংল্যান্ডে কংগ্রেস সমর্থক পার্লামেন্টের সদস্যরা হেনরী কটনের নেতৃত্বে তোড়জোড় শুরু করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে তাহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্য চাপ দিতে থাকে। ভারত সচিব লর্ড মর্লে ইহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, বাংলা বিভাগ পরিবর্তন সাপেক্ষ নহে। হিন্দু পত্রিকাগুলি মর্লে ও মিন্টোর নীতির সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠে।

দেশের এই উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতে লর্ড মিন্টো কংগ্রেসী নেতাদের খুশী করিবার জন্য (আগস্ট ১৯০৬) পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লেঃ গভর্নর ফুলারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ফুলার প্রশাসক হিসাবে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদীদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতে সচেষ্ট হন। ফুলারের পদত্যাগ মুসলমানরা বিশেষ হতাশ হয় এবং সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে তাহারা ঢাকায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নানাভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রচেষ্টা চালাইয়া আসিতেছিল। অবশেষে তাহারা বৃটিশ সরকারের উপর ঐক্যবদ্ধভাবে ফলপ্রসূ চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি অভিনব পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা আইরিশ জাতীয়তাবাদের অনুকরণে বৃটিশ দ্রব্য বর্জন ও দেশজ দ্রব্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এই অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৯০৫ সনে কলিকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক "সঞ্জীবনী" সর্বপ্রথম বয়কট বা বর্জন আন্দোলনের পরামর্শ দেয়। দেখিতে দেখিতে সমগ্রদেশে বর্জন আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠে। এই আন্দোলন শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করে। সকল বৃটিশ পণ্য বিশেষতঃ ব্রিটিশ বস্ত্র, ইহা ছাড়া লবণ, চিনি, সিগারেট এবং বিলাসসামগ্রী বর্জনের পিছনে যেমন একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি বিধান এবং দেশকে স্বনির্ভরশীল করিয়া তোলা, অন্যদিকে ইহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করা। আন্দোলনকারীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা বাধ্য হইয়া নিজেদের স্বার্থে বৃটিশ সরকারকে তাহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিবে। সারা দেশে দেশজ শিল্প প্রতিষ্ঠার এক নূতন জোয়ার আসে। যুবক ও ছাত্র শ্রেণী এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এই সময় জাপানের নিকট ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার পরাজয় এই দেশের যুব সমাজের মনে নূতন প্রেরণা যোগায়। স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার দীক্ষা তাহারা গ্রহণ করিল। হিন্দু পত্র-পত্রিকা বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, যুবক সম্প্রদায়, জমিদার, মহাজন সকলেই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং নানাভাবে সরকারকে তাহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করিতে ও সত্যাগ্রহ প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু জমিদার ও মহাজনেরা বলপূর্বক দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে বাধ্য করিত। মুসলমান জমিদার ও ব্যবসায়ীরা যাহার এই আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করে তাহাদের সহিত স্বদেশীদের নানা প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলনে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার

www.pathagar.com

ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে ভারতের যে ধনিক শ্রেণীর জন্ম হইল ইহাদের অধিকাংশই হইল হিন্দু। এই শিল্পপতিরা কালক্রমে কংগ্রেসের মেরুদণ্ড হইয়া দাঁড়ায় ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। ক্রমশঃ স্বদেশী আন্দোলনে স্বরাজ আন্দোলনে পরিণত হয়।

যাহা হউক, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। বৃটিশ সরকার তাহাদের বঙ্গবিভাগ সিদ্ধান্তে অটল রহিল। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আন্দোলনকারীরা চরমপন্থী নেতাদের প্ররোচনায় নূতন কর্মপন্থা গ্রহণ করিল। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটানো। বিপ্লবীরা সমগ্র দেশে অগ্নিমন্ত্র ছড়াইতে লাগিল। দেশে সন্ত্রাসবাদী কাজ শুরু হয়। অভীষ্ট অর্জনের জন্য ইহারা হিংসাত্মক নীতি গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করিল না। প্রধানতঃ ঢাকা ও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বিপ্লব সংঘ গড়িয়া উঠে।

বিপ্লবীরা নানা গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার 'যুগান্তর' এবং ঢাকার 'অনুশীলন সমিতি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, অনুশীলন বা চর্চা দ্বারা উন্নতি লাভ ও অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে। প্রথম মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে কলিকাতায় ১৯০৩ সনে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সনে প্রমথমিত্র বিপিণচন্দ্র পালের সহিত ঢাকায় আসিয়া অনুশীলন সমিতির একটি শাখা স্থাপন করেন। ঢাকা অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব পড়ে পুলিন বিহারী দাসের উপর। ১৯০৬ সন নাগাদ কলিকাতায় সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় দল "যুগান্তর" সমিতির জন্ম হয়। অরবিন্দ ঘোষ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারিন্দ্র ঘোষ এই 'যুগান্তর' সমিতি পরিচালনা করেন এবং সমিতির মুখপত্র 'যুগান্তর পত্রিকা' প্রকাশিত হইবার ফলে বাংলার যুবসম্প্রদায় ক্রমশঃই এই দলের দিকে আকৃষ্ট হয়। এমনকি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় বিপ্লবীরা তাহাতে সক্রিয় অংশ নেয়। তাহাদের প্রচেষ্টায় সারা বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন জোরদার হয়। পুলিন দাস ও প্রতুল গাঙ্গুলী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। সমগ্র দেশে গুপ্ত সমিতির বহু শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত সমিতিতে শারীরিক কসরৎ ছাড়াও যুবকদিগকে মারণাস্ত্র ব্যবহার করিতে হত্যা অহরহ চলিতে থাকে। সুদূর চীন ও জার্মানী হইতে বিপ্লবীরা উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য পাইত। ইহারা গভর্নর ফ্রেজার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নর ফুলারকে হত্যা করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষিত হইয়া শত শত যুবক ছাত্র এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৯০৮ সনে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকী এই আন্দোলন করিতে গিয়া জীবন দান করেন। ইহা প্রধানতঃ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত ও বঙ্গভঙ্গ রদই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইলেও কিছু কিছু মুসলমান যুবক এই আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু দেবী কালীর নামে শপথ গ্রহণ এবং 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত চালু করা হইলে মুসলমানদের উৎসাহে ভাটা পড়ে এবং ইহা হিন্দু আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

কিন্তু দেশে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার তাহাদের সিদ্ধান্তে অটল রহিল। বরঞ্চ প্রশাসনযন্ত্র ও দমননীতি সক্রিয় হইয়া উঠিবার ফলে এই আন্দোলন ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণ এই সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে শুরু করে। ঠিক সেই সময় নূতন প্রদেশের ভাগ্যে নামিয়া আসে এক প্রচণ্ড আঘাত। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার বৃটিশ বণিক এবং কংগ্রেসী নেতাদের চাপের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য

www.pathagar.com

হইল এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বার্থে মুসলমানদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করিল না।

১৯১০ সনের শেষের দিকে মিন্টোর স্থলে লর্ড হার্ডিঞ্জ নূতন ভাইসরয় হইয়া আসেন। তিনি প্রথম হইতেই কংগ্রেসী নেতাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য আপোষ-নীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে মনস্থ করিল। এই ব্যাপারে তিনি ভারত সচিবের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। তিনি রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

ইহাতে একদিকে যেমন কলিকাতা সন্ত্রাসবাদীদের হাত হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত থাকিবে, অন্যদিকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে উত্তর ভারতের মুসলমানরাও খুশী হইবে। কারণ দিল্লী এক সময় মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৯১১ সনের ডিসেম্বর মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রাণী মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে উহাদিগকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের এক বিরাট আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার ভারতবাসী দিল্লীতে তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। সম্ভবতঃ এই আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে হঠাৎ করিয়া বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করিলেন। পূর্ব বাংলাকে আবার কলিকাতার প্রশাসনে আনা হইল। সমগ্র বাংলাকে লইয়া নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হইল। বিহার ও উড়িষ্যা একটি নূতন পরিষদে পরিণত হইল। আসাম পূর্বের ন্যায় চীফ কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত হইল। নূতন ব্যবস্থাটি ১৯১২ সনের জানুয়ারী হইতে কার্যকরী হইল। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা প্রতিবাদ সভা করিয়া সরকারী বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ করিল। এই ব্যাপারে সবচাইতে বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ নিজে। ভগ্নমনোরথ নবাব হতাশায় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় ১৯১২ সনে লর্ডহার্ডিঞ্জ ঢাকা আগমন করিলে নবাব এই অঞ্চলের জনগণের শিক্ষার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। ১৯১৫ সনের জানুয়ারী মাসে সলিমুল্লাহ্‌র মৃত্যু হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহার এক যুগ পরেই তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। ১৯২১ সনে ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়াই পূর্ব বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

প্রচলিত বিধি ও রীতি অনুসারে ভারত সরকারের এই প্রস্তাব ইন্ডিয়া অফিসে এসে পৌছার পর প্রথমত সংশ্লিষ্ট বিভাগে এবং কমিটিতে বিবেচিত হতো এবং শেষপর্যায়ে কাউন্সিলে পাঠানো হতো। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদের প্রস্তাবটি ভিন্নতর প্রক্রিয়ায় বিবেচিত হলো। ক্রু এই ভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণের কারণ ব্যাখ্যা করে হার্ডিঞ্জকে লিখলেন -

'বেশ বিলম্ব করেই বিষয়টি কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করবো। আমার বিশ্বাস তাঁরা বিষয়টির গোপনীয়তা রক্ষায় সমর্থ হবেন। কিন্তু মুশকিল হলো তাঁরা সবাই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষায় সমানভাবে প্রশিক্ষণ পাননি। বিশেষ করে, কাউন্সিলের দুজন ভারতীয় সদস্যের বেলায় এ কথা বলা চলে। যা হোক অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি আমি পূর্ব প্রস্তুত এক টি সরকারী উত্তর তাঁদের নিকট উপস্থাপন করবো এবং কোন ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা ছাড়াই তাঁদেরকে সম্মত হতে বলবে। এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে, দিল্লী দরবার আসন্ন ; কাজেই বিস্তারিত এবং দীর্ঘ আলোচনার সময় নেই।

বিষয়টি কাউন্সিলের নিকট উত্থাপনের ব্যাপারে ক্রু দুটি বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। প্রথমত, বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ দেয়া হবে না। দ্বিতীয়ত, কাউন্সিলের অধিবেশন শুধুমাত্র বিধিসম্মত আনুষ্ঠানিকতার জন্য ডাকা হবে। অর্থাৎ পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কাউন্সিলে শুধুমাত্র অবহিত করা হবে এবং সদ্যদের সম্মতি গ্রহণ করা হবে।

অক্টোবরের শেষের দিকে ক্রু কাউন্সিলের সদ্যদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবগত করানোর জন্য মাত্র তিন দিনের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। প্রথম দিনে তিনি লী-ওয়ার্নারের সাথে গোপন আলোচনা করেন। লী-ওয়ার্নার ছিলেন কাউন্সিলের একজন খ্যাতনামা সদস্য। ক্রু দেখলেন যে তিনি দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের ব্যাপারে অতি উৎসাহী। দ্বিতীয় দিন স্যার চার্লস ইগারটন ব্যাতীত কাউন্সিলের সমুদয় সদস্যকে ক্রু তাই কক্ষে আহবান করেন। স্যার চার্লস ইগারটন ছুটিজনিত কারণে উক্ত বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। উক্ত বৈঠকে ক্রু পরিকল্পনাটি তাদের নিকট

www.pathagar.com

প্রকাশ করেন এবং এ-সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চান। তৃতীয় দিনে ভারত সরকারের প্রস্তাব এবং ইন্ডিয়া অফিসের উত্তরের ওপর সদস্যদের মন্তব্য প্রকাশ করতে বলা হয়। কাউন্সিলের সদস্য এজারলী, র‍্যালে, থমসন প্রতিবাদ না জানালেও উল্লেখ করেন যে, বিষয়টির গুরুত্বের উপর লক্ষ্য রেখে হঠাৎ করে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ নয়। বাঙালী মুসলমানদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন থিওয়র মরিসন। অবশ্য স্যার হিউ বার্নস একমাত্র সদস্য যিনি সরাসরি প্রতিবাদ করে বসলেন। তিনি অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতি আপত্তি না জানালেও দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে নেবার পরিকল্পনাটি সমর্থন করতে রাজী ছিলেন না। কাউন্সিলের অন্যতম ভারতীয় সদস্য কে, জি গুপ্তও এ বিষয়ে স্যার হিউ বার্ণসের সঙ্গে একমত হলেন। অপরদিকে লী-ওয়ার্নার লা-টুশে এবং আলী বেগ (ভারতীয় মুসলিম সদস্য) অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। মোটামুটিভাবে কাউন্সিল সদস্যদের প্রতিক্রিয়া ক্রু-কে নিরাশ করেনি। উপরন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সদস্যগণ পরিকল্পনাটির গোপনীয়তা সম্পর্কে (যা তিনি ইতিমধ্যে বারবার তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন) যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন।

১ নভেম্বর কাউন্সিল সমস্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করেন। কাউন্সিলের নিকট থেকে অনুমোদন লাভ করার দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়াটি ক্রুর জন্য ছিল তাঁর স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টিকারী একটি অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই সফলতা তাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছিল।

পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ রেখাটি মন্ত্রী পরিষদকে অবহিত করার আগেই ক্রু মর্লেকে জানালেন। সম্রাটের দরবার ঘোষণার মাধ্যমে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়নের প্রয়াস মর্লের কাছে আপত্তিজনকে মনে হলো। তিনি বক্তব্য রাখলেন যে, এতে ভবিষ্যতে প্রচন্ড সমালোচনার ঝড় উঠবে। উপরন্তু ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহের সংজ্ঞা আলোচনা না করেই এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের অশুভ ফলশ্রুতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোট কথা, সমস্ত পরিকল্পনাটি সম্রাটকে ছাড়াই বাস্তবায়নের পক্ষে মর্লে মন্তব্য প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্রুর বিবেচনায় তা ছিল অসম্ভব। পটভূমি ব্যাখ্যা করে একটি দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে ৮ নভেম্বর ক্রু পরিকল্পনাটি মন্ত্রী পরিষদের নিকট উত্থাপন করেন। এখানেও ক্রু বিনা সমস্যায় উৎরে যেতে পারলেন না; কারণ এক দীর্ঘ সমালোচনাপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সমালোচনার দুটি দিক ছিল; প্রথমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অগোচরে সিদ্ধান্ত নেয়া এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য সম্রাটকে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রায় দু'দিন ধরে বিষয়টি আলোচিত হলো, কিন্তু সমস্যার সমাধান খুজে পাওয়া গেল না? । অবশ্য মন্ত্রী পরিষদকে বোঝানো হলো যে ভারতরে আভ্যন্তরীণ শাসনতান্ত্রিক রদবদলের প্রশ্নে ভারত সচিব ও ভাইসরয়ের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রতি মন্ত্রী পরিষদের হস্তক্ষেপ করা উচিৎ না। ফলে, প্রথম অভিযোগের অবসান হলো। দ্বিতীয় অভিযোগের অবসানের জন্য প্রধানমন্ত্রী এ্যাস কুইথ একটি উপায় বের করলেন; দিল্লী দরবারের ঘোষণার সংগে সংগেই লর্ড ও কমন্স সভায় একই সাথে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হবে। এই আশ্বাসের পর মন্ত্রী সভা তাদের সম্মতি জানালো। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তি এবং তর্কের কৌশলে মন্ত্রী পরিষদকে সম্মত করানো হলো।

দিল্লী দরবারে ঘোষণার আগে বিষয়টি বিরোধী দলকে যেন না জানানো হয়, সে বিষয়ে ক্রু এবং হার্ডিঞ্জ উভয়ে একমত ছিলেন কিন্তু এতে করে প্রচলিত শাসণতান্ত্রিক বিধি লংঘন করা হতো এবং সে কারণেই মন্ত্রী পরিষদের সব সদস্যই ক্রুকে বাধ্য করলেন বিষয়টি বিরোধী দলকে জানাতে। ফলে, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, দরবারের একদিন আগে বিষয়টি বিরোধী দলের গোচরীভূত করা হবে। রক্ষণশীল দলের নেতা ল্যান্সডাউন এবং কার্জনকে এই গোপন সংবাদ

www.pathagar.com

জানানোর দায়িত্ব দেয়া হলো মর্লেকে। নিষয়টি অবহিত হওয়ার পর, বিশেষ করে কার্জনের প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। যথেষ্ট বিচলিত হয়ে তিনি এইমর্মে জোরালো বক্তব্য রাখলেন যে, এই শাসনতান্ত্রিক রদবদল ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল জনমতের কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরন্ত তিনি বিক্ষুব্ধভাবে বললেন যে, বিষয়টি লর্ড সভায় যথাসময় আলোচনা করবেন।

১২ ডিসেম্বর দিল্লীতে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ ঘোষণা লর্ড এবং কমন্স সভায় করা হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রথমবারের মত পার্লামেন্ট বিষয়টি জানালো।

এই ঘোষণার সামগ্রিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করে বিরোধী দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য এ্যামপটহিল কার্জনকে জানালেন -

"I think it was a right thing done in a wrong way. It was a risky thing to make the king responsible for this bolt from the blue .... It was, of course, entirely contrary to our constitutional principles but I suppose that in these days when constitution is being recklessly destroyed no body will take much account for that." ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গপরিকল্পনায় এ্যাম্পটহিলের কিছু অবদান ছিল, কাজেই বিষয়টির উপর মন্তব্য করার অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আভাস দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গে রদের বিধিবহিভূর্ত এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে কেউ মাথা ঘামাবে না বা কোন সমালোচনা হবে না। বাস্তবে কিন্ত তাঁর এ ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯১২ কমন্সসভায় রক্ষণশীল দলের সদস্য বোনারল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে বিধি-বহির্ভুত।

www.pathagar.com

বঙ্গ-বিভাগ ও বঙ্গ-বিভাগ রদের ফলাফল

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

বঙ্গ বিভাগ ও বঙ্গ বিভাগ রদ--এ দু'টি ঘটনা বিশ শতক-উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা।* এর ফলে হিন্দু ও মুসলিম জাতির মধ্যে পরস্পর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং উভয় জাতির রাজনীতি পৃথক পৃথক দু'টি সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়। মাঝখানে এ কে ফজলুল হক, আব্দুল্লাহ্ সুহ্‌রাওয়ার্দী, কায়েদ-এ-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্, মওলানা মুহম্মদ আলী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের চেষ্টায় ১৯১৬ সালের 'লখনৌ-চুক্তি" থেকে ১৯২৮ সালে 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মিলনধর্মী রাজনীতি চললেও 'নেহেরু রিপোর্ট'-এর পর আবার 'মুসলিম লীগ' ও ' ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর রাজনীতি ভিন্ন ভিন্ন খাতে চলতে থাকে। এই স্বতন্ত্র প্রবাহ শেষ পর্যন্ত উপমহাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রকে বদলে দেয় এবং তা ভারত ও পাকিস্তান-- এ দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। যে অঞ্চল জুড়ে ১৯০৫ সালে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হয়েছিল, অনেকটা সেই এলাকা নিয়েই ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এরপর আড়াই দশকেরও কম সময়ের মধ্যে সেই ভৌগোলিক সীমারেখা জুড়েই সার্বভৌম বাংলাদেশ

---

* সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বলেন ঃ The year 1905 is one of the most memorable in the history of Bengal. It would be no exaggeration to say that it was an epoch-making year, leaving a profound and far-reaching influence on the public life of Bengal and the future of the country. It was the year of the partition of Bengal.

(A Nation in Making, 1925, P. 184)

www.pathagar.com

অস্তিত্ব লাভ করে। কারো কারো মতে, কালের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে এটাই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, প্রশাসনিক এবং মতান্তরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক যে বঙ্গ-বিভাগ রচিত হয়েছিল, তা-ই ছিল সঠিক পদক্ষেপ এবং জনগণের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক থেকেই তা ছিল স্বাভাবিক।

বঙ্গবিভাগের স্কীমটি ছিল মূলত বৃটিশ গভর্নমেন্ট-পরিকল্পিত একটি প্রশাসনিক ব্যাপার, যদিও পরবর্তী সময় কংগ্রেসীদের আচরণ ও দাবি-দাওয়ার চাপে তা রাজনীতির দিকে মোড় নেয় এবং কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রখরতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।১ এর মৌলিক পরিকল্পনায় হিন্দু মুসলিম নেতৃবৃন্দের কোন ভূমিকা ছিল না। মোগল আমলে সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ কর্তৃক ১৭৩৩ খৃঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা-- এই তিনটি প্রদেশকে একত্র করে বঙ্গদেশে পরিণত করা হয়। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৭৭২ খৃঃ ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে বাঙলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এ সময় বঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখা মোগল আমলে যা ছিল, তা-ই স্থির থাকে। দু'বছর পর ওয়ারেন হেস্টিংস্‌কে ইংরেজ অধিকৃত ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। বাংলার প্রশাসনিক দায়-দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থা আশি বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৮৫৪ সালে বঙ্গদেশের জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থা আশি বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময় এবং এর পূর্বেও আসাম বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশ বছর পর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর লোকসংখ্যা ও রাষ্ট্রীয় আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনিক গুরুভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে আসামকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ১৮৭৪ সালে আসামের জন্য একজন চীফ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর ১৯৮২ সালে বঙ্গদেশস্থ লুসাই পার্বত্য অঞ্চলকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবুও বঙ্গদেশের আয়তন বিশালই থেকে যায়। ১৯০৫ সালে এর লোকসংখ্যা ছিল আট কোটি এবং এর ভৌগোলিক আয়তন ছিল দেড় লক্ষ বর্গমাইল। ১৮৬৮ খৃঃ থেকেই বঙ্গ-বিভাগের প্রশ্নটি নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টের জল্পনা-কল্পনা ছিল। লর্ড এ্যালগিন গভর্নমেন্ট স্পষ্ট ভাষায় বঙ্গ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ বাস্তবায়িত করেন। ১৮৯৬ সালে একবার চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়। সেই প্রস্তাব কারুর সমর্থন লাভ করেনি।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর ভারত গভর্নমেন্টের এক পত্রে বলা হয় যে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করার বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের কেউ এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌র মতও ছিল অনুরূপ। তিনি অবশ্য ১৯০৪ সালের ১১ই জানুয়ারী ঢাকার নেতৃস্থানীয় লোকদের এক সভা আহ্বান করেন এবং তাঁদের মতামত যাচাইয়ের জন্য সরকারের বিবেচনাধীন প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। সভার সকলেই ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সে সময় নওয়াব বাহাদুর একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি ছিল এই ঃ সমগ্র আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ, (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার ব্যতীত) এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের যশোহর ও খুলনা জেলাদ্বয় নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে ব্যবস্থাপক সভা বিশিষ্ট একটি গভর্নর-শাসিত প্রদেশ গঠন করা যেতে পারে।২ হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করেন। ৩

www.pathagar.com

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে বড়লাট কার্জন তাঁর পরিকল্পিত বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে জনমত যাচাই ও গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্য পূর্ববঙ্গ সফর করেন। তিনি ১৬ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায়, ২০শে ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে জনসভায় বক্তৃতা করেন। ঢাকায় বড়লাটের আগমন উপলক্ষে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে রাজপথ সুসজ্জিত করেন। অন্যান্য আয়োজনও জাঁকালোভাবে করা হয়। বড়লাট নওয়াব সাহেবের বাসভবনেই তাঁর মেহমানরূপে অবস্থান করেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে আহ্সান মঞ্জিল প্রাঙ্গণে সামিয়ানাতলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে একখানি, জনসাধারণের পক্ষ থেকে একখানি, প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির দিক থেকে একখানি এবং জমিদার শ্রেণী কর্তৃক একখানি--মোট চারখানি অভিনন্দনপত্র বড়লাটকে প্রদান করা হয়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির মানপত্রে বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে বলা হয় ঃ 'আমাদের বিশ্বাস, এ সুশিক্ষিত ও উন্নত জেলাকে (ঢাকা জেলা) অনুন্নত প্রদেশের (আসাম) সঙ্গে তাদের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে যুক্ত করা হলে এ জেলার উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে। আমাদের জেলা পূর্ববঙ্গের শিক্ষা ও সমাজের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। বঙ্গের অবশিষ্টাংশ থেকে পৃথক করে আমাদেরকে সর্ববিষয়ে অনুন্নত জাতির শাসন প্রথাধীন করা হলে সেই পরিবর্তনকে আমরা আতংকের চোখে না দেখে পারি না। যদি বঙ্গের পুনর্গঠন ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, তবে আমাদের আবেদন হলো, বঙ্গের আরো কতকাংশ নিয়ে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরসহ লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিল ও রেভিনিউবোর্ড যেন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমাদের সমস্ত অধিকারও যেন অব্যাহত থাকে।'৪

'প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির'র পক্ষ থেকে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তাতে বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে বলা হয়ঃ 'গভর্নমেন্ট মুসলমান-অধ্যুষিত জেলাসমূহকে আসাম প্রদেশভুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন। বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জেলার সাথে আমরা ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে একসূত্রে আবদ্ধ আছি। এই প্রস্তাব কার্যে অসুবিধা হবে। কিন্তু এই নবগঠিত প্রদেশকে স্বতন্ত্র একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীন করে ঢাকা নগরীকে এক রাজধানী করা হলে এবং শিলংকে তাঁর গ্রীষ্মমাসের জন্য নির্দিষ্ট করা হলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না, অধিকন্তু বিশেষ সুবিধাই হবে।'৫ অন্য দু'টি মানপত্রে ঢাকা জেলাকে আসামের সাথে যুক্ত না করার জন্য আবেদন করা হয়।৬

মানপত্রসমূহের উত্তরে বড়লাট বলেন ঃ 'গভর্নমেন্টের অকাট্য মন্তব্য ঘোষণা করতে আমি আসিনি। যেসব বিষয়ের উপর আমাদের মন্তব্য নির্ভর করে, তা এখনো হস্তগত হয়নি। এখন আমি স্থানীয় লোকের মতামত জানতে এবং গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে এসেছি। ... বঙ্গের প্রশাসনের সুব্যবস্থার জন্যই প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট গঠন করা হয়। কিন্তু এরূপ অবস্থায় কোন গভর্নমেন্টই আট কোটি লোকের শাসন ব্যবস্থা করতে পারেন না। ... যাঁরা বাঙ্গালী জাতির একত্রাবস্থানের পক্ষে দৃঢ়ভাবে ওকালতি করছেন এবং বঙ্গ-বিভাগকে নিতান্ত নিষ্ঠুর পদক্ষেপ ও ক্ষতিকর কার্যক্রম বলে ব্যাখ্যা করছেন, তাঁরা কি দেখতে পাচ্ছেকী না যে, এতে তাঁদের উদ্দেশ্যেরই অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে। যাঁরা এভাবে অজ্ঞ কৃষক ও শহরবাসীদেরকে আন্দোলনে উত্তেজিত করছেন, তাঁদেরকে আমি ঘৃণার চোখে দেখি। অনেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোক এরূপ মত পোষণ করছেন বলে যে দাবি করা হয়, তাতে আমার সন্দেহ রয়েছে। ... অতএব যদি এমন কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যাতে ঢাকাকে নতুন প্রদেশের রাজধানী করার ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে এ অঞ্চলবাসী সুশিক্ষিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে তাদের দাবি-দাওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে, যেখানে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ সুগম হবে,

www.pathagar.com

সেই প্রস্তাবে অনুন্নত আসামভুক্ত হওয়ার ভয় দেখিয়ে এখানকার নেতৃবর্গ যদি এই অঞ্চলবাসীদেরকে এ সকল সুবিধা বিসর্জন দিতে উপদেশ দেন, তবে তা সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে কি?

বড়লাটের বক্তৃতা থেকে বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত আঁচ করতে পেরে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু প্রেসসমূহ বঙ্গ বিরোধিতা শুরু করেন। তবু বড়লাট কার্জন বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে মুসলিম নেতৃবৃন্দের হাঁ-সূচক অভিমত জানতে পেরে ১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই যথারীতি বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা করেন।৮ কেবল তখনি দেশবাসী বঙ্গ-বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবহিত হয়। এই ঘোষণায় বলা হয়, ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে নতুন প্রদেশ কার্যকর হবে। ভারত গভর্নমেন্টের অতিরিক্ত গেজেটে নবগঠিত প্রদেশ সম্পর্কে বলা হয় ঃ 'চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ, মালদহ জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য এবং আসাম প্রদেশ নিয়ে একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত প্রদেশ গঠিত হবে। নতুন প্রদেশের সাথে বঙ্গের সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দার্জিলিংও (জলপাইগুঁড়ি ও কুচবিহারসহ) পূর্ব বঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করা হলো। নুতন প্রদেশের নাম হবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং চট্টগ্রাম এ প্রদেশের প্রধান বন্দর-নগর থাকবে। নতুন প্রদেশের আয়তন হবে এক লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত চল্লিশ বর্গমাইল (বর্তমান বাংলাদেশের দ্বিগুণ) এবং লোকসংখ্যা হবে তিন কোটি দশ লক্ষ; এর মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ মুসলমান এবং এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু। নতুন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা ও দু'জন সদস্য রেভিনিউ বোর্ড থাকবে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের এলাকা পূর্ববৎ রইল। বঙ্গদেশে থাকবে তার পূর্বদিকস্থ বিভাগসমূহ ছোটনাগপুরের ৫টি হিন্দী রাজ্য ছাড়া বাদ বাকি অংশ, আরো থাকবে সম্বলপুর ও ৫টি উড়িয়া রাজ্য। এর পরিমাণ হবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচ শ' আশি বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা হবে পাঁচ কোটি চল্লিশ হাজার; এর মধ্যে চার কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু এবং ষাট লক্ষ মুসলমান। মোটের উপর বর্তমান বঙ্গ ও পূর্ব বাঙলা-আসাম প্রদেশের জনসংখ্যা যথাসম্ভব কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে এবং দু'টি স্বতন্ত্র প্রদেশ সমুন্নত শাসনব্যবস্থাধীন হবে।'

জুলাই মাসে (১৯০৫) বঙ্গ-বিভাগ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নেতৃবৃন্দ রাগ-রোষে ফেটে পড়েন। এ পর্যায়ে বঙ্গ-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনটি দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করে। হিন্দু নেতাদের সর্বাধিনায়ক ছিলেন 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'-এর কংগ্রেসপন্থী সেক্রেটারী কলকাতাবাসী সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫)। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ফরিদপুরের অশ্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২), আনন্দ চন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯০৫) ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বর্ধমানের স্যার রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১), নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ ছিলেন নরমপন্থী, আর বরিশালের অশ্বিনী কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) ও কলকাতার অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫৯) ছিলেন চরমপন্থী। ১০ ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গ-বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু এর পূর্বেই হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গ-বিভাগকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে উঠে পড়ে লাগেন। তাঁদের এ সময়কার মনোভাব ব্যক্ত করে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন ঃ The announcement fell like a bomb-shell upon an astonished public. But in our bewilderment we did not lose our heads. We made up our minds to do all that lay in our power with the aid of the constitutional means at our disposal, to reverse or at any rate to obtain a modification of the partition. We felt that we had been insulted, humiliated and tricket. We felt that the whole of our future was at stake, and that it was a

www.pathagar.com

deliberate blow aimed at growing solidarity.... The month of October was rapidly approaching. The 16th October was to be the day on which the partition of Bengal was to take effect. For Bengal it was to be a day of National mourning. We were resolved to observe it as such, and the country warmly responded to our call. ১১ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (১৯০৫ খৃঃ) হিন্দু প্রতিনিধি গণ বঙ্গ-বিভাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধি ভুপেন্দ্রনাথ বসু পূবইবঙ্গের প্রতিনিধি অম্বিকারচরণ মজুমদার এবং উত্তর বঙ্গের নেতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী পরিষদে বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ করেন।১২ ঐ বছর (১৯০৫) ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে সুরেন্দ্রনা ব্যানার্জীর উদ্যোগেও মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে হিন্দু নেতৃবৃন্দের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বভঙ্গ থেকে ৪৬ জন প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন। এ সভায় বাবু নবেরন্দ্র নাথ সেন একটি প্রস্তাবে বলা হয়ঃ 'যতদিন না বঙ্গবিচ্ছেদ প্রত্যাহৃত হবে, ততদিন বৃটিশপণ্য-সম্ভার ব্যবহার করা হবে না। ১৩ এরূপ প্রস্তাব মফঃস্বলের অনেক প্রতিবাদসভায় ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছিল। কলকাতার টাউন হলের সভায় সেগুলোর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। বঙ্গ-বিভাগ বিরোধিতার এ পর্যায়ে হিন্দু নেতৃবৃন্দ প্রথম স্তরের মৌখিক প্রতিবাদ ছাড়িয়ে সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করেন। বয়কট আন্দোলনের পাশাপাশি তাঁরা স্বদেশী মাল ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানস্থাপন, কর্মচারীদের সরকারী অফিস বর্জন, প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আন্দোলনের এ পর্যায়ে রাজনীতিতে অনভ্যিবকারাও নেতৃত্ব দেয়।১৪

আগস্টের (১৯০৫) শেষের দিকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাবু অন্নদা চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা থেকে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ও দেলদুয়ারের (ময়মনসিংহ) আবদুল হালীম গজনবী হিন্দু মুসলিম ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বৃটিশ পণ্য বর্জনের পরামর্শ দেন। ১৫ কিছুদিন পর বঙ্গ-বঙ্গের বিরুদ্ধে বড়লাট সমীপে প্রতিনিধি দল পাঠাবারও ব্যবস্থা করা হয়। ১৬ মোট কথা, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা বাঙলার দিকে দিকে বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যান। এসব প্রতিবাদের মুখেও ১৯০৫ সালের ১৬ই অকটোবর ইতিপূর্বে ঘোষিত বঙ্গ-বিভাগ কার্যকর করা হয়।

১৯০৬ সালের দিকে প্রধানত অনভিজ্ঞ ও অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতা ও বুদ্ধিজীবীদেতর হাতে বঙ্গ-বিভাগবিরোধী আন্দোলন তৃতীয় স্তর তথা মারকুটো পর্যায়ে উপনীত হয়। এ সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়, সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপিত হয় এবং শারীরিক কসরতের জন্য আখড়াসমূহ নির্মিত হয়। এ সময় হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীও সক্রিয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।১৭

১৯০৭ সালের দিকে বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলন ৪র্থ তথা সর্বশেস স্তরে উপনীত হয় এবং তা ১৯০৯ সাল পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চলে এবং ১৯১০ সালের দিকে তা নিষ্ক্রিয়ভাবে অব্যাহত থাকে। চতুর্থ স্তরের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিপিনচন্দ্র পাল, বারেন ঘোষ, অববিন্দ ঘোষ প্রমুখের সাংস্কৃতিক ও হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক প্রচারণার দরুন বঙ্গ-বিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়, যা মুসলমানদেরকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯০৮ সালে 'মুসলিম লীগ'-এর অমৃতসর অধিবেশনে সৈয়দ আলী ইমাম সভাপতির ভাষণে বলেন ঃ

I cannot say what you think, but when I find the most advanced Province of India put forward the sectarian cry of 'Bande Mataram' as the national cry, and the sectarian Rakhibandhan as a national

www.pathagar.com

observance, my heart is filled with despair and disappointment; and the suspicion that, under the clock of nationalism Hindu nationalism is preched in India becomes conviction.১১

বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল সমথনজ্ঞাপক ও অভিবাদনমূলক। কিন্তু এর প্রতি হিন্দুদের বিরোধিতা গোড়ার দিকে ছিল প্রতিরোধমূলক এবং পরবর্তী সময় তা হয়ে উঠে হিন্দু জাতীয়বাদমূলক সন্ত্রাসজনক ও গভনমেন্টকে নতি স্বীকার করানোর অস্ত্রস্বরূপ। বঙ্গ-বিভাগের প্রশ্নটি আঞ্চলিক হলেও তা উপমহাদেশীয় একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। পূর্ববঙ্গের'প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন' ও 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'-এর প্রতিষ্ঠা বঙ্গ-বিভাগের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ত্বরান্বিত হয়। মুসলিম বঙ্গের সর্বময় নেতা সলীমুল্লাহ্ তাঁর প্রধান সহযোগী নওয়াব আলী চৌধুরী ও অন্যান্য মুসলিম নেতা বঙ্গ-বিভাগকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মিঃ স্পীয়ার বলেনঃ

The League was founded in response to the Hindu agitation against the partition of Bengal and that since then the vitality of Muslim separatism was indirect proportion to the militancy of Hinduism 19 ডক্টর কে. কে. আযীয মনে করেনঃ Muslim League is the child of four factors : first, the old belief uttered by Sir Syed Ahmad Khan that the muslims were some how a separate entity; secondly the Hindu character of the Indian National Congress, which did not allow the Muslims to associate themselvs with other Indians; thirdly the agitation against the partition of Bengal, which suggested Hindu designs of dominataion over Muslims; and finally the muslim desire to have their own exclusive electorates for all representative institutions.13

'মুসলিম লীগ' তার প্রতিষ্ঠালগ্নেই ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এক প্রস্তাবে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থে বঙ্গ-বিভাগকে স্বাগত জানায় এবং হিন্দুদের বয়কট আন্দোলনের নিন্দা করে। ২১ ১৯০৮ সালের ৩০-৩১শে ডিসেম্বরে অমৃতসরে 'মুসলিম লীগ' -এর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ্র দোসর নওয়াব আলী চৌধুরী ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দেন এবং বঙ্গ-বিভাগের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে হিনদু নেতৃবৃন্দের বঙ্গ-বিভাগবিরোধী যুক্তিসমূহের অসারতা প্রমাণ করেন।২২ ১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে হিন্দুদের সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলীর নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৪

পূর্ব বাঙলার মুসলিম জনসাধারণ এবং হাতেগোনা অল্প কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান* ছাড়া সকল মুসলিম নেতা ও বুদ্ধিজীবী বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করেন।২৪ বঙ্গ-বিভাগবিরোধী দলের সর্বাধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও স্বীকার করেন যে, নওয়াব সলীমুল্লাহ মুসলমানদের সমর্থন লাভ করেই বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি বলেন ঃ

---

* তন্মধ্যে আবদুর রসুল, আবুল হোসেন, লেয়াকত হোসেন, আবদুল হালীম গনবী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবুল কাসেম, দীন মুহম্মদ, দিদার বক্স, আবদুল গফুর ও আলীমুজ্জামান চৌধুরী ছিলেন অন্যতম।

www.pathagar.com

Amongthem was the late Nawab Salimullah of Dacca,who was the Governments right handed man in supporting the partition and securing the assent of the Mohammedan community of East Bengal. ২৫ নওয়াব সলীমুল্লাহর সৎভাই খাজা আতীকুল্লাহ পারিবারিক কোন্দলবশত প্রথমে বঙ্গ-বিভাগবিরোধী ছিলেন। ১৬ তিনি ১৯০৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন বলেন ঃ I feel very much honoured by being entrusted with this important resolution. I may tell you once that it is not correct that the Muslmans of Eastern Bengal as a body are in favour of the partition of Bengal. The real fact is that, it is only a few leading Mohammedans who for their own purposes supported the mesure ... I very much regret that the views of the meambers of the Khaja family of Dacca, to which I have the honour to belong have been very much misinterpreted It is true that Nawab Salimullah has given his support to the prtition but tht does not prove tht the kahja family is with him in this respect. As matter of fact that is his own individual view and that is not the view of the bulk of the Khaja family. The view of the latter is that partition is a great wrong done both to Hindus and Musalmans and it should be rervoked. ১৭ পরবর্তী সময় তিনি তাঁর এ মত প্রত্যাহার করেন এবং ১৯১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সলীমুল্লাহ্ উদ্যোগে ঢাকায় যে মুসলিম সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি (খাজা আতীকুল্লাহ্) যোগদান করেন এবং সিলেট জেলাকে বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর অন্তভুক্তির প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী কুমিল্লার ব্যারিস্টার

বঙ্গ-বিভাগ ও বঙ্গ-বিভাগ রদের ফলাফল

আবদুর রসুলও এ সভায় যোগদান করেন এবং মুসলিম স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতাকে হেড্ অফিস করে বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবটিও গৃহীত হয়। ১৮ বঙ্গ-বিভাগবিরোধী আন্দোলনের মুসলিম সমর্থকদের সম্পর্কে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর লেন্সলট হেয়ার বলেন ঃ The Mohammedans who took part in the agitation are in many cases the paid agents of the Hindu leaders, while others are under the thumbs of the same men, owing to financial embrrassment, and to the fact that they are under Hindu landlors. There are practically none, who carry any real weight or who can be called representative, ১৯ 'ইসলাম -প্রচারক' বলেন ঃ 'মুসলমান নামধারী কতকগুলি স্বজাতিদ্রোহী নীচাশয় ব্যক্তি হিন্দুদিগের অসদুদ্দেশ্য সাধনের সহায় হইয়াছে, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই।' (বৈশাখ, ১৩১৪) যে সব মুসলমান বঙ্গ-বিভাগের বিরোধিতা করেন, তারা ছিলেন কংগ্রেসপন্থী। কংগ্রেস ছিল যুক্ত জাতীয়তাবাদ ও যুক্ত ভারতের ধারক ও বাহক। বঙ্গ-বিভাগ সমর্থক নেতাগণ ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবদা ও ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রবক্তা। তাই কংগ্রেসীদের দৃষ্টিতে বঙ্গ-বিভাগ তথা

www.pathagar.com

মুসলিম প্রধান পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁদের ঐ নীতির সমর্থনে বঙ্গ-বিভাগের বিরোধিতা করেন।

১৯০৬ সালে ৩০ শে ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক তার পরদিনই (৩১শে ডিসেম্বর) বেরারে জমিদার মৌলবী গুলাম আহমদ খানের সভাপতিত্বে কলকাতায় সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাদের এক সভায় 'ইন্ডিয়ান মুসলমান এসোসিয়েশন' শীর্ষক একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল বলে 'দি বেঙ্গলী 'পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হয়। পত্রিকার ভাষ্যানুসারে মাদ্রাজের কংগ্রেস সদস্য নওয়াব সৈয়দ মুহম্মদকে দলের প্রেসিডেন্ট, মুহম্মদ আলী জিন্নাহকে অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং আবদুর রসূলকে সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়েছিল। মূলত এটা ছিল কংগ্রেসেরই কারসাজি। বস্তুত এরূপ কোন দল গঠিত হয়েছিল কি না, সেটাই সন্দেহের বিষয়। দলের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মুহম্মদ এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না বলে স্বীকারোক্তি করেন।২০ ডক্টর মফিজুল্লাহ্ কবীর বলেনঃ Serious doubts have been expressed about the authenticity of this rival organisation which did not seem to have fulfilled the purpose of counter acting the Moslem League. ৩১ মুসলমান বা খৃস্টান পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলো সাধারণ্যে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করে। কলকাতার মোহামেডান লিটাররি সোসাইটি'ও ইতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেন। ৩২ নবগঠিত প্রদেশের প্রতি কলকাতার মুসলমানদের সমর্থন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এটা ছিল পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের প্রতি তাদের আন্তরিক স্বাজাত্যবোধেরই পরিচায়ক। কলকাতার 'মোসলেম ক্রনিকল" পত্রিকা প্রথমে বঙ্গ-বিভাগের বিরোধিতা করে থাকলেও পরকষণে তা প্রত্যাহার করে নেয়।৩৩ বিহার এবং উড়িস্যার মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও বঙ্গ-বিভাগকে স্বাগত জানান। কারণ তাঁরা এতে 'বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের আধিপত্য থেকে নিস্তার লাভের পথ খুজে পান।৩৪ পক্ষান্তরে আসামবাসীরা পূর্ববাঙলার প্রাধান্যের ভয়ে তা অপ্রীতিকর বলে মনে করেন।৩৫

হিন্দু জনসাধারণ বঙ্গ-বিভাগবিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষে ছিলেন। কেবল তফসিলী সম্প্রদায় ভূক্ত হিন্দুরা, যাদের বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র আর্থিক ও সামাজিক ক্ষোভ ছিল, কেবল তারাই বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে ছিলেন। তফসিলী নেতা আম্বেদকর বলেন ঃ 'সারা বাঙলা, উড়িষ্যা, আসাম এবং এমন কি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি। প্রদেশের সবগুলো সিভিল সার্ভিসই তারা দখল করে নিয়েছিল। বঙ্গ-বিভাগের অর্থ ছিল এ চারণভূমির হ্রাসকরণ। বঙ্গ-বিভাগের প্রতি হিন্দুদের এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ব বাঙলার মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে বাধা দেওয়া।৩৬ পূর্ব বাঙলার কোন কোন বর্ণ হিন্দুকেও বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করতে দেখা গিয়েছিল। তাঁরা নিজেদেরকে হিন্দু বা মুসলমান না ভেবে ভেবে ছিলেন পূর্ববঙ্গবাসীরূপে। এরূপ একজন ছিলেন ভাই গিরীশচন্দ্র সেন। তিনি বলেন ঃ 'আমি বঙ্গ-বিভাগ নীতির বিপক্ষে নই, বরং স্বপক্ষে। আমার বিশ্বাস, এর ফলে পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানাভাবে অভাবগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হবে। ঢাকার রাজধানী ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্যস্থান হতে চললো; পূর্ব বঙ্গবাসীদের অর্থাগমের পথ মুক্ত হলো; এ দেশের রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্যালয় স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হবে; দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে; আসাম প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে বদ্ধ হয়ে বিশেষ উন্নতি

www.pathagar.com

লাভ করবে-এটা ভেবে আমার আহ্লাদ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছেড়ে দেই। বাঙ্গালীদের উন্নতির দর্শন অনেকের চক্ষুশূল হতে পারে। কলকাতা অঞ্চলে পূর্ব বঙ্গনিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা যে কোন অফিসে তাদের (কলকাতাবাসীদের) কেরানীগিরী প্রভৃতি কাজ একপ্রকার এখানকার লোকেরই একচেটিয়া হয়ে রয়েছে।'৩৭ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের কোন কোন হিন্দু সদস্যও বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী-সন্ত্রাসবাদের প্রতিবাদ করেন। ১৯১০ সালের ৫ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভায় রায় সীতানাথ রায় বলেন ঃ 'ভারতের জনগণ কোনকালেও রাজদ্রোহ ও বিপ্লবের পক্ষপাতী নন, বরং এর সম্পূর্ণ বিরোধী। ... কতিপয় কুপথ পরিচালিত তরল মস্তিষ্ক কর্তৃক যে সকল জঘন্য হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা আমি ঘৃণা করি এবং এর জন্য দুঃখবোধ করি। এ সকল কার্যে দেশের লোকের কোন সহানুভূতি নেই, পরন্তু দেশের লোক এর সম্পূর্ণ বিরোধী। ৩৮ হিন্দু জমিদাররাও বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী -সন্ত্রাসবাদ পছন্দ করতেন না। ১৯০৮ সালের ২৩শে জুলাই 'পূর্ববঙ্গ জমিদার সভা'র সদস্যদণ প্রদেশের নবনিযুক্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেইলীকে অভিনন্দনপত্র দিতে গিয়ে রাজভক্তির উল্লেখ করেন এবং বলেন, কতিপয় বিকৃত চিত্ত ব্যক্তির কার্যফলে দেশে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে, তাঁরা তা বিশেষ ঘৃণার চোখে অবলোকন করছেন; এই বিপ্লবের বীজ বিনষ্ট করার জন্য তারা গভর্নমেন্টকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করবেন।৩৯

'নিখিল ভারত ন্যাশনাল কংগ্রেস' বঙ্গ-বিভাগের বিরোধিতার নেতৃত্ব দেয় এবং বারংবার এর বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে; শুধু তা-ই নয়, স্বদেশী আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসবাদ ছড়াবার কাজেও কংগ্রেস ইন্ধন যোগায়। হিন্দু পত্রিকাসমূহ এক চেটিয়া কংগ্রেসের ভূমিকা সমর্থন করে।

www.pathagar.com

'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' ঃ সেকাল–একাল

আবদুল গফুর

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় অধিকার করে রয়েছে। বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বৃটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বাংলাদেশ তথা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ছিল ভারতবর্ষের সবচাইতে বড় প্রদেশ। সমগ্র বাংলাদেশ ছাড়াও বিহার ও উড়িষ্যা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর আয়তন ছিল ১,৭৯,০০০ বর্গ মাইল। ফলে, এই বিশাল প্রদেশের শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছোট লাট (গভর্নর) তার পাঁচ বছর মেয়াদকালে কখনই পূর্ববঙ্গের জেলাগুলো সফরের সময় পেতেন না। উনিশ শতকের শেষদিকে একবার উড়িষ্যায় প্রবল দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণ বিধায় এক তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্টে প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতাকে এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ বলে শনাক্ত করা হয়।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বিভক্ত করার কথাবার্তা উনিশ শতকের শেষ ভাগেই শুরু হয়েছিল। ১৯০৩ সালে এ ব্যাপারে একাধিক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে। অতঃপর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। এই বিভাগ মতে, বাংলাদেশের দার্জিলিং বাদে সমগ্র বিভাগ, সমগ্র ঢাকা বিভাগ এবং ত্রিপুরাসহ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের সঙ্গে পার্বত্য আসামকে সংযুক্ত করে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। অন্য পক্ষে প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে 'পুরাতন বঙ্গদেশ প্রদেশ গঠিত হয়।" পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামক নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকায়। পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের রাজধানী আগের মত কলিকাতাই থেকে যায়। নবগঠিত "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের জন্য পৃথক ছোট লাট, ব্যবস্থা পরিষদ ও রাজস্ব বোর্ড গঠিত হলেও এই প্রদেশের বিচার বিভাগ কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন রাখা হয়।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের ফলে প্রশাসনিক কাজের যে সুবিধা হয় তা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। দীর্ঘ অবহেলিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম এই নতুন ব্যবস্থার ফলে উন্নতির মুখ দেখার সুযোগ লাভ করে। একথা সবাই জানেন যে, পূর্ববঙ্গে বিশ্বের সর্বাধিক সর্বোৎকৃষ্ট পাট আবাদ হলেও বৃটিশ শাসনামলে সমস্ত পাটকল স্থাপিত হয় কলিকাতার সন্নিহিত অঞ্চলে। ফলে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে পাটকলসহ নানা কল-কারখানা গড়ে উঠলেও পূর্ববঙ্গ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একেবারেই পেছনে পড়ে থাকে। তাছাড়া রাজধানী শহর কলিকাতা পূর্ববঙ্গের থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় পূর্ববঙ্গের জনগণ শিক্ষার্থীরা চাকরি- বাকরির ক্ষেত্রেও পশ্চিম বঙ্গ থেকে অনেক পেছনে পড়ে যায়। এসব কারণে পূর্ববঙ্গের অবহেলিত পশ্চাৎপদ জনগণ বঙ্গভঙ্গের মধ্যে তাদের উন্নতির একটা সম্ভাবনা দেখতে পায়। তারা এই বঙ্গভঙ্গকে সে কারণেই স্বাগত জানায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবহেলিত জনগণের উন্নয়নের এ স্বপ্ন গোড়াতেই বিরাট চ্যালেঞ্জ ও হুমকির সম্মুখীন হয়। কলিকাতা প্রবাসী জমিদারদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি হয় ঢাকাকে রাজধানী করে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হচ্ছে, তা টিকে থাকলে আজ হোক আর দু'দিন পরে হোক পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারীতে তাদের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়বে। পূর্ব বঙ্গবাসী প্রজারা তাদের এতদিনের কায়েমী স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য মরিয়া হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে কলিকাতা-প্রবাসী জমিদারদের এক সভা হয়। সভায় সভাপতি বলেন, নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, বাঙ্গালী হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হইবে। খ্যাতনামা নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করে বলেন, "বাংলাদেশ বিভক্ত করিয়া হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা হইয়াছে। তারা ১৬ অক্টোবর জাতীয় শোক দিবস পালনের মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য প্রবল আন্দোলনের সূচনা করেন। কংগ্রেসের মারাঠা নেতা বালগঙ্গাধর তিলক এই আন্দোলনে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে হিন্দু জাতীয়তা সুসংহত করার জন্য মুসলিম বিরোধী মারাঠা বীর শিবাজীকে সকল হিন্দুর জাতীয় বীর রূপে প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। এই আহ্বান অনুসারে বাংলাদেশের সর্বত্র আনুষ্ঠানিকভাবে শিবাজীর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। যদিও বঙ্গভঙ্গ ছিল মূলত প্রশাসনিক সুবিধা ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার একটি খণ্ডিত প্রচেষ্টা মাত্র, তবুও একে কায়েমী স্বার্থের পূজারি হিন্দুর স্বার্থবিরোধী প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করে এই সুযোগে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

বঙ্গভঙ্গের যে সিদ্ধান্ত ছিল মূলতঃ প্রশাসনিক উপযোগিতা আঞ্চলিক বঞ্চনা দূরীকরণ বিবেচনায় সেখানে এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢুকালেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, তারা বাইরে তাদের দাবির এই সাম্প্রদায়িক স্বরূপ চাপা দিয়ে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্লোগান নিয়ে মাঠে নামলেন। কংগ্রেস নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ গঠন করা হল, এবং এই সব সন্ত্রাসী ভেতরে ভেতরে কালী মন্দির তথা হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সৃষ্টি করলেও বাইরে ভেক ধরলেন সেক্যুলারিজম ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের। তারা ঘোষণা করলেন, বাংলাভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও বাঙ্গালী জাতীয়তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলার বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী এই প্রতারণার ফাঁদে কখনও পা দেন নাই। তবুও শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে তখন হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় এত বেশি অগ্রসর ও সুসংগঠিত ছিল যে, তাদের সাথে মুসলমানরা আন্দোলনে পেরে ওঠেননি।

www.pathagar.com

তাছাড়া বৃটিশ শাসকরা দু'একজন ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সবাই ক্রুসেডের ধারাবাহিকতায় ছিলেন ঘোরতর মুসলিম-বিদ্বেষী। পলাশীতে মুসলমানদের হাত থেকে প্রতারণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করার পর এদেশের হিন্দুরা নব্য শাসকদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদর্শন করলেও একটানা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন একথাও বৃটিশ প্রশাসকরা সম্যক অবগত ছিলেন। এই পুরাতন ও পরীক্ষিত মিত্র হিন্দু নেতৃবৃন্দকে বেশি চটানো ঠিক হবে না বলেই বিবেচনা করলেন। এই প্রেক্ষাপটেই মাত্র ছয় বছরের মাথায় ইংরেজরা তাদের কথিত বঙ্গভঙ্গের সেটেলড ফ্যাক্ট আনমেটল তথা বাতিল করে তাদের পুরাতন ও পরীক্ষিত মিত্রদের খুশি করার সিদ্ধান্ত নেন।

১৯১১ সালে যে দিল্লীর দরবারে তদানীন্তর সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন, সেই ঘোষণায় প্রীত হয়ে এক প্রখ্যাত কবি এই বিদেশী শাসককে "জনগণমন অধিনায়ক" বলে স্তুতি করতেও দ্বিধা করেননি।

বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষণা করার ফলে পূর্বভঙ্গের জনগণ সাময়িকভাবে কিছুটা মর্মাহত হলেও ইংরেজ শাসকদের প্রকৃত স্বরূপ নতুন করে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করেন। তারা বুঝতে পারেন, ব্রিটিশ জাতির নেতৃত্বে ক্লাইভের অস্তিত্ব তখনও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। বাঙ্গালী মুসলমানদের সেই ক্রান্তিকালে সহযোগিতা পন্থী নেতা নওয়াব সলিমুল্লাহর যুগের অবসান ঘটে। এবং জাতি এ কে ফজলুল হকের মধ্যে নতুন নেতৃত্বের সন্ধান লাভ করে। ইতোমধ্যে কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতা চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের বঞ্চনা ও ক্ষোভের অবসানের উদ্দেশ্যে যে বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাও যদি সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃত্বের কল্যাণে অল্পদিনের মধ্যেই বাতিল না হতো, তা হলেও অন্তত পক্ষে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান মিলনের পথে রাজনীতিকরা অগ্রসর হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। ফলে দীর্ঘ বঞ্চিত বাঙ্গালী মুসলমান অগত্যা নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠেন। বঙ্গভঙ্গ রদের অল্প পর সলিমুল্লাহর মৃত্যু ঘটলে নওয়াব সলিমুল্লাহর আরেকটি স্বপ্ন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি তুললেন। সলিমুল্লাহর দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও এ কে ফজলুল হক। এ ব্যাপারেও কলিকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা রহস্যজনকভাবে বাধ সাধেন। তাদের এ বারের যুক্তি ছিল পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান কৃষক, তাই তাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নেই। এসব বাধা পায়ে দলে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদের দশ বছর পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

ঢাকায় ইংরেজরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে মত দেয়, তারও কারণ ছিল বঙ্গভঙ্গ রদ-জনিত। মুসলমানদের ক্ষোভ প্রশমন। বঙ্গভঙ্গের পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এক হিসাবে পূর্ববঙ্গের জনগণের রাজনৈতিক পরাজয় মনে হলেও এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এতদঞ্চলের জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর কলিকাতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক রাজধানী থাকলেও ঢাকাকে কেন্দ্র করে এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারা ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে। এরই পরিণতিতে পরবর্তীতে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতার দু'দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সোপান অতিক্রম করতে সক্ষম হই।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হবার পর যারা বঙ্গমাতার অঙ্গব্যবচ্ছেদের শোকে কপট অশ্রু বিসর্জন দিয়েছিলেন তাদের বাংলা প্রীতি যে শেষ পর্যন্ত মুসলিম বিদ্বেষী অবাঙ্গালী মারাঠা নেতা শিবাজী পূজায় পরিণতি লাভ করেছিল, এ সত্য ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার কোন উপায় নেই। এদের বাঙ্গালী যে ছিল মূলত হিন্দু তা শরৎ চন্দ্রের সেই লেখায়ও বোঝা যায় যেখানে "বাঙ্গালী ও মুসলমানদের মধ্যে ফুটবল খেলার" বিবরণী পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নেতাদের বাঙ্গালী প্রীতি যে কত মেকি তার প্রমাণ পাওয়া যায় -১৯৪৭ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তানের

www.pathagar.com

বাইরে বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাবকে তাদের উত্তরসুরীরা নস্যাৎ করে দিলেন। তাদের অন্যতম বাঙ্গালী নেতা ডঃ শ্যাসাপ্রসাদ মুখার্জী তো এমনও বলে বসলেন যে, ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ হতেই হবে।

১৯৭১ সালে যখন আমরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করলাম, তখন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানি পুনর্বার উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান, আমরা পিণ্ডি ছেড়েছি, তোমরা দিল্লীর জিঞ্জির ছেড়ে এসো বাঙ্গালীদের নিয়ে একটি অখন্ড স্বাধীন বৃহত্তর বাঙ্গালী রাষ্ট্র গঠন করি। এবারও ঐ একই প্রতিক্রিয়া, তারা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার পরিবর্তে অবাঙ্গালী হিন্দু অধ্যুষিত ভারতের নাগরিক থাকতেই অধিক স্বস্তি বোধ করেন। এরপর আর যা-ই হোক, এদের কাছ থেকে আমাদের বাঙ্গালিত্বের সবক নেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তাদের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অধীনে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের গোলামী জাতীয়তাবাদ বৈ কিছু নয়। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও তৎসৃষ্ট "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামক রাজনৈতিক কাঠামো মূলতই ছিল একটি অতি বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা, যা এতদঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিতে পারত। তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী বিভাগ, যার মধ্যে ছিল কলিকাতা, চব্বিশ পরগনা, খুলনা, যশোর, না দিয়া ও মুর্শিদাবাদ। এই ৬টি জেলার অধিকাংশই মোটামুটি মুসলিম প্রধান। পূর্ববঙ্গ ও আসাম" এলাকার সাথে এই প্রেসিডেন্সী বিভাগ যুক্ত হলে অনায়াসে এই রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হতে পারত। ঢাকাকে রাজধানী এবং চট্টগ্রামকে বন্দর নগরী হিসাবে গ্রহণ করলে এই অঞ্চল নিয়ে একটি ভায়াবল স্বাধীন সমৃদ্ধ রাষ্ট্র যে-কোন সময়ে গঠিত হতে পারে।

জনাব সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎ চন্দ্র বসুর উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের পার্টিশনের প্রাক্কালে যে বৃহত্তর সার্বভৌম বঙ্গরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলে তাতেও এরূপ পরিকল্পনাই ছিল। এতে বলা হয়েছিল, পরিকল্পিত রাষ্ট্রটি তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে (১) মধ্য বাংলা অঞ্চল (চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও সিলেট জেলা; (২) পূর্ব অঞ্চল (সিলেট ব্যতীত সমগ্র আসাম) (৩) পশ্চিম অঞ্চল (বর্ধমান বিভাগ ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলা)।

১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেও সমগ্র বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় স্বাধীন রাষ্ট্রটি গঠিত হবার কথা ছিল। বর্তমানে আসাম ভেঙ্গে অরুণাচল, আসাম মনিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মেঘালয় নামে যে ৬টি রাজ্য গঠিত হয়েছে তার সাথে ত্রিপুরা রাজ্য যোগ করে যে সেভেন সিস্টার্স ধরা হয়, তাদের সাথে ভারতের চাইতে বাংলাদেশেরই যে নিকট সম্পর্ক তা বলাই বাহুল্য। ভারতের বাইরে বাংলাদেশের সাথে এসব রাজ্যের শিথিল ফেডারেশন গঠনের চিন্তা যদি কখনও আসে, তা হলে ঐ শান্তি বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস একদিন বইতেও পারে।

কিন্তু তার বদলে ভারত যেভাবে অস্ত্র জোরে এই অঞ্চলের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে দমন করতে চাইছে, তা যেমন বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যহীন, তেমনি মানবতার দৃষ্টিতেও ঘোরতর আপত্তিকর। কারণ তার দ্বারা শুধু মানবাধিকারই নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হবে না, মুক্তিকামী মানুষকেও করা হবে আশাহত।

১৯০৫ সালে একটি প্রাদেশিক অবয়বে যে অঞ্চলের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও ১৯৪৭ সালের বৃহত্তর সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র পরিকল্পনায় সেই অঞ্চলকে নিয়েই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়েছিল। আজকের বাস্তব পরিস্থিতি নতুন করে প্রমাণ করে, ১৯০৫ সালে নওয়াব সলিমুল্লাহর, ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা ফজলুল হকের এবং ১৯৪৭ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু, আবুল হাশিমদের চিন্তাধারা সত্যিই বাস্তবধর্মী ছিল।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ-রদ-আন্দোলনের সাম্প্রতিক পর্যায়ের সূচনা ও তার প্রথম প্রতিবাদ

এস. এম. লুৎফর রহমান

রাজনীতি-সচেতন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, বিশ শতকের প্রথম দিকে ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' হয়। ১৯১১ সালে তা আবার রদ বা বাতিল হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পুনরায় বঙ্গভঙ্গ হয় এবং গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সেই পূর্ব পাকিস্তান হয় 'বাংলাদেশ'। এটি হলো বঙ্গভঙ্গের চতুর্থ পর্যায়। বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের সমর্থকরা একে 'স্বাধীনতা'র প্রলেপ লাগিয়েও বলতে চান "জয় বাংলা"। নেহাৎ জনগণের মারের ভয়েই যে তারা ঘটনাটিকে "বঙ্গভঙ্গ-রদ"-এর জয় বলতে পারেন না, তা স্পষ্ট। সে জন্য তাদের লেখায়-বলায় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', 'স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির ধ্বনি' এবং 'জয় বাংলাদেশ' কিংবা 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'-এর ধ্বনির মধ্যে কোন প্রেম-সম্পর্ক নেই। তাদের "জয় বাংলা" যে 'অখণ্ড বাংলা' বা 'ব্রিটিশ বাংলা'– তা তাদের "জয় বাংলা"র সঙ্গে "বঙ্গ" চেতনা পাশাপাশি রেখে বিচার করলেই বোঝা যায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত "জয় বাংলা" ছিল, "জয় পাকিস্তানে"র সঙ্গে যুক্ত তার মুদ্রিত তৎকালীন প্রমাণ আছে। ১৯৭২ সাল থেকে "জয় বাংলা" হয় "জয় হিন্দু"-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তার প্রমাণও তৎকালে মুদ্রিত তথ্যে পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, "জয় বাংলা" মানে বর্তমান 'বাংলাদেশ' বা 'পূর্ব বঙ্গ' কিংবা 'লোয়ার বেঙ্গল' তথা 'নিম্নবঙ্গ' নয়। এ থেকে বোঝা যায়, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে এবং পরেও বহু দিন এ দেশের যে-সব মার্কসবাদী রাজনীতিক 'জয় পূর্ব পাকিস্তান' বলতেন, তারা তা কেন বলতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের নাম নিয়ে এমন রহস্যময় বিতর্ক সৃষ্টি হবার কোন সুযোগ ছিল না। কেননা, ১৯৭২ সালের সংবিধানকে যাঁরা দুনিয়ার সর্বদেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয় 'সংবিধান' বলে দাবী করেন, সেই সংবিধানে এদেশের নাম 'বাংলাদেশ' বলে নির্দেশ করা হয়েছে। "জয় বাংলা", "বাংলা" কিংবা "বঙ্গ" বলে নয়। অতএব, '৭২-এর সংবিধান মানলেও কোন দেশপ্রেমিক রাজনীতিক কিংবা রাজনৈতিক দল, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী–এ দেশকে "বাংলা" কিংবা "বঙ্গ" বলতে পারেন না। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই "জয় বাংলা", "বঙ্গ" বা "বেঙ্গল"– (যেমন 'এরো বেঙ্গল', বেঙ্গল কার্বাইড প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) এর সাম্প্রতিক পর্যায়ের সূচনা ১৯৭২ সাল থেকে।

কিন্তু 'বাংলা'-চেতনার সাম্প্রতিক পর্যায়ের সূচনা কোথায়–এদেশে, না 'পার্শ্ববর্তী দেশে' তা জানা দরকার। '৭২-পূর্ব "জয় বাংলা" আর '৭২-এর সময়েরও পরবর্তীকালের "জয় বাংলা" বা "বাংলা" চেতনার উৎস এক নয়। অথবা এক হলেও ঐ দেশের প্রথম সংবিধান তাতে একটি বিরতি চিহ্ন টেনে দিয়েছে। ঐ সংবিধানে এ দেশের নাম– "বাংলাদেশ" না রেখে যদি "বঙ্গ", "বাংলা" বা "পূর্ব বাংলা" রাখা হতো তাহলে স্বতন্ত্র কথা ছিল। কিন্তু সংবিধানে '৭১-এর "জয় বাংলা" বা "বাংলা" স্লোগান বর্জন করেই "বাংলাদেশ" রাখা হয়। তাছাড়া, স্পষ্টভাবেই ওতে উল্লেখ করা হয় যে, 'সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সীমানাই হবে "বাংলাদেশে"র সীমানা। এ থেকে স্পষ্ট, সংবিধান অনুযায়ী সরকারীভাবে "বঙ্গভঙ্গ" (১৯৪৭-এর) রদ হয়নি। কিন্তু সাহিত্য-সাংবাদিকতা ও এক বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতিকদের চেতনায় ঐ সময়েই "বঙ্গভঙ্গ রদ" হয়ে গেছে বলে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে 'সবক' দেয়া হয়। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত অভীক সরকার সম্পাদিত "বাংলা নামে দেশ" গ্রন্থে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সংকলনটি ভারত থেকে প্রকাশিত এ দেশের 'স্বাধীনতা-দিবস'-এর প্রথম স্মরণিকা। এ বইয়ের মধ্যে দু'টি শুভেচ্ছা বাণী রয়েছে। তার প্রথমটি মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর। দ্বিতীয়টি শেখ মুজিবুর রহমানের। এ সংকলনেরই একটি পৃষ্ঠায় ক্যাপশান আকারে (ছবির নিচে) লেখা আছে– "জয় বাংলা, জয় হিন্দ্"। স্বদেশের সংবিধানে প্রদত্ত দেশ-নামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এ বইয়ে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কি করে বাণী দিলেন, তা বোঝা দুষ্কর। তবে এই '৭২ সাল থেকেই 'বঙ্গভবন' 'বঙ্গবীর', বঙ্গবন্ধু', 'দৈনিক বাংলা', 'দৈনিক বাংলার বাণী' ইত্যাদি নাম, উপাধি, স্লোগান ও 'বাঙালী জাতীয়তাবাদ'-এর মাধ্যমে তো বটেই সেই সঙ্গে রেডিও-টিভিতে-সাহিত্য-সম্মেলনে, অনুষ্ঠান, নাটক, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া হতে থাকে যে, সংবিধানে যা-ই থাক, '৪৭-এর 'বঙ্গভঙ্গ-রদ' হয়ে গেছে। সীমানার অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মনে রাখা দরকার যে, এ আমলেই ভারতে "বাংলাদেশ"-এর প্রধানমন্ত্রীকে একটি ইংরেজি পত্রিকা "চীফ মিনিস্টার" বা "মুখ্যমন্ত্রী" (যা ভারতের প্রদেশগুলোর সরকার-প্রধানদের বলা হয়) বলে উল্লেখ করে। ঐ সময়ে ভারত থেকে প্রকাশিত একটি মানচিত্রে এ দেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত এলাকারূপে দেখানো হয়।

এ আমলেই বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে 'দুই ভাই তত্ত্ব' প্রচার ক'রে ভারতীয় বাংলা আর বাংলাদেশকে "এক" বলে তুলে ধরা হয়। এমন কি, ভারতীয় বাংলা থেকে ছাত্ররা এসে পর্যন্ত 'বাংলাদেশ ছাত্র লীগ'-এর নেতৃত্ব দখলের চেষ্টা করে। প্রায় সব মহলে '৪৭-এর 'বঙ্গভঙ্গ রদ' হয়ে গেছে বলে মনে হতে থাকে। সে সময় বাংলাদেশের একজন প্রধানমন্ত্রী, একটি জাতীয় পতাকা, একটি নিজস্ব সেনাবাহিনী, অর্থ-ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও দেশের

www.pathagar.com

আকাশে-বাতাসে সর্বত্রই তখন 'বঙ্গভঙ্গ রদ'-এর মৌসুম। সরকারের ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতা, ডি-ইস্‌লামাইজেশন, রক্ষী বাহিনীর দমন-পীড়ন ও পরিশেষে বাকশাল গঠনাদি ঐ অ্যাট্‌মোস্‌ফিয়ারকে আরও ঘনীভূত করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। ফলে, কিছুদিনের জন্য 'বঙ্গভঙ্গ' চেতনায় ভাটা পড়ে। কিন্তু ১৯৭৯ থেকে তা আবার শুরু হয়। ঐ বছর বাংলা একাডেমীর 'একুশে ফেব্রুয়ারির' অনুষ্ঠানমালার মধ্যেই নবপর্যায়ে 'বঙ্গভঙ্গ-রদ'-এর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রচারণা শুরু করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের বৈকালিক অনুষ্ঠানে 'চারণ কবি মুকুন্দ দাস' শীর্ষক একটি আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়। বরিশালের যাত্রাকার মুকুন্দ দাস কবে জন্মগ্রহণ করেন, তার কোন নিশ্চয়তা না থাকলেও তার 'জন্ম শতবর্ষ' উপলক্ষে ঐ আলোচনার ব্যবস্থা বলে জানানো হয়। তিনি কবি ছিলেন– একথা কেউ কোথাও না বললেও বাংলা একাডেমি থেকে তাকে "কবি" আখ্যা দেয়া হয়। তার 'প্রয়োজন' ও 'গুরুত্ব' তুলে ধরার জন্য ঐ অনুষ্ঠানে জনৈক মিহির দত্ত এবং খ্যাতিমান কবি আসাদ চৌধুরী মুকুন্দ দাস সম্পর্কে দু'টি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে দুটো প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন মোট দশজন সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আলোচকদের মধ্যে বর্তমান লেখক ছাড়া ছিলেন–সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রফেসর), আবদুল লতিফ (বিখ্যাত গায়ক), মোহাম্মদ আবু তালিব (তৎকালীন প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), আবদুস সাত্তার (কবি), মমতাজ উদ্‌দীন আহমেদ (নাট্যকার), জিয়া হায়দার (লেখক), যতীন সরকার (পাবনার রাজনীতিক), নরেন বিশ্বাস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক), শাহ্‌রিয়ার কবীর (সাপ্তাহিক বিচিত্রার সম্পাদক) সর্বশেষ আলোচক ছিলাম আমি। সভাপতিসহ ঐ অনুষ্ঠানের মোট তেরজন লেখক-আলোচকের মধ্যে আমি ছাড়া আর সবাই মুকুন্দ দাসকে সাথে নিয়ে কোন অজ্ঞাত 'কাজে' নেমে পড়ার যে উদ্দেশ্য জনসমক্ষে ব্যক্ত করেন, তা ছিল আমাদের '৭১-উত্তর রাষ্ট্রীয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য বিলোপের কাজ। আমি দেশ, জাতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব-বিরোধী এই নতুন সাংস্কৃতিক অপতৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এই রাষ্ট্রবিরোধী অসুস্থ সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে এলে, গোটা অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন তা সামাল দেবার জন্য ইতোপূর্বে আলোচনা শেষ করা সত্ত্বেও আমার বক্তব্য 'কাউন্টার' করার জন্য এক ব্যক্তিকে পুনরায় আলোচনায় ডাকা হয়। তারপর বাকিটুকু দায়িত্ব সম্পন্ন করেন সভাপতি।

এভাবে ঐ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর আমার বিরুদ্ধে শুরু হয় বিষোদ্‌গার ও অপপ্রচার। আমি না-কি 'হিন্দু বিদ্বেষী', 'ভারত বিদ্বেষী', 'সাম্প্রদায়িক' ইত্যাদি। তখনও 'মৌলবাদী', 'রাজাকার', 'স্বাধীনতার স্বপক্ষ-বিপক্ষ শক্তি', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' ইত্যাদি চালু হয়নি বলে আমাকে সেগুলো বলা হয়নি। ঐ প্রচারণা আমার সামনে না চালানো হলেও আমি তা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শুনে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করি। কারণ, ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান শেষ হবার পর প্রায় এক মাস যাবৎ আমার বিরুদ্ধে ঐ প্রচারণা চলে এবং মার্চ মাসের কুড়ি-বাইশ তারিখে তার নিকট থেকে আমি ঐ তথ্য জানতে পাই।

www.pathagar.com

ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন ১৯৬৪ ও '৬৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আমার অন্যতম প্রিয় শিক্ষক। আমি যে বামপন্থী ও সাম্প্রদায়িক নই, তা তিনি জানতেন। সে জন্য তিনি আমাকে ঐ অপপ্রচারের কথা জানান এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। আমি তখন আমার ঐ বক্তৃতা যতটা মনে ছিল, তা লিখে ফেলি। তারপর তা টাইপ করে দু'টি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিই। 'দৈনিক আজাদ' ও 'দৈনিক গণকণ্ঠে' আমার ঐ বক্তব্য হুবহু প্রকাশিত হয়। তারপরই তখনকার মত আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ হয়। কিন্তু বাংলা একাডেমির কাজ-কর্মে অংশ নেবার দরজা বন্ধ হয় চিরতরে।

যা হোক, নবপর্যায়ে বা সাম্প্রতিক সময়ের 'বঙ্গভঙ্গ-রদ' করার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক তৎপরতার বিরুদ্ধে ঐ প্রথম প্রতিবাদের ঐতিহাসিক মূল্য সেদিন তেমনভাবে বোঝা না গেলেও আজ নিশ্চয় তা বোঝা যাচ্ছে। এ জন্য ঐ বক্তৃতার কতখানি গুরুত্ব সেদিন ছিল এবং আজও আছে, তা পাঠক সমীপে উপস্থাপন করতে এখানে 'দৈনিক গণকণ্ঠে'র ২৬ মার্চ, ১৯৭৯-তে 'চারণ কবি মুকুন্দ দাস' শিরোনামে প্রকাশিত আমার ঐ বক্তৃতার পাঠটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

মুকুন্দ দাস জন্মেছিলেন ১২৮৫ সালে। এ দেশেই। বরিশালে। অথচ তিনি যাত্রাওয়ালা হিসেবে খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন কোলকাতার সুধী সমাজে। আসন পেতেছিলেন সেখানকার অভিজাত পরিবারে। তাই এদেশে তাঁর সম্পর্কে যেমন এ পর্যন্ত কেউ কোন দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ রচনার প্রেরণাবোধ করেননি; তেমনি কোলকাতার অভিজাত শ্রেণীও তাঁর সম্পর্কে কোন আলোচনা করা দরকার বোধ করেননি।

কিন্তু ইদানীং এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বর্তমান দশকেই প্রথম পশ্চিম বাংলায় মুকুন্দ দাস সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দেয়। তার আগেকার ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সুবিখ্যাত, বিশালকার, দুই খণ্ডে লিখিত "বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে মুকুন্দ দাস সম্পর্কে অতি সামান্য আলোচনা আছে। ডঃ প্রদ্যোৎসেন গুপ্ত 'বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্যে' মুকুন্দ দাসের যাত্রা পালাগুলো শুধু উল্লেখযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত কিংবা রচনাদির কোন পরিচয় দেননি। বর্তমান দশকের পূর্বে লিখিত অপর কোন নাট্যাতিহাসেও মুকুন্দ দাসের কোন উল্লেখ নেই। এমন কি বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকাতেও তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি। ঐ গ্রন্থে সংকলিত 'যাত্রাপালা' এবং 'মুকুন্দ দাসের গীতাবলী' নামক অপর একটি গ্রন্থে সংকলিত গীতগুলোর কতটা যে কবির নিজের রচনা এবং কতটা অন্যের–তা নির্ণয় করা কঠিন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এসব রচনার মধ্যে রামপ্রসাদ, লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, হেমচন্দ্র এবং আরও কোন কোন খ্যাত-অখ্যাত কবির রচনা বিকৃত এবং অবিকৃত আকারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমন কি আজকের আলোচনা থেকে এটাও জানা গিয়েছে– তাঁর পরিবেশিত যাত্রাপালা গানেরও সবই তাঁর নিজের রচিত নয়। এসব কারণেই যে তিনি এতদিন উপেক্ষিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারি–তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই বর্তমান দশকে মুকুন্দ দাসের সাড়ম্বর আবির্ভাবে যে কেউ-ই চকিত হতে বাধ্য। এখনকার কিছু কিছু আলোচনা ও প্রবন্ধাদির বক্তব্য থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মুকুন্দ দাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁকে হঠাৎ এভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবার কারণ কি সে সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে কখনো কখনো তার জবাবও দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন–'আজ গরজ' দেখা দিয়েছে। গরজ বড় বালাই। সে জন্যই মুকুন্দ দাসকে আর উপেক্ষা

www.pathagar.com

করা যাচ্ছে না। গরজে পড়েই আজ আমরা কবিয়াল রমেশ শীল, মনমোহন দত্ত, মুকুন্দ দাস প্রভৃতিকে স্মরণ করছি।' কারো কারো বক্তব্যে জানা গেছে, রমেশ শীল ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং তারপর থেকেই আধ্যাত্মিক গান রচনার ধারা ত্যাগ করে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ে গান লিখতে শুরু করেন। মুকুন্দ দাস ১৯৩৪ সালে মারা যান। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন কিনা–তা জানা যায় না। তবে নজরুল প্রভৃতির প্রভাবে তিনি যে অসাম্প্রদায়িক সমাজ-সচেতন গান লিখেছিলেন এবং তার মাধ্যমে কোলকাতার অভিজাত পরিবারে ঠাঁই পেয়েছিলেন–সে কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কেউ কেউ বর্তমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে মুকুন্দ দাসকে স্মরণ করার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। তাদের বক্তব্যে কথা হয়েছে এখানকার কৃষি, শিল্প প্রদর্শনীতে যে অশ্লীল নাচ-গানপূর্ণ যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় তার ধারা বদলায় এবং সমাজ-সচেতনমূলক যাত্রা রচনার জন্য মুকুন্দ দাসকে প্রয়োজন। একজন প্রবন্ধকার মুকুন্দ দাসের যাত্রাপালার বর্তমান মূল্য সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লিখছেন, যাত্রা যে কি বক্তব্য ধারণ করতে পারে, না পারে তার নিদর্শন তো আছেই। মুকুন্দ দাস তো আছেন। শ্বেত ইঁদুর যদি ইংরেজ সরকার হয়, কালো বিড়াল হয় বাঙালীরা–তাহলে আজও তো আমরা এই ধরনের প্রতীকে শাসন-শোষণের নাগপাশ ছিঁড়তে সাহায্য পেতে পারি। মুকুন্দ দাসকে সাথে নিয়েই তো নেমে পড়তে পারি। এসব কথা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ।

এরই পাশাপাশি মুকুন্দ দাসের রচনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলামের রচনার থেকেও তা শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা যায়। মুকুন্দ দাসের নাট্য শৈলী বার্টান্ড রাসেল-এর নাট্যশৈলী এবং আধুনিক অ্যারকার্ড নাটকের সঙ্গে তুলনা ও সেগুলো থেকে 'উৎকৃষ্ট' বিবেচনা মুকুন্দ দাসের রচনার স্বাভাবিক মূল্যায়ন নয়। এ জন্য বর্তমান সময়ের জন্য কি সেই আকস্মিক চাহিদা, যার জন্য মুকুন্দ দাসের এই সাড়ম্বর উপস্থিতিও এমন অতিমূল্যায়ন আবশ্যক, বোঝা কঠিন। তাই এটিকে একটি অসংগত ও অসুস্থ 'আদর্শায়ন' ভিন্ন অন্য কিছু বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে স্থান, কাল, সমাজ, দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন থাকা আবশ্যক। তা না হলে আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে উপেক্ষা দেখানো হবে।

মুকুন্দ দাস সম্পর্কে কোন কোন প্রবন্ধকার যেভাবে ও যে ভাষায় স্তুতি গেয়েছেন–মুকুন্দ দাসকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর জীবৎকালে তা থেকে ভিন্নতর কোন ভাবে ও ভাষায় শ্রদ্ধা জানানো যেত না। অথচ মুকুন্দ দাসের জীবৎকাল এবং এ কালের দুস্তর ব্যবধান। সে কালে যে বাংলাদেশ ছিল একালের বাংলাদেশ তা থেকে ভিন্ন ; সেকালে কলকাতার সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক ছিল, এখন তা অনুপস্থিত। এদেশে সেকালে যে সরকার ছিল, জাতীয় চেতনা ছিল–এখন তা নেই। মুকুন্দ দাসের ভূমিকা ও তাঁর রচনার মূল্যায়নে এ সব কথা মনে রাখা আবশ্যক। না হলে–তাঁর আদর্শায়ন উদ্দেশ্যমূলক ও ক্ষতিকর বিবেচিত হতে বাধ্য।

কেননা, বর্তমান দশকে পশ্চিম বাংলায় মুকুন্দ দাসের মত আরও অনেককেই আদর্শায়িত করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা অসুস্থ। এই প্রবণতার বশবর্তী হয়েই–ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মত ঐতিহাসিক, বিশ্বাসঘাতক 'হিমু'কে "জাতীয় বীর হেমচন্দ্র" আখ্যায় ভূষিত করে 'গল্প' লিখেছেন।– তাঁকে তিনি বলেছেন ইতিহাস। আর সে ইতিহাস 'আকাশ বাণী' কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে। আদর্শায়নের এই ধারাতেই পশ্চিম বাংলায় মুকুন্দ দাস সম্পর্কে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার বিশেষ প্রমাণ সুবোধ চক্রবর্তীর 'চারণ কবি মুকুন্দ দাস' বইটি। তিনি

www.pathagar.com

এ গ্রন্থে দুর্দান্ত, সুঠামদেহী, দারুণ অত্যাচারী যজ্ঞেশ্বরকে আগাগোড়া নজরুলের বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছেন। এমন কি নজরুলই না-কি, মুকুন্দ দাসকে তাঁর নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও দুরন্ত ভাবের জন্য 'বাংলা মায়ের দামাল ছেলে, চারণ সম্রাট মুকুন্দ' আখ্যায় ভূষিত করেন। অথচ আমরা জানি, বাংলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল ইসলাম। চারণ কবিও নজরুল ইসলাম। মুকুন্দ দাসকে আল্লাহ্‌র প্রতিপক্ষ হিসেবে খাড়া করবার এই প্রয়াস কেন, এর আয়োজন কোথায় তা বোঝা কঠিন। পশ্চিম বাংলার ঐ আদর্শায়নের পথ ধরেই কোলকাতায় পরলোকগত মুকুন্দ দাসের বাংলাদেশে প্রবেশ লাভ ঘটেছে। আমাদের কারো কারো লেখা ও আলোচনাদির মধ্যেও তার নজীর আছে। লেখক ও প্রবন্ধকারকের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে রত্নকর বাল্মিকীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ মূল্যায়ন সঙ্গতও নয়, স্বাভাবিকও নয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ ধরনের অস্বাভাবিক মূল্যায়ন ও আদর্শায়নের প্রবণতা প্রায়শ এদেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একে অসুস্থ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তৎপরতা বলা চলে। এই তৎপরতার অংশ হিসেবেই দেখা যায়, কখনো কখনো তুচ্ছকে উচ্চ আসন দান এবং উচ্চকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে বাংলা একাডেমিতে লালন ফকীরের জন্মশতবার্ষিকী পালিত না হওয়া এবং মুকুন্দ দাসের বিতর্কিত জন্মশতবার্ষিকী পালিত হওয়াই তার অন্যতম প্রমাণ।

কোন কোন লোক, প্রবন্ধকার প্রায় সবাই মুকুন্দ দাসকে রাজনৈতিকভাবে আদর্শায়িত করতে– তাঁকে সামন্ত শ্রেণী, সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাজ সচেতন, এমন কি শ্রেণী দ্বন্দ্ববাদী কমিউনিস্ট বিপ্লবী কবি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত নই। কেননা, মুকুন্দ দাস প্রথম জীবনে ছিলেন ধর্মান্তরিত বৈষ্ণব, তারপরে তান্ত্রিক। অথচ একজন প্রবন্ধকার তার কোন একটি লেখায় তাঁর এ তান্ত্রিকতা ও ধর্মান্তরতাকে মাইকেল মধুসূদনের ধর্মান্তরতা ও ধর্ম-বিশ্বাসহীনতার সঙ্গে তুলনা করে বলতে চেয়েছেন–মুকুন্দ দাসের উপর ধর্মের কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর রচনা এ মন্তব্যের বিপরীত সাক্ষ্যই দান করে। মুকুন্দ দাস ব্যক্তি জীবনে যেমন, রচনার জগতে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি তান্ত্রিক হিসেবে 'কালী ভক্ত' ছিলেন। তাঁর যাত্রাপালাসমূহে তার বিশেষ প্রমাণ আছে। মুকুন্দ দাসের রচনায় প্রবলভাবেই সামন্তবাদী ধর্মচেতনা বিদ্যমান। এ জন্য যাত্রাপালাসমূহে আত্মশক্তি, শ্রেণীশক্তি, সমাজ কিংবা সংঘশক্তির উদ্বোধন ঘটাবার চেষ্টা করা হয়নি ; বরং তার পরিবর্তে ঐ সবের নামে দেবী দূর্গার শক্তিতে শক্তিমান হবার উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই মুকুন্দ দাসের অধিকাংশ যাত্রাপালার সমাপ্তিতে জনগণের 'জয়ধ্বনি' নেই, আছে 'কালী মায়িকি জয়'। একে কি করে মাইকেল মধুসূদনের ধর্মহীনতার সঙ্গে তুলনা করা যায়? কিংবা কি করেই বা বলা যায়? –এ চেতনা, সামন্তবাদী ধর্ম-চেতনা নয়?

কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আজ যে মুকুন্দ দাসকে সঙ্গে নেবার আহ্বান এসেছে, সে মুকুন্দ দাসের খ্যাতির উৎস বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণে। তিনি স্বদেশী যাত্রাপালা রচয়িতা, গায়ক ও অভিনেতা হিসেবেই খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় ১৯৩৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়- তা ছিল গোটা বাঙলার হিন্দু-অহিন্দু সামন্ত পুরোহিত শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত, তাদের শ্রেণীগত রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব প্রতিক্রিয়াশীল।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশের ও স্বার্থবিরোধী। কংগ্রেসীরা একে জব্দ অপকাজ' বলেছেন।

www.pathagar.com

তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একে নিন্দা করেছেন মুকুন্দ দাসও। স্বতন্ত্রভাবে নয়; কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেই। কিন্তু আজ যখন সেই বঙ্গভঙ্গ হবার পর পূর্ববঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে– তখন সেই কংগ্রেসী বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের বীরদের আদর্শায়ন এবং পরবর্তীকালের কংগ্রেসী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামী, বর্তমান সময়ের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করা যায়?

সেকালের পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে বিচার করলে দেখা যায় একই ব্রিটিশ শাসনের আওতায় পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত মোটেই ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'-এর অংশ ছিল না। কেননা, 'ডিভাইড অ্যান্ড রুলে'র মূল লক্ষ্য ছিল জনতাকে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যহীন ও সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্তি রেখে দেশ শাসন করা।' ব্রিটিশের এদেশে নতুন প্রদেশ গঠনের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনের সুবিধা ও বাংলার অনুন্নত অঞ্চলের উপর উন্নত অঞ্চলের চাপ রোধ করা। পশ্চিম বাংলার উপর পূর্ব বাংলার নির্ভরতা কমানো এবং এ অংশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও প্রশাসনের উন্নয়ন। বাংলার তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান, সামন্ত-বুর্জোয়া শ্রেণীর তা স্বার্থবিরোধী ছিল বলেই তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করেন। বাংলার পূর্বাংশে একটি নতুন প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা তাই শুধু পূর্ব বাংলার প্রধান অহিন্দু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই নয়; হিন্দু, অহিন্দু সমগ্র পূর্ববঙ্গীয় সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের আজ্ঞাবহ হিসেবে মুকুন্দ দাসের অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজ সচেতনতা, প্রগতিশীলতা সংগ্রামী চেতনা ও উদ্দীপনাকে কিছুতেই সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক প্রগতিশীলতা বলা যায় না। সুবোধ বাবুর বক্তব্য অনুযায়ী যথার্থই তিনি বঙ্কিম চন্দ্র, বিবেকানন্দের ভাবধারা অনুযায়ী 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে জনগণকে ডাক দিয়েছিলেন এবং 'কৃপাণ হাতে' এই মন্ত্রেনৃত্য করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে জন্যেই কালী ভক্ত মুকুন্দ দাস "কোটি কণ্ঠে আজি জয় মা বলিয়া, কিংবা ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বল মাই কি জয় নামে", "হিন্দু-মুসলমান আহরে হও আগুয়ান' বলে যে অসাম্প্রদায়িক আহ্বান জানিয়েছিলেন তাকে ধর্মনিরপেক্ষ ও কল্যাণমুখী আহ্বান বলা যায় না। তাই মুকুন্দ দাসের নামে প্রচলিত ও মুদ্রিত গান, যার অধিকাংশ হয়তো তাঁর রচনা নয়, বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে যে অসাম্প্রদায়িকতা, পল্লী সচেতনতা, সমাজ সংস্কার প্রবণতা ও উদারতা লক্ষ্য করা যায় তার সঙ্গে রাজনীতি সম্পর্কহীন। অন্যান্য লেখক-কবির অসাম্প্রদায়িকতা, উদারতা ও সমাজ চেতনার তুলনা করা যায় না। মুকুন্দ দাসের রচনাবলীর মূল্যায়ন তাই, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তৎকালীন রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই করা আবশ্যক। তা'হলে দেখা যাবে, তাঁর রচনার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই সেকালের কংগ্রেসী রাজনীতি ও কৌশলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইতিহাস ও পরিপ্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাতে অসঙ্গতি, বিভ্রান্তি নতুন জটিলতার সৃষ্টি হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আমাদের দেশপ্রেম ও সংস্কৃতি-চেতনাকে দুর্বল, বিপর্যস্ত করবে। এ রকম অসঙ্গত আদর্শায়ন ও উদ্ভট 'ইমেজ' সৃষ্টির চেষ্টা অসুস্থ সাংস্কৃতিক রাজনীতির ধারাকেই শক্তিশালী করতে বাধ্য। সে কারণে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, আমাদের সত্তা, স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন থেকে, মুকুন্দ দাসকে কোন রকম 'গরজে' ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে যাতে টানা-হেঁচড়া না করা হয়-তার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি মুকুন্দ দাসের রচনাবলীর অধ্যয়ন ও মূল্যায়নের আহ্বান জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লক্ষণীয় যে, এই বক্তৃতায় প্রকাশিত আশঙ্কা ও ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী সময়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা দেশ, জাতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী একটি অপ-সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছি। অসঙ্গত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আদর্শায়ন, উচ্চকে তুচ্ছ এবং তুচ্ছকে উচ্চ জ্ঞান-আজ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রদ সমর্থনকারীদের শক্তি '৭৯ অপেক্ষা এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যারা ডাকাতদের নামে শহীদ মিনার আর সাধু-সজ্জনদের জন্য অপ-খেতাবের ব্যবস্থা করেছে। তাদের প্রভাব আজ খোদ্ সরকারের ওপরও প্রেতছায়া বিস্তার করেছে। ১৯৭২ থেকে '৭৫ সালের মতোই এখন সীমান্ত উন্মুক্ত। সীমান্ত প্রহরা, চৌকি বলে কিছু নেই। চলছে অবাধে চোরাচালান; মানুষ, পশু, পণ্য, অস্ত্র, মাদক ইত্যাদির অবাধ গমনাগমন। ঢাকা থেকে কোলকাতা হয়ে আজমীর পর্যন্ত বাস রুট তো খুলে গেল বলে। এরপর উঠে যাবে ভিসা-পাসপোর্ট। দু'দেশ মিশে যেতে ও বঙ্গভঙ্গ-রদ এর ঘোষণা দিতে খুব বেশি সময় বাকি আছে কি?

কিন্তু এ ক্ষেত্রে সব থেকে আশ্চর্য বিষয় যে, ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে যে 'কালী পূজা', দূর্গাপূজা' তথা হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন শুরু হয়, ১৯৭২ থেকে '৭৫-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সেই পথেই সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। ১৯৭২ সালে তো সরকারী অর্থে দূর্গাপূজার ব্যবস্থা করা হয়। এখন মঙ্গল প্রদীপ, 'অগ্নিপূজা' ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন ইত্যাদি অসংখ্য উপায়ে সে তান্ত্রিকতা এবং রাধা কৃষ্ণবাদ-এর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যবাদ মিলিয়ে যে 'বঙ্গভঙ্গ-রদ', 'উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন', 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন' 'কনফেডারেশন গঠন' ইত্যাদির আয়োজন চলছে তা সত্যিই অকল্পনীয়। আমরা জানি না, আগামী ২০০৫ সালে বা ২০১১ সালে এ দেশে বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনে সফলতার শতবার্ষিকী পালিত হবে কি-না। আমি সে বিষয়ে জাতির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। কারণ, যথার্থ শান্তি, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুক্তিযুদ্ধের সদর্থক চেতনাধারী দেশপ্রেমিকদের সামনে আর তেমন কোন সময় নেই!

৯.১০.৯৭

www.pathagar.com

শির দেগা, নেহী দেগা আমামা

গিয়াস কামাল চৌধুরী

উনিশ শ' পাঁচ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণায় মন ভাঙলো কারো কারো। তারা কাঁদলো না শুধু, কান্নার অশ্রুকে কালি বানিয়ে গানও লিখলো এবং গাইলও বটে। কান্নার মায়া কাটিয়ে প্রতিহিংসার অগ্নিহোত্রে ধূপ ছিটিয়ে প্রতিজ্ঞায় শাণিত হল। অনল দাবানল হল। খরতাপ দাবদাহের মত ছড়িয়ে দিল। পাণিনী শস্ত্রপাণি হল! কথায় বলা যে খণ্ডিত মাতার সন্তান হয়ে না থেকে– "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে .....।"

মায়ের অন্য সন্তান!? কিন্তু তাই বলে রণে ভঙ্গ দেয়নি। কারণ "শির দেগা, নেহী দেগা আমামা"—এই বুলন্দ আওয়াজ যারা ছুঁড়ে দেয়, তারা তো পালাবার নয়। কোনদিন কোথাও পালায়নি। লড়াই শুরু হল।

এদিকে বেনিয়া ইংরেজ শস্ত্রপাণিদের আক্রোশ-আক্রমণের চোটে যখন জর্জরিত, VICEROY OF INDIA লর্ড কার্জন সবুজ বাতির বোতাম টিপলেন। তখনও ইংরেজদের মগজে ত্রিগ্রাম তথা সূতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার উঠতি মুৎসুদ্দি শ্রেণীর প্রতি এন্তার মোহ-মহব্বত।

পলাশীর ডাকিনী, যোগিনী, নাগিনীদের প্রেতচ্ছায়ার কায়া হয়ে তখন তারা জেঁকে বসতে শুরু করেছে। আড়ত মোকাম গুছিয়ে গোরাদের পদলেহন শাস্ত্রে বড় বড় বাচস্পতি সনে বঙ্গ দেশের পূর্ব অঙ্গে যে চাষারা শুধু বসবাস করে না, খাস করে চাষবাস করে ধান-পাট বোনে শাকসব্জি ফলায়, ঘাম ঝরিয়ে বাঁচার লড়াই চালিয়ে গঙ্গা নদীর নিম্ন-অববাহিকার দুকূলে সমাজ সভ্যতা তাজা রাখে– তারা শোষিত হয়। উৎপাদিত পণ্যের ভগ্নাংশ হিস্যা হতে হয় তাদের অব্যাহতভাবে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত।

ইংলিশ চ্যানেলের ডোভার প্রায়রী, লিভারপুল, ডান্ডি, হাল্ কিংবা সাউদাম্পটন হতে ভেসে আসা জাহাজ বঙ্গজ পণ্য বোঝাই করে ফিরে যায়। চাষারা করুণ নয়নে শুধুই দেখে!

www.pathagar.com

লর্ড কর্নওয়ালিশ সূচিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তির ফলভোগী মধ্যস্বত্বভোগীদের লালিত আশ্রিত ফড়িয়া ও কারবারীদের কায়েমী স্বত্ব যেমন সুসংরক্ষিত হতে থাকে, অপরদিকে শোষণের যাঁতাকলে দলিত-মথিত হতে থাকে প্রাথমিক স্তরের উৎপাদনি শক্তি দেশ ও মাটির আসল ও নিত্যসঙ্গী সাধারণ কিষান। এদের বিপুল অংশই মুসলমান। বাকিরা অন্ত্যজ হিন্দু।

এমন দিনে মজলুম এই জনগোষ্ঠীর অনুকূলে আগুয়ান হলেন শ্রেণীমানে যাঁরা উচ্চ-উচ্চ বিত্তশালী ভূস্বামী যেমন নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুর, নবাব আবদুল লতিফ সাহেবরা। এঁরা ছিলেন দিল্‌দার ও উদারচিত্ত ইতিহাস তথা কওম-সচেতন ব্যক্তিত্ব। তাঁরা ত্রিগ্রামকেন্দ্রিক শোষণের রাহুমুক্ত করতে প্রয়াসী হলেন। পূর্ব বাংলা আর আসাম নিয়ে প্রশাসনিক ও রাজস্ব অবকাঠামোভিত্তিক প্রদেশ গঠন তথা পূর্ব বঙ্গ-সমতট, বরেন্দ্র এবং গৌড়ীয় ঐতিহ্যাধীন এতদঞ্চলের রাজধানী ঘোষিত হল ঢাকা। আবার ঢাকার ছিল মোগল ঐতিহ্যের গরীমা-প্রাচীন শহর। উল্লসিত হল মজলুম এক বিপুল শ্রম-শক্তিধর কৃষক সমাজ তথা মাটির মানুষ। রেগে-মেগে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় ফেটে পড়ল ত্রিগ্রামী সেই কায়েমী স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী। নরহত্যা আর সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধের বলরামী কুড়াল নিয়ে শুরু হল প্রতিরোধ। যে ইতিহাস আজ বহু কথিত ও বিতর্কিত। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কের বৃত্তমুক্ত হয়ে উত্তীর্ণ হল সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ মুক্তির বৃহত্তর রাজনৈতিক দিগন্তে। বড় লাট-ছোট লাট ব্যঞ্জনার শাব্দিক রশি টানাটানির কোন কোন পর্যায়ে বেনিয়া শাসকরা সাম্প্রদায়িক হানাহানি লাগিয়ে দিয়ে নিস্তার পেতে চাইলেও হয়নি সার্থক।

পূর্ব বাংলায় নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক বিকাশমান জেহাদী শক্তি ইতোমধ্যে মেধা ও মনীষার চর্চায় অগ্রসেনানীর জোশে আগুয়ান। গণমানুষকে রাজনীতি তথা আর্থ-সামাজিক স্বাবলম্বি শাসনের পথে কাতারবন্দী হবার হাঁক দিচ্ছে তাঁরা নকীবের মিনারা হতে। ফলশ্রুতি তাৎক্ষণিকভাবে ক্রমশ সবর্তমান। ইতিহাসের ক্রমধারা তা-ই বলে। গাঙ্গেয় নিম্ন অববাহিকার সমাজ সভ্যতায় দিন বদলের অভিযাত্রায় এল এগিয়ে পাকিস্তান প্রস্তাব ১৯৪০ সালে। ঐতিহাসিক লাহোর নগরীতে মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক উদাত্ত কণ্ঠে প্রস্তাবটির ১৪টি দফা চমৎকার ভঙ্গিতে বোঝালেন উপমহাদেশের সমবেত মুসলমানদের। পেলেন তাৎক্ষণিক উপাধি। হলেন "শেরে বাংলা"। বাংলার বাঘ।

ওদিকে নতুন প্রদেশ হতে বিশ্লিষ্ট অহমিয়া অঞ্চল তথা আসামের কাছাড়ী পরগনা ও শ্রীহট্টের মানুষ গণভোটের জোয়ারে চলে এল ভাটিতে তথা নতুন দেশের পূর্ব পাকিস্তানে। সিপাহসালার ছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। কিন্তু বেনিয়া ষড়যন্ত্রে কূটচক্রে পুরো কাছাড় এল না।

অবশ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তখনও বেনিয়া ইংরেজ খেলতে চাইল। আকিয়াব সংলগ্ন এলাকার রোহিঙ্গা আর রাখাইনদের ব্যবহার করে। বিধি বাম! খুলনা-কোটালিপাড়া নিয়ে র‍্যাডক্লিফি খেলা চলে। পারেনি। তবে ফেনী নদীর উৎসে রঘু নন্দন পাহাড়ের ধার ঘেঁষা পার্বত্য ত্রিপুরা নিয়ে নেয় বিধবা রাণীকে বশে এনে।

সব উথাল-পাতাল হত যদি জিরাতিয়া প্রজাসাধারণ আর উজাড়ীরা হতে পারত সংগঠিত।

সুদূরের পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থান্ধ প্রতিভূরা ইতিহাস এড়িয়ে বেহায়াপনা দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা, এই ক্রীড়ামোদে মত্ত হল।

চিরবঞ্চিত চির বিদ্রোহী কোনদিন যারা রণে ভঙ্গ দেয়নি, সেই সুমহান ঐতিহ্যের গরিমায় লালিত সূর্য্যস্নাত এ দেশবাসী অগণন মজলুম নতুন সফরে অভিযাত্রী হল। হল বাংলাদেশ। তাঁরাই আজকের বাংলাদেশী জনগণ। কোটি কোটি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, উপজাতি-আদিবাসী প্রকৃতিপূজক নতুন মানুষ। সার্বভৌম, স্বাধীন অকুতোভয়, তেজী ও অমিত সম্ভাবনার এক দীপ্ত-দৃপ্ত মানবগোষ্ঠী। বীর মুজাহিদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ! দুশমন, সাবধান! হুঁশিয়ার মোনাফেক!!! দুর হটো। হট্ যাও, নাফরমান !!!

www.pathagar.com

কেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতাকারীরাই শেষে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলো?

মহবুব আনাম

বিষয়টা বেশ জটিল। এ নিয়ে স্বল্প পরিসরে পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য কষ্টকর।। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অনেক সন্ত্রাসীদের আমরা আত্মাহুতি দিতে দেখেছি, তাই বাঙ্গালী বীরত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে, এ কাজটি বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের অবদান। সূর্যসেন প্রীতিলতাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো অনেকেই জাতীয় কর্তব্য বিবেচনা করেন। এদের অবদান নিশ্চয়ই স্বীকার করা উচিৎ এবং সেটা অনাকাঙ্ক্ষিতও নয়।

কিন্তু ১৭৫৭ সনের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের অস্তগামী হবার আগে ও পরের ঘটনাবলী বিশ্লেষণে একটা সত্য বেরিয়ে আসে যে, এদের পূর্ব পুরুষরাই শুধু সুবে বাংলায় নয় সমগ্র ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্ মজবুত করার কাজে দীর্ঘদিন নিবেদিতপ্রাণ ছিল। এদের সাহায্য-সহযোগিতা ব্যতীত দু'শ' বছরব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব অসম্ভব হত।

পন্ডিত জওহর লাল নেহেরুর 'ডিস্কভারী অব ইন্ডিয়া' বই থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি । এর অন্যতম কারণ হলো আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা কোন মুসলিম বা মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল ঐতিহাসিকের লেখা দেখলেই নাক সিটকানোতে অভ্যস্ত। পন্ডিত নেহেরু ৩১৪ পৃষ্ঠায় বলছেন, অন্যান্য অঞ্চলে বৃটিশ শাসন ছড়িয়ে পড়ার আগে বাঙালীরা একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে পঞ্চাশ বছর ধরে। এ কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৃটিশ ভারতে ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক ও প্রধান ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। সে সময় বাংলা শুধু বৃটিশ শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না,এদের মধ্য থেকেই প্রথম ইংরেজী শিক্ষিত দলটি বের হয় এবং বৃটিশ ছত্রছায়ায় ভারতের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের পরিচিতি সৌহার্দ্য অন্য

www.pathagar.com

সব অঞ্চলের চেয়ে দীর্ঘই ছিল না গোড়ার দিকে এক কঠোর নিপীড়নমূলক শাসনের সহযোগী ভূমিকার সঙ্গেও সম্পৃক্ততা ছিল। বাংলা বৃটিশ শাসনকে মেনে নেয়, বশ্যতা স্বীকার করে এবং এতে অভ্যস্ত হয় ভারতের বাকি অংশের অনেক পূর্বেই। ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবের সঙ্গে বাংলার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না, যদিও এটা শুরু হয় ব্যারাকপুরে অনেকটা আকস্মিকভাবেই (accidentally)।

মনে রাখতে হবে, বেঙ্গল অর্থ এখানে হিন্দু বেঙ্গল। কেননা, মুসলিম বেঙ্গল ক্ষমতা হারানোর বেদনায় ইংরাজের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে মোটেই আগ্রহী ছিলনা স্বাভাবিক কারণেই। ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে দীর্ঘদিন। পন্ডিত নেহেরু তার দীর্ঘ গবেষণামূলক গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠায় বলছেন বাংলা বিহারের উপর ১৮৭ বছর, দাক্ষিণাত্যে ১৪৫ বছর, উত্তর ও মধ্য প্রদেশে ১২৫ বছর আর পাঞ্জাবে ৯৫ বছর (বইটি লেখা হয়,১৯৪৪ সালে) বৃটিশের শাসন বিস্তৃতিতে বোঝা যায়, পাঞ্জাবের পদানত হবার একশত বছর আগে বাংলা বৃটিশ পদানত হয়। অথচ পাঞ্জাবের জীবনযাত্রার মান সমগ্র ভারতে সর্বোচ্চ। নেহেরু দুঃখ করে বলছেন-

Bengal Certainly was a very rich and prosperous province before the British came, There may be many reasons for contrasts and differences. But it is difficult to get over the fact that Bengal once so rich and flourshing, after 187 years of British rule accompanied by strenuous attempt on the part of British to improve irs condition and to reach its people the ast self governance is today a miserable mass of poverty-stricken starving anddying people. সোজাকথা, বৃটিশ শাসনের আগে যে প্রদেশ এত ঐশ্বর্যময় ও উন্নতিশীল ছিল সেটা বৃটিশ শাসনের সবচেয়ে বেশি সময় (১৮৭ বছর) পেয়েও এবং সব রকম বৃটিশ আনুকূল্য পেয়েও কেন আজ এটা এত দারিদ্র-পীড়িত। ক্ষুর্ধাত আর মৃত্য প্রায়, কেন সেটা পন্ডিত নেহরুর মত জ্ঞানীরাও বুঝতে অক্ষম।

ভারতের নতুন ভাগ্যবিধাতা বৃটিশদের কাছে ভারতের (বাংলার) মুসলিম সম্প্রদায় ছিল তাৎক্ষণিক শত্রু আর হিন্দু ছিল তাৎক্ষণিক মিত্র। শত্রু নিধন আর মিত্রের পালন নীতির অনুসরণ করতে Divide and Rule নীতি প্রয়োগের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল মুসলিম অধঃপতন আর হিন্দু উত্থান। সঙ্গে সঙ্গে যার সৃষ্টি সেটা ছিল হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধ। এটাই ইতিহাস।

বাঙ্গালীরা বৃটিশের কি পরিমাণ আনুকূল্য পেয়েছে তা পন্ডিতজীর ঐ বইয়ের ৩২৮ পৃষ্ঠা পড়লে বোঝা যায়। তিনি বলছেন, প্রাক-সিপাহী বিদ্রোহ আমলে অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। বৃটিশের প্রায় সব চাকরিই বাঙ্গালীদের ধরতে গেলে একচেটিয়া দখলে ছিল। সামরিক ও বেসামরিকসহ যাবতীয় শাসন ব্যবস্থায় উত্তর ভারতসহ যেখানেই বৃটিশ শাসন বিস্তৃতি লাভ করেছে, সেখানেই গজিয়ে উঠেছে বাঙ্গালীদের কলোনী। পন্ডিতজীর ভাষায়, Regular colonis of Bengalees had thus grown up at the administrative and military centres in the United provinces. Delhi and even in the province of Punjab. These Bengalees accompanied the British armies and proved faithful employees to them. They become associated in the minds of

www.pathagar.com

the rebels with British power and were greatly disliked by them and given uncomplimentary titles. পণ্ডিত নেহেরুর এ বক্তব্য আশা করি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সম্বিত কিছুটা হলেও ফিরিয়ে দেবে। বাঙ্গালীদের প্রভুভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছিল বৃটিশ কিন্তু সেই সঙ্গে ঘৃণা অর্জন করেছিল দেশপ্রেমিকদের ।

বাঙ্গালীদের এহেন দুর্নামের কারণ কি? আসলে বৃটিশ শাসকরা এসে বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা উচ্চবিত্ত ও ভূস্বামী ছিল তাদের ধ্বংস করে অপর একটি অংশকে উপরে তুলতে গিয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য নতুনভাবে ভূমিস্বত্ব নির্ধারণ করে। প্রথমে কিছু রাজস্ব আদায়কারী কৃষক নির্বাচন করে পরে এদেরকে ভূমিস্বত্ব লিখে দেয়া হয়। এবং যৌথ পরিবার ও সমবায়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আগেকার সামাজিক ব্যবস্থা ধসে পড়ে। এর ফলে নতুন একটি ভূস্বামীর সমাজ গড়ে ওঠে যা বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভূ বা স্টীল ফ্রেমের ভারতীয় অপভ্রংশের সৃষ্টি করে। বাংলায় মুয়াফি প্রথা (যাকে আমরা লাখেরাজ সম্পত্তি বলে জানি) অর্থাৎ করমুক্ত ভূসম্পত্তি বাতিল করায়, মুসলিম জমিদার, তালুকদাররা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পন্ডিতজীর বইয়ের ৩০৪ পৃষ্ঠায় আছে, জমিদারী প্রথা প্রথম চালু করা হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে বাংলা এবং বিহারে। পণ্ডিতজীর ভাষায়–The land lord system was first introduced in Bengal and Behar where big land owners were created under the system known as Permanent settlement. ... The extreme rigour applied to the collection of revenue resulted especially in Bengal in the were chiefly Moslems.

শ্বেতাঙ্গ লেখক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ Indian Musalman গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'পলাশী যুদ্ধের আগে বাংলায় এমন কোন মুসলমান ছিল না, যে যাকাত নিতে পারতো আর ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর বাংলায় এমন কোন মুসলমান ছিল না যে. যাকাত দেয়ার ক্ষমতা রাখতো। '

উপরের উদ্ধৃতিগুলোতে এটা প্রমাণিত হয় যে, ভারতে বৃটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আমরা বাঙ্গালীরাই বহুলাংশে দায়ী ছিলাম। আমাদেরই একটি অংশ পলাশীর পরাজয়কে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় উল্লসিত হয়ে তাদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দিয়েছি। তাদের ভাষা শিখে তাদের চাকরি করেছি। চাকরি কোন বড় মানের নয়, কেরানীগিরি। তাদের সঙ্গে লেজুড়ের মতো ভারতের অন্যান্য জায়গায় গিয়ে প্রভুদের সেবা করেছি। বাঘ-সিংহের সঙ্গে ওরা যেমন থাকে তেমনই থেকেছি এবং তাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে দারুণ তৃপ্তি পেয়েছি। সেই যে বাঙালী কেরানীগিরি নিল, সেটা রক্তে-মাংসে মিশে গেল। কোনদিন কোন বড় মাপের কাজে এরা অগ্রসর হতে পারেনি। কি একটা হীনমন্যতা এদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশের রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে নব্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করে সবশেষে জমিদারী পেয়ে এরা পুরস্কৃত হয় বটে, কিন্তু এ জমিদার শ্রেণীও বাঙ্গালী জাতির উত্থানে কোন কাজে আসেনি। বাংলার আসল বুনিয়াদী অংশ (মুসলমান সংখ্যাগুরু) নানা ছলছুতায় ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। অপরদিকে অন্যরা (দালাল) রাতারাতি ভূস্বামী হয়ে অপদার্থ, মদ্যপ ও নারীভোগী কতকগুলো ক্লবে পরিণত হয়। এদের মধ্যে বিদ্বান, গুণী ও দেশপ্রেমিক যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু বৃটিশ শাসকদের একতরফা সুযোগ-সুবিধা দীর্ঘদিন ভোগ করেও কতদূরই বা যেতে পেরেছে। নব্য শাসকদের পদলেহনকারী, মেরুদণ্ডহীন, তোষামোদকারী এই উঠতি গোষ্ঠী

www.pathagar.com

কোনদিনই মেরুদণ্ড সোজা করতে পারেনি এ জন্য যে, এরা মেজরিটি বাঙ্গালীকে কোনভাবেই সামনে আসতে দেয়নি। বিরাট জনগোষ্ঠীকে সব সুযোগ-সুবিধা থেকে dog in the manger policy 'র মতো দূরে রাখার ঐতিহাসিক পরিণতি ঘটেছে।

বলা যায়, এরই ফলে বাঙ্গালী বলে কোন একীভূত বা ইন্টিগ্রেটেড জাতি জন্ম নিতে পারেনি। বৃটিশের অনুগ্রহভোগী শ্রেণীটি এদেশের অন্য শ্রেণীর উপর নব্য প্রভুদের বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক আচরণের সহযোগিতা দু'টি সমাজকে দূরে–বহুদূরে নিয়ে যায়। ভারতের অন্যান্য অংশে কিন্তু এ দু'টি সমাজের মধ্যে এত তিক্ততা দেখা যায় না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দু'টি সমাজ পাশাপাশি থেকে একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা পালন করেছে। কেননা, ব্রিটিশের আগমনে কোন সমাজই উল্লসিত পদলেহনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। অর্থনৈতিকভাবেও এক অংশকে গলা টিপে মেরে অপর অংশ দৃষ্টিকটুভাবে ওপরেও ওঠেনি। দিল্লী, লাখনৌ, এলাহাবাদ ও উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানে উভয় সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা-সম্ভাষণ ইত্যাদি দুই সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে সুন্দরভাবে। কিন্তু ঘটেনি সুবা বাংলায়। এটা ঐতিহাসিক ট্রাজেডি হলেও সত্য। বৃটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ বেনিফিশিয়ারি বাঙ্গালী (হিন্দুদের) সম্পর্কে ঐ বইয়ের ৩১৯ পৃষ্ঠায় পন্ডিতজী বলছেন ঃ The great difference between the state of Bengal and that of northern and central India in the middle of the century is brought out by the fact that while in Bengal the new intelligentsia (chiefly Hindu) had been influenced by English Thought and literature and looked to England for political constitutional reform, the other areas were seething with revolt. এ ব্যাপারে খোদ্ রবীন্দ্রনাথের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষে দেয়া তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে নেহেরু বলছেন (পৃষ্ঠা ৩২০-২১) .....Though tentative attempts were being made to gain our national independence of heart we had not lost faith in the generosity of the English race. রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভাষা ও সাহিত্য (পৃষ্ঠা ১৮৩ রবীন্দ্র রচনাবলী) তিনি আরও বলছেন, 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য দিয়ে। এতকাল আমাদের যে বাঙ্গালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।

এখানে অন্তরের ভাগকে স্বীকার করে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে পারেননি। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে দেয়া বাণীতেও ব্রিটিশ সভ্যতা, সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা তিনি প্রকাশ করে গেছেন তা প্রশংসনীয় হলেও দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস করেও বাংলাদেশের মেজরিটি সম্পর্কে তার প্রচণ্ড অবহেলা মর্মান্তিক। হয়তো একটা অপরাধ বোধ সক্রিয় ছিল। এটা তো সত্য কথা ১৭৫৭ সালে যারা সমাজে নেতৃস্থানীয় ছিল তাদেরকে এদের পূর্ব পুরুষদের সহায়তায়ই অপাংক্তেয় করে তোলা হয়েছিল। এদের জমিদারী ধন দৌলত সবই এসেছে মেজরিটি বাঙ্গালীকে রঞ্জিত করে।

এ কারণেই ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ করতে যাওয়া বাঙ্গালী ১৯৪৭ সালে কাজে পরিণত করার মতো পরস্পরবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পেরেছিল। আগেরবার ব্রিটিশ রাজ সেটা করতে চেয়ে এদের বিরোধিতায় সেটা পারেনি পরের বার ব্রিটিশদের হাতে-পায়ে ধরে সেটা করে এরা।

www.pathagar.com

অনেকে ভাবেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ মুসলিম বাংলার স্বার্থে করা হচ্ছিল। এটা ঠিক নয়। ব্রিটিশরা যা কিছু করেছে নিজের স্বার্থে। যদি তা-ই হতো তবে সুবে বাংলা ভাগ করেছিল কার স্বার্থে? বাংলার প্রতিষ্ঠিত এ্যাক্লুয়েন্টদের রাতারাতি গরিব আর তাদের আশ্রিতদের রাতারাতি জমিদার বানানো হয় কার স্বার্থে। দেশের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একদিকে লাভের পাহাড় গড়ে অপরদিকে বাংলায় ভয়াবহ মন্বন্তর এনে এক-তৃতীয়াংশ বাঙ্গালীকে হত্যা (মেজরিটি মুসলিম) করল কোন স্বার্থে? পূর্ববঙ্গ আর আসাম এক হলে যে পরিমাণ উপজাতি অধ্যুষিত হতো এ অঞ্চলে সেটা কি শাসন সম্ভব হত? খণ্ডিত বাংলায় সামান্য কয়েকজন চাকমা/ত্রিপুরীদের ঠ্যালায় সরকার অস্থির আর পুরাপুরি নাগা, মনিপুরী ও অন্যান্য উপজাতি একদিকে আর সংখ্যালঘু অপরাপরদের চাপে অবস্থা কোথায় ঠেকত গিয়ে?

অনেক বঞ্চনা সত্ত্বেও বাংলাকে অবিভক্ত রাখার চেষ্টা করে কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানরাই। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠা মাত্র কংগ্রেসও হিন্দু মহাসভা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাংলা ভাগের দাবি তুলে বসে। আজও এদেশের অনেক বুদ্ধিজীবীরা মানতে চান না যে, ভারত বিশেষ করে বাংলার বিভক্তির জন্য দায়ী মুসলমানরা নয়। ক্যাবিনেট মিশনের গ্রুপিং প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেশকে অবিভক্ত রাখার শেষ সুযোগটি (বাংলাকে অখন্ড রাখারও সেটাই সুযোগ ছিল) হাতছাড়া করে যদিও জিন্নাহ সাহেব সেটা চাননি। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে যে গ্রুপিং প্রস্তাবিত হয়েছিল তা ছিল আসলে পাকিস্তানী লেবাসে অখণ্ড ভারতের শেষ সুযোগ। মওলানা আজাদের নির্দেশিত পথে এ পরিকল্পনায় ভারতকে অখণ্ড রেখে মুসলমানদের মন থেকে হিন্দুর আধিপত্যের ভয় থেকে মুক্ত করারই একটা প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে প্যাটেল পট্টভি রাজেন্দ্র প্রসাদ বা গান্ধী নেহরুকে অখন্ড ভারতের দাবি থেকে সার্থকভাবে সরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্যাটেল বাংলা ও আসামের মিলনে 'সি' গ্রুপকে আসামের হিন্দুদের উপর মুসলিম শাসনের ষড়যন্ত্র বলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। কংগ্রেসের কট্টরপন্থী হিন্দুদের উস্কানিতেই হিন্দুমহাসভার শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। আগে যে-সব হিন্দু নেতৃত্ব বাংলা ভাগ করাকে মাতৃহত্যার মত পাপ বলে বর্ণনা করতো, সেই একই লোকগুলো বঙ্গ মাতাকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবিতে উন্মত্ত হয়ে উঠলো-যার মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন শরৎ বসু। ১৫ এপ্রিল (১৯৪৭) তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলনে বাংলার হিন্দুদের পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। অথচ এই হিন্দুরাই বাংলা ভাগ প্রতিহত করায় নেতৃত্ব দেয় স্যার সুরেন্দ্রনাথকে 'সারেণ্ডার নট' (Surrender not) উপাধিতে ভূষিত করে। শরৎ বসু ও তার সহযোগীদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত বাগ্মী, রাজনীতিবিদ ও অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের শেষ সেক্রেটারি আবুল হাশিম তাঁর বই 'আমার জীবন ও বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি' গ্রন্থের ১২২ পৃষ্ঠায় বলছেন, '২৭শে এপ্রিল দেবেন দের নেতৃত্বে শরৎ বোসের দলভুক্ত এবং কংগ্রেসের কিছুসংখ্যক যুবনেতা জীপে করে বর্ধমান এসে আমার (আবুল হাশিমের) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারা আমাদের তাড়াতাড়ি কোলকাতা আসার জন্য অনুরোধ করলেন। তাঁরা বললেন, বাংলা বিভক্ত হতে চলেছে। আমি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম 'কে বাংলা বিভক্ত করবে?' ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য চরম

www.pathagar.com

ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং আজকের মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে। হাশিম সাহেব এরপর বলছেন, আমি তখন নির্বোধের মত এইভাবে চিন্তা করেছিলাম।

এরপর ঘটনা দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। শরৎ বাবু ১ নং উডবার্ন পার্কে এবং সোহরাওয়ার্দীর ৪১ থিয়েটার রোডের বাসভবনে বেশ কয়েকটি সভার পর ২০ শে মে উড্‌বার্ন পার্কের সভায় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সংবিধান পাস হয়। ২৩ মে দেবেন দের মাধ্যমে শরৎবাবু গান্ধীজীকে চিঠি পাঠান, তাতে তিনি বলেন, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা যদি কংগ্রেস ও লীগ মেনে নেয় তবে আসাম সমস্যার সমাধানসহ ভারতের অপরাপর অঞ্চলেও এর সুস্থ প্রতিক্রিয়া পড়বে। জনাব আবুল হাশিম তার বইয়ের (প্রাগুক্ত) ১৩৫ পৃষ্ঠায় বলছেন, শরৎচন্দ্র বসু ও আমার (আবুল হাশিম) দ্বারা স্বাক্ষরিত সাময়িক চুক্তিটির মূল বিষয়গুলো ছিল-১) বাংলা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীন বাংলা ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারিত করবে ২) সংবিধানে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচক মণ্ডলী ও বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে আইন সভার নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। হিন্দু ও তফসিলী সম্প্রদায়ের আসন তাদের জনসংখ্যার হার অথবা বোঝা-পড়ার মাধ্যমে বন্টন করা হবে। কোন প্রার্থী নির্বাচনে স্বীয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ভোট এবং অন্য সম্প্রদায়ের ২৫ শতাংশ ভোট পাবেন- তিনিই নির্বাচিত ঘোষিত হবেন। এ শর্তপূরণে সব প্রার্থীই অক্ষম হলে যে প্রার্থী নিজস্ব সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য ভোটেই নির্বাচিত হবার বন্দোবস্ত থাকবে। ৩) হিজ ম্যাজেস্টীর সরকার বাংলাদেশের অবিভক্ত ও স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃতি মাত্র বর্তমান লীগ মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হবে যাতে মুখ্যমন্ত্রী বাদে সমান সংখ্যক হিন্দু-মুসলিম প্রতিনিধিত্ব থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন হিন্দু। ৪) নতুন সংবিধান বলবৎ হওয়া পর্যন্ত সকল সামরিক ও বেসামরিক চাকরিতে হিন্দু (তফসিলীসহ) ও মুসলমানদের সংখ্যাসাম্য থাকবে। এ সকল চাকরিতে কোন বাঙ্গালীরাই নিযুক্তি পাবেন। ৫) ইউরোপিয়ানদের বাদ দিয়ে আইন সভার মুসলমান ও অমুসলমান সদস্যরা ১৬ জন মুসলিম এবং ১৪ জন হিন্দু এই ৩০ জনের সংবিধান সভা গঠিত হবে।

গান্ধীজী ২৩ মে চিঠির জবাবে জানান যে, মুসলমানরা যে সংখ্যাধিক্যের জোরে হিন্দুদের উপর অন্যায় বা প্রভুত্ব করবে না এর কোন নিশ্চয়তা খসড়া চুক্তিতে নাই। শরৎবাবু ২৬ মে জানান যে, চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বৈঠক হচ্ছে এবং উন্নতিবিধান করা হচ্ছে। বাংলার সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা সংরক্ষণ সম্পর্কে সকলেই একমত। শরৎবাবু এ চিঠির সঙ্গে নতুন একটি খসড়াও গান্ধীজীর কাছে প্রেরণ করেন। শরৎবাবু গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করেন যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুর রহমান জিন্নাহ সাহেবের ইতিবাচক সাড়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি একটি সম্মিলিত চুক্তিতে উপনীত হতে পারে, তবে জিন্নাহ তাতে বাধা প্রদান নাও করতে পারেন।

শ্রী শরৎ বসু একই সঙ্গে জিন্নাহ সাহেবকে পত্র দেন যাতে তিনি মুসলিম বিধায়কদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। জিন্নাহ সাহেব সে মতে বাংলার বিধায়কদের নির্দেশ দেন। কিন্তু কংগ্রেস তাদের সদস্য বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ভোটদানের নির্দেশ দিলে বাংলাকে অখণ্ড রাখার শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রণীত বসু-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর মধ্যে গান্ধীজীকে হিন্দু নেতৃবর্গ কর্তৃক খবর দেয়া হয় যে, যুক্তবঙ্গের পক্ষে ভোট দেবার জন্য হিন্দু সদস্যদের (বিশেষ করে তফসিলী এম, এল, এ'দের) উৎকোচ দেয়া হচ্ছে। শরৎ বাবুর গান্ধীজিকে এসব মিথ্যা

www.pathagar.com

এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ গুজবে কান না দিতে অনুরোধ করলে গান্ধীজি এটা শরৎ বাবুর অনুচিত ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ বলে অভিহিত করে তার বিনিময় করেন। পক্ষান্তরে শরৎ বাবু দাবি করেন, তিনি ক্রোধান্বিত হননি বরং সবিনয়ে গুজবে অবিশ্বাস করতে অনুরোধ করেছিলেন। উপরোক্ত তার বিনিময়ের পূর্বেই ১৯৪৭ সালের ৮ জুন শরৎ বাবুকে জানান, তোমার (নতুন) খসড়া পড়লাম। নেহরু ও সরদারের (প্যাটেল) সঙ্গে আলাপ করেছি। দু'জনেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনড়। তারা করেন, এটা হিন্দু ও তফসিলীদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তির একটি ফন্দি। এটা শুধু তাদের সন্দেহ নয় দৃঢ় বিশ্বাস। .... তুমি আপাতত সংগ্রাম থেকে বিরত হও। খোলাখুলি বঙ্গভঙ্গের চেয়ে দুর্নীতিকে আশ্রয় করে (অর্থাৎ তথাকথিত উৎকোচ দিয়ে) অখণ্ডতা ক্রয় হবে অনেক বেশি খারাপ। ..... তোমার উচিৎ হবে বাংলার অখণ্ডতার সংগ্রাম পরিত্যাগ করা এবং বঙ্গভঙ্গের জন্য যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করা।' এরপর যা হবার তা-ই হলো। বাংলা ভাগের আনুষ্ঠানিকতাটাই সম্পন্ন হয় ২০ জুন প্রাদেশিক সংসদ ভবনে। মুসলিমপ্রধান জেলাসমূহের সদস্যদের সভায় ১০৬-৩৫ ভোটে বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট পড়লেও বর্ধমানের মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দুপ্রধান জেলাসমূহের সদস্যরা ৫৮-২১ ভোটের ব্যবধানে বাংলা ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করলে বাংলার ভাগ্য চিরকালের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, কমিউনিস্টরা ভোটদানে বিরত থাকেন।

এর আগে শরৎ বাবু ১৪ জুন গান্ধীজীর ৮ জুনের পত্রের জবাব দিয়ে প্রতিটি যুক্তি খণ্ডন করলেও যুক্তবঙ্গের পক্ষে আর কোন নতুন পদক্ষেপ নেননি। ইতোমধ্যে অবশ্য মুসলিম লীগের নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমিন ও আকরাম খাঁ গ্রুপ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের ভয় ছিল বাংলার রাজনীতিতে আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দীর প্রভাব বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে তাদের পক্ষে বঙ্গভঙ্গ মেনে নেয়াই উত্তম হবে। এ ব্যাপারে করাচির ডন ও ঢাকার আজাদ পত্রিকাদ্বয় মুসলিম স্বার্থের জন্যই বাংলার রাজধানী ঢাকায় আনার পক্ষে বক্তব্য জোরালোভাবে প্রচার করে।

প্রথমেই বলেছি যে, হিন্দু বাংলা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনে জীবনপাত করতে রাজি ছিল তারাই ১৯৪৭ সনে কেন এটা করতে ঝুঁকে পড়ল? আসল কারণ ছিল বাংলায় কে ক্ষমতা খাটাবে? বৃটিশ রাজের কৃপায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ওপর মোড়লীতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রাতারাতি জমিদারী, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী চাকরির সিংহভাগ এদের হাতে আসে। প্রজা হয় রাজা আর রাজা হয় প্রজা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন নিপীড়িত মেজরিটি বাঙালীদের একটু সুবিধা দিতে চেয়ে বঙ্গভঙ্গ করেন। কিন্তু সংখ্যালঘু বাঙ্গালী-এর বিরুদ্ধে দারুণ আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা যে ছিলেন না তা নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে এটা বাতিল ঘোষিত হয়। একই সঙ্গে কোলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙ্গালী প্রভাব চিরদিনের মত লুপ্ত হয়। এরপর বাঙ্গালী প্রভাব অন্যান্য প্রদেশের চাইতে বেশি কিছু ছিল না। গোখেলের সেই আপ্তবাক্য What Bengal thinks today India thinks it tomorrow 'র দিনও সেদিন থেকেই শেষ।

এর মধ্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন জারি হবার পর দেখা গেল বাংলার 'আন্ডার ডগ'রা বুদ্ধি ও বৈভবের সমস্ত প্রভাব কাটিয়ে স্রেফ ভোটের জোরে দেশের দণ্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে গেছে। এই আইনের অধীনে নির্বাচনগুলোতে এ যাবতকালের যাবতীয় হিসাব-নিকাশ ভ্রান্ত প্রমাণিত করে, এ যাবতকালের নিগৃহীত ও শোষিতরা ক্ষমতার শীর্ষদেশে চলে যাচ্ছে। এমন কি

www.pathagar.com

ফজলুল হকের শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা অথবা নাজিম-তুলসী মন্ত্রিসভায় হিন্দু প্রতিপত্তি খর্বিত। এরপর ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয় পাকিস্তানের পক্ষশক্তি এবং মন্ত্রিসভা গঠিত হয় প্রবল মুসলিম সংখ্যাধিক্য নিয়ে। এসব কিছুতে দারুণভাবে শঙ্কিত হিন্দু বাংলা আর মুসলিম বাংলার সঙ্গে থাকতে চাইল না। শরৎ বাবু এদের কোনমতেই আশ্বস্ত করতে পারলেন না। এছাড়া এরা দু'শত বছর ধরে সংখ্যাগুরুর ওপর যে-সব অন্যায় ও অবিচার করে এসেছিল তার প্রতিশোধ নেবার মিথ্যা আশঙ্কাও করছিল। এসব কারণেই এমন কি স্বাধীন বাংলার সুবিধাজনক প্রস্তাবেও এরা হয়ে পড়ে নিভরসা। অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যায় ভারসাম্য ছিল ঠিকই, কিন্তু লেখাপড়ায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এরা মুসলমানদের চাইতে কয়েক যোজন এগিয়ে ছিল যা একশত বছরের মধ্যেও অক্ষুণ্ন থাকতো। এরা তার চাইতে পশ্চিম ভারতীয় সাম্রাজ্যের একটি তাৎপর্যহীন কলোনী হিসেবে থাকাটাই-বাঞ্ছনীয় মনে করে। ভারতের একটি রাজ্য হয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির মূলধারা থেকে ছিটকে পড়া পশ্চিম বাংলা সত্যি সারা ভারতে কৃপার পাত্র মর্যাদা প্রাপ্ত। 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে'র উত্তরাধিকারীরা অর্ধশত বছরের স্বাধীন ভারতে অদ্যাবধি প্রধানমন্ত্রী এমন কি রাষ্ট্রপতি সরবরাহে অক্ষমতাই এর প্রমাণ।

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ ও পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

এম এ মোহাইমেন

আমি কোলকাতা পৌঁছার কিছুদিন পর রোমে রবিউদ্দিনকে এক পত্রে আমার কোলকাতা পৌঁছার খবর দেই। সে পত্রের মধ্যে ঢাকায় আমার ছোটভাই মুকিতের কাছেও এক পত্র দিয়েছিলাম। জুলাইয়ের প্রথম দিকে রবিউদ্দিনের পত্রের সঙ্গে সে পত্রের উত্তর পাই। তাতে জানতে পারলাম আমার পরিবারের লোকেরা সুস্থ আছে কিন্তু আমার জন্য তারা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এর মধ্যে জুলাইয়ের মাঝামাঝি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার জন্য রবি কোলকাতায় চলে আসে। পূর্বেই বলেছি পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান আমাদের আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল না হলেও রবি ও রফিক দুই ভাই সি, পি, আই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। রবিউদ্দিন পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আমাদের আন্দোলনের প্রতি জনমত গড়ে তুলতে লাগল। ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, মধ্য কোলকাতায় যে সমস্ত সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য গোষ্ঠী ছিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মারফত বিভিন্ন আলোচনা সভার আয়োজন করে শিক্ষিত মহলে আমাদের দাবী ও সংগ্রামের যৌক্তিকতা বুঝাতে লাগলো। এ সময় এই প্রচারকার্যের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই সময়টাতে নকসাল আন্দোলন পশ্চিম বঙ্গে খুব জোরদার হয়ে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চারু মজুমদারের নকসালী চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রসার ঘটায়।

নকসালীরা চীনপন্থী হওয়ায় আমাদের আন্দোলনের বিরোধী ছিল। সি, পি, এম-এর লোকেরাও বাহ্যত আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করলেও আমাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না। আওয়ামী লীগ মুখ্যত বুর্জোয়াদের পার্টি এবং তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রাম বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকদের

www.pathagar.com

কোন কাজে আসবে না এই ধারণায় তারা আমাদের সংগ্রামকে স্বাগত জানানো থেকে বিরত থাকে। শুধু ইন্দিরা কংগ্রেসের লোকেরাই মনেপ্রাণে আমাদের সমর্থন দেয়। ইন্দিরা কংগ্রেস যেহেতু তখন কেন্দ্র ও পশ্চিম বঙ্গে ক্ষমতাসীন ছিল তাই সর্বত্র প্রশাসন ও অধিকাংশ জনগণের কাছ থেকে জয়বাংলার দেশের লোক হিসেবে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি পেতাম। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ সি, পি, এম-এর সমর্থক হলেও তাদের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গ থেকে হিজরত করেছে বলে পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাদের একটা সহজাত সহানুভূতি ছিল। ছয় দফা আন্দোলনের মূল ভিত্তি যেহেতু ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ তাই পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরাও সাময়িকভাবে হলেও ঐ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এই সংগ্রামকে তাদের অনেকে নিজেদের সংগ্রাম বলেই অবচেতন মনে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তাই আদর্শগত রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণে কৃষক-শ্রমিকের সাথে সম্পর্কহীন বুর্জোয়া আন্দোলন মনে করলেও পশ্চিমাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাভাষীদের আন্দোলন হিসাবে মনে মনে একে স্বাগত না জানিয়ে পারছিল না। বোধ হয় নিজের দেশে তারা পশ্চিমা আধিপত্যের শিকার হয়ে ঐ আধিপত্যের প্রতি যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ মনে মনে পোষণ করতো পূর্ববঙ্গে তাদের বাঙ্গালী ভাইদের সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থনের প্রেরণা ঐ মনোভাব থেকেই খুব সম্ভব উজ্জীবিত হয়েছিল।

রবিউদ্দিন তার নিজের বাসায় প্রায়ই কোলকাতার বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিয়ে আলোচনা সভা করতো। ঐসব বৈঠকে দেশ বিভাগের পর পর পঞ্চাশ বা চৌষট্টি সনের দাঙ্গার পর সীমান্তের এপারে চলে এসেছে এরূপ অনেক পুরুষ ও মহিলা যোগ দিতেন। আমি লক্ষ্য করেছি তাদের মধ্যে অনেকেরই মনে মনে ধারণা রয়েছে যে, এটা যেহেতু বাঙ্গালীদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সীমান্তের এপারে ওপারে সবাই যখন বাঙ্গালী তখন দেশ স্বাধীন হলে এটা বাঙ্গালীদের রাষ্ট্র হবে। তখন এপারের ওপারের মধ্যে যাতায়াতে আর কোন অসুবিধা থাকবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি অনুভব করেছি বাংলাদেশের জন্য যারা খাটছেন, ত্যাগ স্বীকার করছেন, নিজেদের সীমিত সম্পদ থেকেও অতিকষ্টে কিছুটা দান করছেন তাদের অধিকাংশেরই মনে একটা গোপন আশা রয়েছে–এতদিনে বাঙ্গালীদের নিজস্ব রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে, যে রাষ্ট্র হবে তাদের একান্ত আপনার। পশ্চিম বঙ্গ পূর্ব বঙ্গের সব বাঙ্গালীরাই হবে এর মালিক, এর বাসিন্দা ও নাগরিক। কিন্তু আমি জানতাম প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে তাতে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে; পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ মিলে এক রাষ্ট্র হবে না। ২৫শে মার্চের পরে যারা সীমান্ত অতিক্রম করেছে শুধু তারাই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে ফিরে যেতে পারবে এবং সে দেশের নাগরিক হিসেবে পরিগণিত হবে, আগে যারা এসেছে তারা নয়।

কিন্তু সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে যে মনোভাবের অনুভূতি দেখতে পেতাম তা আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করতো। তখনই তাদের মোহ ভাংগাতে আমার ইচ্ছে করতো না। অনেক সময় আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি– রবি ভাই, দেশ স্বাধীন হলে আমরা দেশে ফিরতে পারবো তো? একদিন এক ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন–ভাই বরিশালে আমাদের বাড়ীর সামনে বিরাট নারকেল বাগান ছিল। দেশে ফিরলে সে নারকেল গাছগুলো আবার ফিরে পাবো তো? আমার উত্তর দিতে কষ্ট হচ্ছিল– কি করে তাদের বলি দেশ স্বাধীন হলে '৭১ সনের হত্যাকান্ডের পূর্বে যারা দেশ ছেড়েছেন তাঁরা ফিরতে পারবেন না। '৭১ সনের মার্চের পরে যারা এসেছেন তাঁরাই শুধু পারবেন।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পর এক রাষ্ট্র হয়ে যাবে এবং সব বাঙ্গালী এর নাগরিক হতে পারবে এ ধারণা যে শুধু অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে ছিল তা নয়, শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও এ ধারণা পোষণ করতে আমি অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি। ঐ সময় কোলকাতা থাকাকালীন বাংলাদেশের সব প্রবাসী নাগরিককেই থিয়েটার রোডের ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসে মাসে একবার গিয়ে তাদের রেসিডেন্সিয়াল পারমিট রিনিউ করাতে হতো। ঐ অফিসে কয়েকমাস ধরে যাতায়াত করার ফলে অনেক অফিসারের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আমি পরিষদ সদস্য ছিলাম জানতে পেরে তাঁরা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে এক-আধটু রাজনৈতিক আলোচনাও করতেন। একদিন আমাকে এক অফিসার একখানা দরখাস্ত দেখিয়ে হেসে বললেন, আপনাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে অশিক্ষিত লোকের ধারণার কথা বাদ দিন, শিক্ষিত লোকের ধারণাও যে কত আজগুবি এই দরখাস্তখানা পড়লে বুঝতে পারবেন। বর্ধমান থেকে এক সাব-ইন্সপেক্টর লিখেছেন তাকে যশোর বদলী করবার জন্য। অর্থাৎ তার ধারণা যুদ্ধ শেষ হলেই দু'বাংলা এক হয়ে যাচ্ছে। মশায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুস্কিলে পড়বেন আপনারা।

দেশ স্বাধীন হলে সত্যিই আমরা বহু স্থানে বহুবার বিপদগ্রস্ত হয়েছিলাম। আমার নিজের এলাকায় নোয়াখালীর মান্দারী বাজারে '৭২ সনের প্রথম দিকে কয়েকজন দোকানদার এমন একটা ব্যাপারে নিষ্পত্তি করার জন্য আমাকে নিয়ে যায়। গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। ব্যাপার হলো, একটি হিন্দু যুবক '৬৪ সনের দাঙ্গার পর তার দোকানের ভিটি অন্য দোকানদারের কাছে বিক্রি করে ভারতে চলে যায়। এতদিন পর '৭২-এর জানুয়ারী মাসে সে এসে তার ভিটি ফেরৎ চাইছে। আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম সে এতদিন কোথায় ছিল। সে বলল রংপুরে। আমি বুঝলাম মিথ্যা কথা বলছে। এই লোকটির বড় ভাই কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি। মান্দারী বাজারে সে তখনও দোকান চালাচ্ছে। আমি তাকে যখন সত্য ঘটনা জিজ্ঞাসা করলাম, সে স্বীকার করল তার ভাই সত্যিই ভিটি বিক্রি করে দিয়ে ভারতে চলে গিয়েছিল। স্থানীয় একজন ইউনিয়ন কাউন্সিলের হিন্দু মেম্বারও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও যুবকটিকে এখানে যেসব হিন্দু ব্যবসায়ী মুসলমানদের সঙ্গে সম্প্রীতি ও শান্তিতে বাস করছে তাদের মধ্যে মিথ্যা অজুহাতে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসার জন্য খুব বকাবকি করলেন। যাই হোক কোন দিক থেকে কোন সমর্থন না পেয়ে বিশেষ করে স্থানীয় হিন্দুদের চাপে পড়ে যুবকটি সামান্য কিছু টাকা নিয়ে আবার ভারতে চলে গেল। শুধু মান্দারী বাজারে নয় আরো দু'একটি ইউনিয়নে বহুদিন পূর্বে জমিজমা বেঁচে ভারতে চলে যাওয়া দু'চার জন লোক এসে তাদের জমিজমা ফেরৎ চেয়ে বহু অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বহু কষ্টে এসব সমস্যার আমরা শেষ পর্যন্ত সমাধান করেছি। শুধু আমার এলাকায় নয়, অন্যান্য বহু এলাকা ও জেলাগুলোতেও নাকি এরূপ বহু বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ়তা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারত সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনে পূর্ণ সহযোগিতার ফলে সবক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয়।

সীমান্ত অতিক্রমের পরই আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তরা প্রথম বুঝতে পারলাম পশ্চিম বঙ্গের মধ্যবিত্তদের চাইতে আমরা কত সুখে ও আরামে ছিলাম। তুলনামূলকভাবে তাদের চাইতে আমাদের মধ্যবিত্তদের অনেক লোকের ঘরে টিভি ও ফ্রিজ ছিল। কিন্তু সীমান্তের ওপারে গিয়ে দেখলাম ফ্রিজ, টিভি শতকরা আশিজনের ঘরেই নেই। আমাদের ধারণাতে এ বিভ্রান্তির কারণ হলো আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনা করেছি পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চমধ্যবিত্তদের সঙ্গে। পশ্চিম পাকিস্তানে নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বলে কিছু ছিল

www.pathagar.com

না, ছিল উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং বিত্তশালী শ্রেণী। আর ছিল একেবারে দরিদ্র গোষ্ঠী। তাই উচ্চমধ্যবিত্ত ও বিত্তশালীদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সংগ্রামে নেমেছিলাম। কিন্তু কোলকাতার বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের জীবন সংগ্রামের চেহারা ও কঠোরতা দেখে আমাদের অনেককেই অনটনের মধ্যেও প্রতিটি হিন্দু বাঙ্গালী পরিবার যতটুকু সম্ভব আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করেছে।

লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে পশ্চিম বঙ্গের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যেতে লাগলো। এটা সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য খুব কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তথাপি পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মানুষ তা হাসিমুখে সহ্য করেছে। আমাদের আন্দোলনের কট্টর বিরোধীরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও সাধারণ মানুষের কষ্টকে একটা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে তুলে ধরে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একটা আন্তরিক নাড়ীর টান থাকায় বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টা সফল হয়নি। জুলাই-আগস্টের দিকে যখন বরিশাল, ফরিদপুর এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে নমশূদ্র উদ্বাস্তুরা আসতে আরম্ভ করলো তখন পশ্চিম বঙ্গে যে কোন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমরা আতঙ্কিত থাকতাম। প্রায়ই শুনতাম আজকালের মধ্যে দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে। এদেশ থেকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হাজার দু'হাজার নমশূদ্র সীমান্ত অতিক্রম করেই নাকি বলতো এখানে মুসলমানদের বাড়ী কোথায় আছে দেখিয়ে দাও তারপর অন্য কথা। মুসলমানদের মেরে তাড়িয়ে সেসব বাড়ীঘর দখল করাটাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তখন কংগ্রেস ও সি, পি, এম কর্মীরা হাতজোড় করে বহু অনুরোধের পর তাদেরকে ঠাণ্ডা করতে সমর্থ হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক কর্তাদের বোধ হয় ধারণা ছিল হিন্দু অধিবাসীদের মেরে তাড়ালে, ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দিলে তারা পশ্চিম বঙ্গে এসে দাঙ্গা বাঁধাবে। এতে বিপুল পরিমাণ মুসলমান অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নেবে। এভাবে কয়েক লক্ষ মুসলমান উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলায় আশ্রয় নিলে এখানে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে। তখন কোথায় যাবে স্বাধীনতার আন্দোলন, কোথায় যাবে মুক্তিযুদ্ধ। সব আন্দোলনই নতুন পরিস্থিতির ডামাডোলে তলিয়ে যাবে। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক সচেতন জনগণ ও কর্মীদের হস্তক্ষেপে দাঙ্গা বাঁধানো সম্ভব হলো না। জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ঐ তিনমাস দাঙ্গা লাগার আতঙ্কে দারুণ মানসিক টেনশনের ভিতর দিয়ে আমাদের কেটেছে। ইয়াহিয়া খানের এই হিন্দু বিতাড়ন করে দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টা পরবর্তীকালে তার জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাক সরকার যদি শুধু আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতো, যাদের নব্বই জনই ছিল মুসলমান, তাহলে এত লক্ষ লক্ষ হিন্দু পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করতো না এবং মিসেস গান্ধীর পক্ষেও সামরিক হস্তক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুযোগ হতো না। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের ভুল পদক্ষেপই মিসেস গান্ধীর হাতে পাকিস্তান ভাঙ্গার একটা বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল।

www.pathagar.com

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ

কিরণ চন্দ্র চৌধুরী

সাম্রাজ্যবাদের প্রধান অস্ত্র হইল অধীন জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া উভয়পক্ষের কাছেই সেই বিশ্বাস অপরিহার্য করিয়া তোলা এবং শাসন কায়েম করিয়া রাখা।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষভাবে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের পর হইতে ভারতবাসীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের ক্রমপ্রসার ব্রিটিশ শাসকবর্গের অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক ব্রিটিশ শাসনের ত্রুটি সম্পর্কে সোচ্চার হইয়া উঠা ও ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি প্রভৃতি ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবাদী প্রভাব আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে লাগিল। স্যার সৈয়দ আহমদের কংগ্রেসবিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি পরিমাণে অনুপ্রাণিত ছিল, সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা না গেলেও একথা অনস্বীকার্য যে, ইহার ফলে ভারতবাসীদের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমান-মধ্যে বিভেদনীতি প্রয়োগের সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল। ভারতবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর স্নেহরসে সিঞ্চিত হইতে থাকে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাংলা ও বাঙালী জাতি, একথা ইতিহাস সম্মত। বাঙালী জাতি যখন ক্রমেই জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে (১৯০৪-৫) রুশ-জাপানী যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপান বিশাল দেশ বাশিয়াকে পরাজিত করিলে চীন, জাপান, পারস্য, সর্বত্র বিদেশী প্রভাব ও প্রাধান্য মুক্ত হইবার গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। স্বাভাবিকভাবেই উহা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। ইহা ভিন্ন দক্ষিণ-আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। বাঙালী স্বভাবতই আবেগপ্রবণ জাতি। তাহাদের মনে এই সকল ঘটনা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

www.pathagar.com

সেই সময়ে ভারতের ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)। তিনি ছিলেন একাধারে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, সুদক্ষ শাসক এবং ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। উচ্চ শিক্ষা, শাসনকার্যে দক্ষতার সহিত সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির সংমিশ্রণের ফলে তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং সেই বিরোধিতা সুকৌশলে প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার শাসনকাল বাঙালীর জাতীয়তাবাদ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইল। বাঙালী জাতি ছিল স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের পুরোধা। স্বাভাবিকভাবেই লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন, জনমত উপেক্ষা করিয়া চলিবার নীতি এবং সর্বোপরি তাঁহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি বাঙালী তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সংগ্রামের পথে ঠেলিয়া দিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র, নাশ করিয়া সেগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, কলিকাতা করপোরেশনের উপর সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ, ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁহার অপমানসূচক উক্তি সব কিছু মিলিয়া সেই সময়ে ভারতবাসীর মধ্যে এক দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। সেই সময়ে লর্ড কার্জন ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন। শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া বাঙালীর সংহতি বিনাশ করিতে চাহিলেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা ব্যবচ্ছেদের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে হিন্দু, মুসলমান সমগ্র বাঙালী জাতি তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা ত্যাগ করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ লর্ড কার্জনের কাছে একথা আরও সুপস্পষ্ট করিয়া দিল যে, বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়া বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে।

লর্ড কার্জন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীর ঐক্যবদ্ধতা ও জাতীয়তাবোধের গভীরতা লক্ষ্য করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থের দিক দিয়া ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি এইবার গোপনে বাংলা ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনা রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই গোপন প্রস্তুতি গোপন রহিল না। পরিকল্পনা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতে বাঙালী জাতি সম্ভাব্য ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিল।

ঐ বৎসর (১৯০৫) জুলাই মাসে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিবার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইল। এই পরিকল্পনার যুক্ত হিসাবে বলা হইল যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বিশাল অঞ্চলের শাসনভার একটি প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত রাখা শাসনকার্যের দক্ষতার দিক দিয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। এ জন্য কার্জন বাংলাদেশকে ভাগ করিয়া ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং দার্জিলিং-অর্থাৎ পূববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করিলেন। একজন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের উপর এই প্রদেশের শাসনভার দেওয়া হইল। আর নূতন প্রদেশের রাজধানী হইল ঢাকা শহর। মূল বাংলা প্রদেশে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা রাখা হইয়াছিল।।

www.pathagar.com

লর্ড কার্জনের যুক্তি যদি মানিয়া লওয়া হয় এবং বাংলা-বিহার উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বাংলা প্রদেশের সুষ্ঠু শাসনের জন্য যদি বাংলা ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজন স্বীকার করা হয় তাহা হইলেও যেভাবে বাংলাদেশকে ভাগ করা হইয়াছিল তাহা বাঙালী জাতি ও বাঙালী ঐক্য ও জাতীয়তাবোধকে আঘাত করিবার জন্যই যে করা হইয়াছিল একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ শাসনকার্যের সুব্যবস্থাই যদি একমাত্র যুক্তি হইত তাহা হইলে বাঙালী জাতিকে দ্বিখন্ডিত না করিয়া বিহার ও উড়িষ্যা এই দুইটি অঞ্চলকে পৃথকীকৃত করিলেই লর্ড কার্জনের যুক্তির পশ্চাতে তাহার কোন সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধি ছিল না তাহা প্রমাণিত হইত। কিন্তু লর্ড কার্জনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালী জাতির ঐক্য বিনাশ করিয়া তাহাদের জাতীয়তাবোধের উপর আঘাত হানা। জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের সংহতি ও জাতীয়তাবাদী ঐক্য বিনাশ করা ছিল এই অযৌক্তিক ব্যবচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন এই ব্যবচ্ছেদের অন্তনিহিত অপর উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে লালন করা। পূর্ববঙ্গ ও আসামের হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘুতে পরিণত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করা এবং পশ্চিমবঙ্গকে বিহার ও উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিয়া বাঙালীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া বাঙালী জাতিকে আঘাত করা ছিল কার্জন তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মূল কৌশল ও উদ্দেশ্য।

এইভাবে বাঙালী জাতির জাতীয়তাবাদীর ঐক্য বিনাশ ও হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও ঐক্যে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বাংলা-ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকরী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া

মুনতাসীর মামুন

প্রথমদিকে এ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে কিন্তু কার্জনের পূর্ব বঙ্গ সফরের পর মুসলমান নেতাদের সুর বদলে যায় এবং নবাব সলিমুল্লাহ সরকারী বক্তব্যের প্রধান সমর্থক হয়ে ওঠেন।[১] কিন্তু প্রথমদিকে, মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন। তার কারণ কি পারস্পরিক অস্বস্তিকর আঁতাত? তবে এটা ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের প্রধান হিন্দু জমিদার ও ভদ্রলোক নেতারাই এখানকার প্রতিবাদ সভাগুলির আয়োজন করেছিলেন এবং কৌশলগত কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সভাপতি করেছেন এই কৌশল পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও ব্যবহৃত হয় এবং সংবাদপত্রসমূহও এতে সমর্থন যোগায়।[২] তবে মুসলমানদের অনেকে যে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেননি তার কারণ তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস। যেমন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। পূর্ববঙ্গের দুই প্রধান সম্প্রদায় যখন দুরকম কথা বলছে তখন ঢাকায় মুসলমান সমিতির একটি অধিবেশন হয় যাতে সভাপতিত্ব করেন কালী প্রসন্ন ঘোষ। সিরাজী তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, ... ভারতের হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দু'টি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র। এক দেহের উভয় অঙ্গ মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইবে না, বিদ্বেষপ্রণোদিত না হইলে কেমন করিয়া একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভারতের জীবনী শক্তি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখ সম্পদ এই জাতির একপ্রাণতার উপরই নির্ভর করে।[৩] সিরাজী ছিলেন কংগ্রেসে এবং এ ধরনের ঘটনা ব্যতিক্রম মাত্র। এ ক্ষেত্রে সলিমুল্লাহর ভাই আতিকুল্লার কথাও উল্লেখ করা যায় যিনি পারিবারিক কলহের কারণে সলিমুল্লাহ বিরোদী বক্তব্য রেখেছিলেন।

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিনাশ ঘটে ১৯০৪-এর নভেম্বরে ঢাকার দাঙ্গায়। দাঙ্গার কারণ সেই পুরনো-নবাবপুরের এক মসজিদের সামনে দিয়ে পূজোর মিছিল যাচ্ছিল। কার্জনের আগমনের পর দুই সম্প্রদায়ে যে ফাটল ধরেছিল দাঙ্গা এবং অন্যান্য কারণে তা আরো দৃঢ় হয় এবং সেই ফাটল আর কখনও জোড়া লাগেনি। এর কিছু দিন পরই বাংলা বিভাগ কার্যকর হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এই আন্দোলনের সময় জনমতের আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। অনুচ্চ এই স্বর প্রতিবাদের ডামাডোলে ভেসে গেয়েছিলে। বাংলা বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে এরা নিজেদের হিন্দু মুসলমান হিসেবে না দেখে দেখেছেন পূর্ব বঙ্গবাসী হিসেবে। এমনি একজন হলেন ভাই গিরীশ চন্দ্র। তিনি লিখেছিলেন, "আমি বঙ্গ বিভাগ নীতির বিপক্ষ নহি, বরং স্বপক্ষ। আমার বিশ্বাস এতদ্বারা পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানা অভাব গ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হইবে। ঢাকা রাজধানী ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তবত্তা। বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য স্থান হইতে চলিল, পূর্ব বঙ্গবাসীদিগের অর্থাগমের পথ মুক্ত হইল। সে দেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্যালয় সকল স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হইবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আসাম প্রদেশেও পূর্ববঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিবে। ইহা ভাবিয়া আমার আহলাদ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছাড়িয়াদিল, বাঙ্গালদিগের উন্নতি দর্শন অনেকের চক্ষুশূল হইতে পারে। কলিকাতা অঞ্চলে পূর্ব বঙ্গ নিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা কোন অফিসে তাঁহাদের কর্তৃক বাধা পাইয়া সহজে প্রবেশ করিতে পারেন না। এখানকার কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ এক প্রকার এখানকার লোকেরই একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে। [৪] গিরীশ চন্দ্র বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে 'বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখদের' প্রচারকে 'দুঃখব্রত' বলেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলা বিভাগ অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের জন্যে কল্যাণকর। তিনি লিখেছেন- 'আমার জন্মস্থান ঢাকা জিলায়, সে স্থানে আমার বাসগৃহ, আমি ঢাকা নিবাসী। ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে চলিল, ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক।[৫]

মূলত এ আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল শহরে ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে। মফস্বলে বা গ্রামে জনসভা কিছু হয়েছিল বটে কিন্তু তাই বলে যদি আমরা ধরে নেই সাধারণ মানুষকে এ আন্দোলন আলোড়িত করেছিল তা হলে ভুল হবে। আর ভদ্রলোকরা কিছু আলোড়িত হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগলে তারা এতো বিক্ষুব্ধ হতেন কি-না সন্দেহ।

---

১. Sumit Sarkar: The Swadeshi Movement in Bengal, New Delhi, 1973, p 425.

২. ঢাকার সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। পত্রিকাটি ছিল হিন্দু মালিকানাধীন এবং অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকও বটে। কিন্তু বিচারপতি আমীর আলী যখন পদত্যাগ করলেন তখন পত্রিকাটি লিখলো, তারা মনে করেছিল আমীর আলীর বদলে আরেকজন মুসলমান ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখবে। কিন্তু তা হল না। কারণ 'বড়ই পরিতাপের বিষয়, লর্ড কার্জনের আমলে এই বিগর্হিত নীতি অনুসৃত হইতেছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। আমরা এখনও বলি গভর্নমেন্ট এই নীতি পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করুন; ন্যায় নিশ্চয়ই ব্রিটিশ রাজত্বে গৌরব স্তম্ভ এবং এ নিমিত্তই ব্রিটিশ সম্রাট সর্বত্র পূজিত।' [৩, ৪ ১৯০৪] এখানে দেখা যাচ্ছে যদিও প্রথমে মুসলমানদের প্রতি ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ক্ষোভটি প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা বিভাগের প্রতি।

৩. ঢাকা প্রকাশ ২৮.৮.১৯০৪

৪. ঐ. পৃঃ ১৩১

৫. গিরীশচন্দ্র সেন ঃ আত্মজীবনী, পৃঃ ১৯৯-১২০। এখনে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য গিরীশচন্দ্র ছিলেন নববিধান সমাজের অন্তর্গত। এবং তাঁর মতে 'নববিধানের মূলমতের অনন্ত রাজভক্তি একটি ।' রাজভক্তিকে ভিত্তি করে গিরীশচন্দ্র বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন পূর্ববঙ্গবাসী হিসেবে তিনি যে বিভাগে মেনে নিয়েছেন তা স্পষ্ট।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫-১১) ঃ তৎকালীন রাজনীতি

কে এম রাইছ উদ্দিন খান

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে বাংলার প্রেসিডেন্সী গঠিত হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যায় এক দারুণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটলে প্রশাসনিক অসুবিধাহেতু সেখানে সুষ্ঠু ত্রাণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এই দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন মত প্রকাশ করে যে, বিরাট বাংলা প্রদেশের শাসন ব্যাপারে যে অসুবিধা বিদ্যমান আছে তা দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। কমিশন বাংলার প্রশাসনের ক্ষেত্রে কতগুলো উন্নয়নমূলক সংস্কারের সুপারিশ করে। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকারের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পক্ষে পূর্বাঞ্চলের চারটি প্রদেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী আয়তনে বাংলা প্রেসিডেন্সী অপেক্ষা ছোট হলেও এই দুই প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন দু'জন পৃথক গভর্নরের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং এই দুই প্রেসিডেন্সীর গভর্নরকে শাসনকার্যে সাহায্য করার জন্য কাউন্সিলও ছিল। কিন্তু বাংলা প্রেসিডেন্সীর লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কোন কাউন্সিল ছিল না। সুতরাং লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের দায়িত্ব কিছুটা লাঘব করার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সীর আয়তন খর্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সী থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং আসামের প্রশাসন একজন কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। সিলেট, গোয়ালপাড়া ও কাছার প্রভৃতি বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত জেলাগুলো আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই হল বঙ্গ ভঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ।

কিন্তু আসামকে বিচ্ছিন্ন করা সত্ত্বেও বাংলা প্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক সমস্যার কোন সমাধানই হল না। অপরদিকে আসামকে এক নতুন প্রশাসনের আওতায় আনার ফলে নতুন সমস্যারও সৃষ্টি

www.pathagar.com

হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চট্টগ্রাম জেলা ও সমগ্র চট্টগ্রাম ডিভিশনকে বাঙলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হবে অথবা আসামের অন্তর্ভুক্ত করে আসামের আয়তন বৃদ্ধি করা হবে এই প্রশ্ন দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসেন। শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, দায়িত্বজ্ঞান এবং সর্বোপরি এই দেশের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি ভারতে আসেন। তাঁর শাসনকাল বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। লর্ড কার্জনের শাসনকালের বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ বা বাংলা বিভাগ।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হয়ে আসছেন সংবাদ পেয়ে কংগ্রেসের মাদ্রাস অধিবেশনের সভাপতি আনন্দমোহন বসু তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন লিখেছিলেন, "কংগ্রেস টলটলায়মান অবস্থায় ক্রমেই পতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভারতবর্ষে থাকাকালে আমার অন্যতম প্রধান আকাঙ্ক্ষাই হল এর শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করা।"১

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল বাংলা ও বাঙালী জাতি, একথা ইতিহাস সম্মত। বাঙালী জাতি যখন ক্রমেই জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয় সেই সময়ে (১৯০৪-০৫) রুশ জাপানী যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপান বিশাল দেশ রাশিয়াকে পরাজিত করলে চীন, জাপান, পারস্য সর্বত্র বিদেশী প্রভাব ও প্রাধান্য মুক্ত হবার গভীর আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই তা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয়দের শিক্ষা, সংবাদপত্র ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে লর্ড কার্জন ইতিমধ্যেই এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিলেন। কোন কোন পন্ডিতের মতে, "লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ছিল সর্বাধিক প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতে বড়লাট নিযুক্ত হয়ে এসেই লর্ড কার্জনের প্রথম কাজ হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করা। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর উগ্রজাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী (Extremists) তাঁর নীতির ও কার্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মনে করেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বাঙালীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং তাদের উগ্রজাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা ভারতের ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। সুতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র বাংলা তথা বাঙালীকে দুর্বল করতে হলে 'বিভাজন নীতি'। (Divide and Rule) গ্রহণের প্রয়োজন লর্ড কার্জন অনুভব করেন।"

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার এনড্রো ফ্রেজার উড়িয়া ভাষাভাষী অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য প্রস্তাব করেন এবং এর উপর ভারত সরকারের কর্মসচিবগণ বিভিন্ন পরিকল্পনা সুপারিশ করেন। অবশেষে তাঁদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলো বড়লাট লর্ড কার্জনের নিকট পেশ করা হয়। বড়লাট লর্ড কার্জন বিস্মিত হন যে, তাঁর অজ্ঞাতে বাংলাদেশ, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশের ভৌগোলিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনা হচ্ছে। এতে মনে হয় যে, শাসনতান্ত্রিক কারণে বহুদিন থেকে বাংলা প্রদেশের ভৌগোলিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনুভব হচ্ছিল এবং লর্ড কার্জনের অজ্ঞাতে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীগণ এই প্রদেশ বিভাগের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। বড়লাট তাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে ভারত সচিব লর্ড হেমিলটনের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেন।

www.pathagar.com

নদীমাতৃক পূর্ব-বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, পুলিশ এবং ডাক ব্যবস্থা খুবই পুরনো আমলের ছিল, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের হাওর ও চর অঞ্চলে এবং নদীগুলোতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষের জান মালের নিরাপত্তার অভাব সর্বত্র অনুভূত হচ্ছিল। তাই শাসন কার্যের সুবিধার জন্যই এনড্রো ফ্রেজার বাংলা প্রদেশ বিভাগের সুপারিশ করেছিলেন। তিনি এই প্রদেশ বিভাগের পক্ষে রাজনৈতিক প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। ফ্রেজার লিখেছেন, যদি ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে এই অঞ্চলের অশান্তি কমে যাবে এবং পূর্ব বাংলা থেকে যে গুরুতর শাসন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা দূর হবে। কার্জন এই পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা দুটি বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সঙ্গে যুক্ত করবার পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হলে বাংলায় এক প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও জমিদার এবং শিক্ষিত হিন্দুগণ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কংগ্রেস মনে করে যে, বাঙালী জাতীয়তার উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যেই সরকার এই পরিকল্পনা রচনা করেছে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী রিজলী তাঁর মন্তব্যে বলেন, "কংগ্রেস মনে করে যে, বাংলাদেশ যুক্ত থাকলে এটা খুব শক্তিশালী হয়, বাংলাদেশ বিভক্ত হলে এর শক্তি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্নমুখী হয়ে পড়বে। এটা খুবই সত্য এবং এই হবে আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম সুফল।"

বাংলার মুসলমানদের এই পরিকল্পনা মনঃপূত হয়নি। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী ঢাকা সুহৃদ সংঘ এক সভায় আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলি নিয়ে (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার বাদ দিয়ে) একটি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবি করে। বড়লাট লর্ড কার্জন তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব বাংলা অঞ্চল পরিদর্শন করতে আসেন। ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ লর্ড কার্জনকে রাজকীয় আতিথেয়তা প্রদান করেন। তিনি এ সময়ে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার ব্যাপারে লর্ড কার্জনের নিকট মুসলমানদের অভিমত প্রকাশ করেন। নবাব সলিমুল্লাহ বলেন, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাগুলি আসামের সঙ্গে সংযুক্ত হলে এতদঞ্চলের মুসলমানদের বিশেষ কোন উপকার হবে না। এই অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য তিনি একটি প্রদেশ দাবী করেন। লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলা অঞ্চল পরিদর্শন করে এটা বুঝতে পারেন যে, বাংলাদেশ সরকারের শাসন সমস্যা সমাধানের জন্য ফ্রেজারের পরিকল্পনার কিছুটা সম্প্রসারণ করা দরকার।

বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলার পূর্বাঞ্চল আসাম নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ)। ভারত সচিব ব্রডারিক এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং তা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুলাই প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আসাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগগুলি নিয়ে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। দার্জিলিং নূতন প্রদেশ থেকে বাদ পড়ে কিন্তু জলপাইগুঁড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং মালদহ সংযুক্ত হয়। ঢাকা রাজধানী এবং চট্টগ্রাম বিকল্প রাজধানী নির্বাচিত হয়। এই নতুন প্রদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত ৪ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান, ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু এবং বাকী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। নবগঠিত প্রদেশের জন্য একজন ছোটলাট, একটি ব্যবস্থাপক পরিষদ ও একটি রাজস্ব বোর্ডের ব্যবস্থা হয় এবং বিচার বিভাগ কলকাতা

www.pathagar.com

হাইকোর্টের অধীনে রাখা হয়। পশ্চিম বাংলা পুরাতন বঙ্গদেশ প্রদেশের অধীনে থেকে যায়। এর আয়তন ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫ শত ৮০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। এদের মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ৯০ লক্ষ মুসলমান এবং বাকী অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ছিল।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম থেকেই হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। তাদের বিভিন্ন যুক্তি ও ভীতি প্রদর্শনের কোনই ফল হল না। হিন্দুদের প্রবল বাধা প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার তাদের সিদ্ধান্তে অটল রইল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকারি হবে, এই সংবাদে হিন্দু নেতাদের মনে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। নতুন প্রদেশ বাস্তবায়ন যাতে কার্যকর না হতে পারে, সে ব্যবস্থা গ্রহণে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তারা পত্র-পত্রিকায়, বক্তৃতামঞ্চে একে 'বাঙালী বিরোধী, জাতীয়তাবাদী বিরোধী এবং বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করে। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হবার পরদিনই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের ভূপেন্দ্র নাথ বসু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ কর্তৃক পরিচালিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' বলে মন্তব্য করা হয় এবং সরকারকে ভারতব্যাপী এক জাতীয় সংগ্রামের জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ই জুলাই সম্পাদকীয় নিবন্ধে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক 'বয়কট'-যুদ্ধ ঘোষণা করে। হিতবাদী পত্রিকায় (০৭-০৭-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়, বিগত ১৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙালী জাতির সম্মুখে এরূপ বিপর্যয় কখনও আসে নি। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় (১৮-০৭-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ) বলা হয়, বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে হিন্দু নেতাদের অনেক উক্তিই যে স্ববিরোধী এবং রাজনৈতিক চালপ্রসূত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লর্ড কার্জন শাসন কার্যের সুবিধার্থেই বাংলাদেশ বিভাগ করেছিলেন। তাঁর মতে, এই বিভাগ দ্বারা পূর্বাঞ্চলের নিপীড়িত জনসাধারণের শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হলে তারা ক্রমশ পশ্চিমাঞ্চলের অধিক ভাগ্যবান এবং উন্নত ভাইদের সমতুল্য হতে পারবে। এতে ভবিষ্যত বাঙালী জাতির উন্নতি হবে। বর্তমানে তারা একটি অঞ্চলের নেতৃত্ব করছে, ভবিষ্যতে তারা দুটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব করতে পারবে। কার্জন বাংলার হিন্দু-মুসলমানদেরকে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাকে নব গঠিত প্রদেশকে পূর্ণ সমর্থন জানাতে আহ্বান করেন। কিন্তু কলকাতার সংবাদ পত্রগুলি তাঁর উদ্দেশ্যের ভুল ব্যাখ্যা করে এবং তাঁকে মুসলমানদের পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করে। তারা আরও প্রচার চালায় যে, লর্ড কার্জনের এই বিভেদ নীতির ফলে মুসলমানদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগেছে এবং এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। কিন্তু এই সকল উক্তি ছিল খুবই বিভ্রান্তিকর ও ফাঁকা। কারণ এই বিভাগ দ্বারা পূর্বাঞ্চলের নিপীড়িত জনসাধারণের শিক্ষা, সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হলে তারাও পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের সমপর্যায়ে উন্নত হবে। কাজেই বঙ্গবিভাগের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। তিনি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জনকও ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে ডঃ ষ্ট্যানলী ওলপার্টের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তাঁর মতে, "হিন্দু-মুসলমান সংঘাত নতুন নয়। এটা ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি সামাজিক সমস্যা। দীর্ঘ কয়েক শত বৎসর পরস্পরের সহাবস্থান সত্ত্বেও ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত দূর হয়নি।"

www.pathagar.com

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর হয় এবং স্যার বেম্পফিল্ড ফুলার পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট নিযুক্ত হন। ঢাকায় তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়। বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গ নবাব সলিমুল্লাহ লিখেছেন, নব প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা আছে। জনগণ ক্রমশ বুঝতে পারছে যে, পূর্ব বাংলার জনগণের জন্যই বাংলাদেশ ভাগ করা হয়েছে। এই প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ; এ কারণে তারা সরকারের নিকট থেকে বিশেষ বিবেচনা লাভ করবে। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয়েছে। দরিদ্র মুসলমান যুবকরা এতদিন কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও উপযুক্ত চাকরি পেত না, নতুন প্রদেশ তারা উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছে। এর ফলে দরিদ্র পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে লেখাপড়া শেখাতে উৎসাহ পাচ্ছে। বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে হিন্দুদের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে নবাব সলিমুল্লাহ বলেন, "হিন্দুগণ কালক্রমে বুঝতে পারবে যে, পূর্ব বাংলা প্রদেশ স্থাপিত হওয়ায় বালা ভাষাভাষী জনগণ বিভক্ত হয়নি বরং দুটি সহদরা প্রদেশের শাসন, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির সুব্যবস্থা হবে এবং বাঙালী জাতি শক্তিশালী হয়ে উঠবে।"

যা হোক, হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মূল কারণগুলো গভীরভাবে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করলে এই বিরোধিতার তাৎপর্য কিছুটা অনুধাবন করা যায়। বঙ্গভঙ্গ সত্যিই হিন্দুদের জন্য এক দুর্যোগের ইঙ্গিতপুর্ণ ছিল। কারণ প্রথমত, বঙ্গভঙ্গের পূর্বে হিন্দুরা বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়নের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিবে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার নিপীড়িত মুসলমান কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগরিত হয়ে উঠবে। ফলে হিন্দু, জমিদার ও বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের উপর তাদের এতদিনকার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব হারাবে। তাদেরকে আর আগের মত শোষণ ও নিষ্পেষণ করা যাবে না, এই আশংকায় হিন্দুগণ আতংকিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, হিন্দুদের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা এ সময় ক্রমশই আত্মপ্রকাশ করছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদের নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের এরূপ ব্যাখ্যা করতে থাকেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসরমান হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক বিকাশকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। পূর্ব বাংলার জনগণের বিশেষ করে মুসলমান জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক হিন্দুগণ কোনদিনই সানন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ তাদের মনে দারুণ ঈর্ষার উদ্রেক করে। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের এই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। কাশিম বাজারের মহারাজা মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ সভায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, "নতুন প্রদেশে মুসলমানেরা হবে সংখ্যাগুরু আর বাঙালী হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। ফলে স্বদেশেই আমরা হব প্রবাসী। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা চিন্তা করে আমি আতংকিত হয়ে পড়ছি।" তৃতীয়ত, ঢাকায় নতুন প্রদশের রাজধানী স্থাপিত হলে এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে কলকাতার সমৃদ্ধি ক্রমশই হ্রাস পাবে এবং সেখানকার শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের একচেটিয়া ব্যবসার বিঘ্ন ঘটবে। ব্যবসায়িক স্বার্থ বিপন্ন হবার আশংকায় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করছিল। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এক সময় বলেছিলেন, "Politics of Bengal is in reality economics of Bengal"—- "বাংলার অর্থনীতিই হল বাংলার

www.pathagar.com

আসল রাজনীতি।" চতুর্থত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, আইনজীবীগণ, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদগণও নতুন প্রদেশ গঠনে ভীত ছিল। আইনজীবীগণ মনে করলেন যে, ঢাকাতে নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের আইন ব্যবসায়ে ভাটা পড়তে পারে। কারণ অধিকাংশ মক্কেলই ছিল পূর্ব-বঙ্গের। কলকাতার সবাদপত্রের মালিকরাও মনে করলেন যে, নতুন প্রদশের রাজধানী ঢাকা থেকে সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের সংবাদপত্রের চাহিদা বহুলাংশে কমে যাবে। কারণ পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের সংবাদের জন্য কলকাতা থেকে ঢাকার প্রতি স্বাভাবিকভাবে তাকাবে। ঐতিহাসিক ডডওয়েল এ প্রসঙ্গে বলেন, "কলকাতার আইনজীবীরা ভীত হয়েছিল এ কারণে যে, নতুন প্রদেশ গঠিত হলে ঢাকায় আপীল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এতে তাদের নিজেদের ব্যবসায়ে মন্দাভাব দেখা দিবে। কলকাতার সাংবাদিকদের ভয়ের কারণ ছিল এই যে, নতুন প্রদেশে সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে এবং এতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা কমে যাবে।" এই সকল কারণের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা এবং অরবিন্দু ঘোষ, বিপিন পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাগণ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শীঘ্রই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালী হিন্দুদের আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

প্রথমদিকে বঙ্গভঙ্গের মূল পরিকল্পনার প্রতি মুসলমানদেরও সমর্থন ছিল না। কলকাতার কেন্দ্রীয় মুসলমান সমিতি (The Central Mohammedan Association) ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রস্তাবিত পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করে। কিন্তু পরে ব্রিটিশ সরকার যখন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা নেয় তখন তারা নতুন প্রদেশে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির সূচনা হবে– ঢাকার লুপ্ত গৌরব পুনরুজ্জীবিত হবে এবং প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় স্থাপিত হলে বিভিন্ন কাজে আর সুদূর কলকাতা যেতে হবে না এই আশায় এর প্রতি স্বাগত জানায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যখন প্রবল আন্দোলন শুরু হয় তখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম জনমত গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর অর্থাৎ নতুন প্রদেশের জন্মদিনটিতে মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে আসেন। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে মুসলিম ইনস্টিটিউট পত্রিকায় 'নতুন প্রদেশ এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে তিনি নতুন প্রদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কোন কোন লেখক মন্তব্য করেন, সরকার সুবিধাজনক শর্তে ঋণ দিয়ে সলিমুল্লাহকে হাত করেন। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যের নির্ভরশীল কোন প্রমাণ নেই।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করেই খাজা সলিমুল্লাহ (১৮৭১–১৯১৫ খ্রিঃ) রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং এ সময় থেকেই তিনি পূর্ব বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে প্রধান নেতার আসন লাভ করেন। ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ব্যবসা উপলক্ষে এ দেশে আগমন করেন এবং পরে জমিদারী ক্রয় করে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই পরিবার জনহিতকর কার্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছেন। সলিমুল্লাহর পিতামহ খাজা আবদুল গণির জনহিতকর কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে খাজা আবদুল গণিকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই উপাধি তাঁদের বংশগত পদবীতে পরিণত হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে খাজা সলিমুল্লাহর পিতা খাজা

www.pathagar.com

আহসানউল্লাহ মৃত্যুবরণ করলে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে পারিবারিক দায়িত্বভার সলিমুল্লাহর উপর পড়ে। তিনি তখন ময়মনসিংহে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মরত ছিলেন। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), মিটফোর্ট হাসপাতাল (সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ), সলিমুল্লাহ এতিম খানা ও ঢাকা কলেজ হোস্টেল (বর্তমানে সলিমুল্লাহ হল) প্রভৃতি এখনও তাঁর জনহিতকর কার্যের স্বাক্ষর বহন করছে।

সলিমুল্লাহ ছিলেন পূর্ব বাংলার তথা সমগ্র ভারতের নিপীড়িত ও অবহেলিত মুসলমানদের মুক্তির দিশারী। পারিবারিক ঐশ্বর্য এবং আরাম আয়েসের মধ্যে মানুষ হয়েও দেশের জনগণের জন্য বিশেষ করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অনগ্রসরতা তাঁকে ব্যথিত করত। তিনি পূর্ব বাংলার দারিদ্রপ্রপীড়িত জনগণের শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সদিচ্ছা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নবাব সলিমুল্লাহ নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাবকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান ইউনিয়ন (Provincial Mohammedan Union) নব গঠিত প্রদেশে অবহেলিত মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে আসে। এই সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমান সমাজ যারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং তাদের জীবনে দেখা দেয় এক অভূতপূর্ব জাগরণ। এ সম্পর্কে নবাব সলিমুল্লাহ মুন্সিগঞ্জের জনসভায় ভাষণ দানকালে বলেন, "বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে।"

সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর আট বছরের মধ্যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। মুসলিম লীগের জন্মলগ্ন থেকেই তা বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন জানায়। প্রতি বছর লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কার্যকলাপকে নিন্দা জ্ঞাপন করা হতো। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ইম্পোরিয়াল কাউন্সিল-এ বিষয়টি পুনরুত্থাপনের চেষ্টা করলে বাংলাদেশের মুসলিম নেতা শামসুল হুদা ও বিহারের মাযহারুল হক তার তীব্র প্রতিবাদ জানান। প্রকৃতপক্ষে, নব গঠিত প্রদেশটি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সমর্থন লাভ করেছিল। নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলোও স্বাগত জানায়। কলকাতার মুসলিম সাহিত্য সংসদ একে আশীর্বাদ হিসেবে বর্ণনা করে এবং সকল মুসলিম জনগণকে এর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করার আবেদন জানায়। বাংলার তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুগণও বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিল। নতুন প্রদেশ তথা পূর্ব বাংলা ও আসামের উন্নতির সঙ্গে তাদের স্বার্থও জড়িত ছিল। কারণ বর্ণহিন্দু কর্তৃক তারাও নিগৃহীত ও অবহেলিত ছিল।

নিখিল ভারত কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। কংগ্রেস মূলত কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয় এই আন্দোলনে তা কিছুদিনের জন্য চাপা পড়ে যায়। খ্যাতনামা নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রথম থেকেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করছিলেন। তিনি বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করে বলেন, বাংলাদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁদের নেতৃত্বেই আন্দোলন পরিচালিত হয়। এ সময় জমিদারশ্রেণী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় আন্দোলনের প্রধান শরীক

www.pathagar.com

ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের মারাঠী নেতা বালগঙ্গাধর তিলকও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তা সুসংহত করার জন্য মারাঠাদের নায়ক শিবাজীকে ভারতের সকল হিন্দুদের জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন করেন। দেশের সর্বত্র শিবাজীর জন্ম বার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়। সভায় কংগ্রেসের নেতাগণ মুসলমান সম্রাটের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রামের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে জাতীয় বীর ও তাঁর সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। এদের চাপে পড়ে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি গোখেলের মত উদারপন্থী নেতাও শেষ পর্যন্ত পূর্ব-বাংলার স্বার্থ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে কংগ্রেস হিন্দুদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনপালের বাগ্মিতায় স্বদেশী আন্দোলনের নেশা বাঙালী হিন্দুদের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে। তবে এতদিন কংগ্রেসের যে অসাম্প্রদায়িক রূপ ছিল তা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিন বলে স্থিরকৃত ছিল সেদিন কংগ্রেস দেশব্যাপী শোকদিবস পালন করে। কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন রাখীবন্ধ উৎসবের প্রচলন করেন। ব্যবচ্ছিন্ন বাংলার মানুষে যে ভাই ভাই তাঁদের ভাতৃবোধ যে অটুট এবং অবিচ্ছেদ্য তার প্রতীক হিসাবে হিন্দু-মুসলিম খ্রিস্টান নির্বিশেষে একে অপরের হাতে রাখীবেঁধে দেন। ঐ দিনই 'ফেডারেশন হল' বা মিলন মন্দির নামে একটি সভাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বাঙ্গালী জাতির ঐক্যের প্রতীক চিহ্ন গড়বার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মিলনক্ষেত্র হিসেবে এই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত করা হয়েছিল। আনন্দ মোহন বসু অত্যন্ত পীড়িত থাকা সত্ত্বেও সেদিন এই মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জন্য 'অরন্ধন' পালন করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। শোক প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ সকলে উপবাস করে, দোকানপাট ও অন্যান্য কাজকর্ম বন্ধ রাখে। আত্মশুদ্ধির জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠে সকলে 'বন্দে মাতরম্' গান গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নানে যায়। হিন্দুদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগানোই ছিল এইসব কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। অচিরেই এই আন্দোলন মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিমদাঙ্গা শুরু হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্টপার্টি' গ্রন্থে লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ' থেকে আন্দোলনকারীরা প্রেরণা লাভ করতেন। এই পুস্তকখানি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। এর মূলমন্ত্র ছিল বঙ্কিম চন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গান। তাতে আছে–

বাহুতে তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী ..... ইত্যাদি।

স্বদেশ বন্দনার নামে আন্দোলনকারীরা মুসলিম বিদ্বেষমূলক এই 'বন্দেমাতরম্ গানকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে চালু করে। একেশ্বরবাদী কোন মুসলিম কি করে এই মন্ত্রোচ্চরণ করতে পারত? এই কথাটা কোনো হিন্দু কংগ্রেস নেতাও কোনদিন বুঝতে পারেননি। এছাড়ও মহারাষ্ট্রের নেতা তিলকের গো-রক্ষা আন্দোলন, শিবাজীর 'গণপতি' উৎসবকে তাদের আন্দোলনের তালিকাভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল । উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুরাজত্বের পুনপ্রতিষ্ঠা। বারীন্দ্র কুমার

www.pathagar.com

ঘোষও আন্দামান থেকে ফেরার পরে এ কথাই লিখছিলেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের বারাণসীর অধিবেন বসে। গোখেল তীব্র ভাষায় সরকারী নীতি ও সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপের নিন্দা করেন এবং ভারতীয় জনগণের স্বার্থে সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার সুপারিশ করেন। লালা লাজপৎ রায়ও সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মসম্মত প্রতিরোধের সুপারিশ করেন। মোটকথা এই অধিবেশনে চরমপন্থী গোষ্ঠীর (Extremists) উদ্ভব হয় এবং চরমন্থীরা কংগ্রেসকে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করে।

এই সংকটময় মুহূর্তে পূর্ববাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য এবং নতুন প্রদেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ নিরলস প্রচেষ্টা চালান। ধান বাড়ীর জমিদার নবাব আলী চৌধুরী ও পূর্ব বাংলার উদিয়মান নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। তাঁরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সভায় আয়োজন করে নতুন প্রদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং নব গঠিত প্রদেশের সপক্ষে জনমত গড়ে তোলেন।

ইতিমধ্যে লর্ড কার্জন পদত্যাগ করে (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে) স্বদেশে চলে যান। প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচিনারের সঙ্গে সামরিক প্রশাসন ক্ষেত্রে মতবিরোধই তাঁর পদত্যাগের কারণ। তাঁর স্থলে লর্ড মিন্টো নতুন ভাইসরয় হয়ে আসেন এবং এদেশের উত্তেজনামূলক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেন। ভারত সভার পক্ষ থেকে তাঁর নিকট প্রদেশ বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। কিন্তু বাঙালী নেতা এবং দেশীয় সংবাদ পত্রগুলিকে মিন্টোর জবাব সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ইংল্যান্ডেও কংগ্রেস সমর্থক পার্লামেন্ট সদস্যগণ হেনরী কটনের নেতৃত্বে তোড়জোড় আরম্ভ করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। এদের প্রশ্নের উত্তরে ভারত সচিব লর্ড মর্লে বলেন, বাংলা বিভাগ প্রশাসনমূলক, তা পরিবর্তন সাপেক্ষ নয়। এতে হিন্দু পত্রিকাগুলি লর্ড মর্লে ও লর্ড মিন্টোর নীতির তীব্র সমলোচনা করে। লর্ড মিন্টোর প্রথম দিকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। পূর্ব-বঙ্গ ও আসামের প্রথম লেঃ গভর্ণর ফুলার স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের প্রতি দমননীতি গ্রহণ করলে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করেন। দেশের এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে লর্ড মিন্টো। কংগ্রেসের নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য লেঃ গভর্ণর ফুলারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন (১৯০৬ খ্রিস্টোব্দে)। ফুলালের পদত্যাগে মুসলমানেরা খুবই ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়। তারা ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

---

১. Ronlashay, Life of Curzon, Vol. II

২. H.H. Dodwell, The Cambridge Shorter History of In

www.pathagar.com

'বাংগালীর দেহ বাংগালীর প্রাণ'

আখতার ফারুক

বাংগালী যে কোনদিনই আর্য আধিপত্য সহ্য করতে পারেনা, তার আধুনিক প্রমাণ পাই আমরা লর্ড কার্জনের সময়ে বংগ-ভংগের নামে আদি বংগের মুক্তি লাভের প্রয়াসে। অবশ্য আর্যরা বাংগালীর ওপরে কালাকালের গায়ের ঝাল মিটাবার সুবর্ণ সুযোগটি হেলায় হারাবার পাত্র ছিল না। যে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বংগ উপনিবেশে যুদ্ধ শোষণের বদৌলতে রাঢ়-সুক্ষের আর্যরা লালে লাল হল, সে মধুর হাড়িটি কি করে সহসা হাতছাড়া হতে দেবে? জমিদারী-মহাজনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি এক কথায় বংগের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজ আর্যের আশীর্বাদে জেঁকে বসে বাংগালকে হাইকোর্ট দেখানোর যে মহান (!) ব্রত তারা চালাচ্ছিল, কোন দুঃখে তারা তা থেকে বঞ্চিত হতে চাইবে?

তাই আর্য কবি সেদিন সংকর বঙ্গের আর্য-দুর্গ কোলকাতায় বসে বাংগালীর দরদে কুম্ভীরাশ্রুর ঝর্ণা ছুটিয়ে গগন-পবন বিদারিত করে হায় হোসেনের মাতম তুলল ঃ

বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু বাংলার ফল

পুণ্য হউক পুণ্য হউক, পুণ্য হইক হে ভগবান!

আর তাঁর সাথে সাথে গোটা আর্য সমাজ কোরাস মিলিয়ে সুর ধরল ঃ

বাংগালীর দেহ বাংগালীর প্রাণ

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

একেই বলে মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ। আশ্চর্য যে, তখনও যারা আমাদের বাঙাল বলে উপহাস করত, যারা আমাদের জুতা, ছাতা, পাল্কী, চেয়ার ব্যবহারের অযোগ্য ভাবত, যারা আমাদের গরু-ছাগলের সাথে বেঁধে দহলিজে চীৎ করে রাখাটা পরম কর্তব্য বলে ভাবত, যারা আমাদের

www.pathagar.com

শেষ সম্বল দু'বিঘা জমিও কেড়ে নিয়ে সখের বাগান তৈরী করত, যাদের বিশ্বকবি তখনও বাংগালকে মানুষ বলে স্বীকার করতে অপারগ হয়ে ফরিয়াদ তুলল ঃ

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী

রেখেছ বাংগালী করে মানুষ করনি।'

যেই মাত্র আমরা সেই অমানুষ বাংগাল স্বতন্ত্র ও মুক্ত হতে চললাম, অমনি তারা রাতারাতি এরূপ বাংগাল বনে গেল যে, বেচারা কার্জন দিশেই পেল না, সত্যিকারের বাংগালী কি আমরা, না তারা? ফলে, আমাদের মূল বংগের মুক্তির গোরস্তানে সংকর বংগের ব্যঙের ছাতা নতুন করে গজিয়ে উঠল। মুক্তি-পাগল বাংগালীর রাজধানী ঢাকা আর্য চক্রান্তের শিকার শোকবিহবল অনার্যের বেদনায় ঢাকা পড়ল। আর্য-দূর্গ কোলকাতা খুশীতে আবার ডগমগিয়ে উঠল।

এ তো গেল তাদের রূপ।

তারপর তাদের স্বরূপ ধরা পড়ল পাকিস্তানের নামে মুক্তি ঘোষণায়। উনিশ শ' ছেচল্লিশের গণভোটে যখন আমরা অনার্য হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ বাংগালী সম্মিলিতভাবে আর্য নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রায় দিলাম, দাবী জানালাম গোটা বাংলাকে আবার অনার্য কর্তৃত্বে ছেড়ে দিতে, অমনি ভন্ড বাংগালীর মুখোস খসে পড়ল। বংগ জননীর অখন্ডত্ব রক্ষার ভীষণ পণ তাদের হাওয়ায় উবে গেল। ঠিক সমান তালেই জিগির তুলল তারা বাংলা থেকে কেটে পড়ার জন্যে। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে রাতারাতি একেবারে বিপরীত কোরাস গেয়ে উঠল তারা ঃ

বাংগালীর দেহ বাংগালীর প্রাণ

ভাগ হউক, ভাগ হউক, ভাগ হউক হে ভগবান!

শুধু তা-ই নয়। আমাদেরি নিঃশেষিত রক্তমাংসে গড়া বিপুল ঐশ্বর্যশালী কোলকাতাসহ দু'তিনটি জেলাও ইউরোপীয় আর্যের আশীর্বাদে তারা কেটে নিয়ে গেল। নতুন জগৎশেঠ নন্দরাজী চক্রান্তে আমাদের মূল বংগটিও অখন্ড রাখা গেল না। সে জন্যে আমাদের নেতৃবৃন্দের প্রাণান্ত প্রয়াস আর্য চক্রান্তে ব্যর্থ হল।

আরব প্রবাদে একেই বলে, 'কুল্লু শায়ইন য়্যারজেউ ইলা আসলিহী'-সব কিছুই অবশেষে মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতীতের বংগ ও বাংগালী অবশেষে তাদের মূল রূপ ফিরে পেল। তেমনি ফিরে পেল সুক্ষ্যের বাসিন্দারা তাদের সাবেক অবস্থা। সংকর তথা মেকী বংগের এটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি।

বস্তুত, এ দু'টি এলাকার সাংস্কৃতিক তারতম্যও অনেক বেশী। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর তাঁর 'বাংলার কাব্য' গ্রন্থে এ দু'দেশের আকাশ-পাতাল সাংস্কৃতিক ব্যবধানটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"বাংলায় আর্য প্রভাবের শক্তি এমনিতেই ক্ষীণ, পূর্ব বংগে সে প্রভাব ক্ষীণতর। বরঞ্চ পশ্চিম বংগে স্থিরতা অনেক বেশী, রাজশক্তির প্রভাবও সেখানে অধিকতর কার্যকরী। তাই বৌদ্ধযুগের অবসানে যেদিন হিন্দু অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ মানবকে ধ্বংস করার চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে, প্রাক্তন মজ্জাগত জাতি বিচারের পূর্ব স্মৃতির মধ্যে পশ্চিমবাংলায় তা অনেক পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল। বল্লালী কৌলিন্য প্রথার উদ্ভব যেখানে সবচেয়ে বেশী সাফল্যও বোধ হয় সেইখানে। কিন্তু ভংগুর বিপ্লবী, পরিবর্তনশীল পূর্ব বংগে জাতি বিচারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সে পরিমাণ সার্থক হয়নি। সেই জন্যেই পূর্ব ও পশ্চিম বংগের সমশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও বিবাহে-ব্যবহারে অল্পদিন আগে

www.pathagar.com

পর্যন্ত নানাবিধ বাধার কথা শুনা যেত। হিন্দু অভ্যুত্থানের বিজয়ের দিনে কৌলিন্য ও জাতি বিচারের প্রাবল্যের মধ্যেও পূর্ব দেশে বৌদ্ধ মনোবৃত্তির অহিংসতা ও সাম্য প্রচ্ছন্ন হয়ে বেঁচেছিল। মুসলিম বিজয়ের সংগে তা আত্মপ্রকাশ করে পূর্ব বংগের ধর্মীয় রূপ বদলে দিল।"

এ পার্থক্য যে নতুন নয়, আদিকাল থেকেই চলে এসেছে, তার প্রমাণ পাই জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে। 'পশ্চিম বংগের সংস্কৃতি' রচয়িতা বিনয় ঘোষ বলেন-"চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দের জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে সর্বপ্রথম সুহ্ম ও রাঢ়ার নাম পাওয়া যায় যখন, তখন তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, সেখানে বন্য সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল।"

অথচ সেই চতুর্থ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় সভ্য শ্রেষ্ঠ বংগবাসীর পরিচয় মিলে। পক্ষান্তরে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের প্রতি দুর্ব্যবহারের চিত্রেও আমরা রাঢ়ীদের বর্বরতার নিদর্শন পাই। রমেশবাবু আচারাঙ্গ সূত্র থেকে সে অত্যাচারের বর্ণনা আমাদের এভাবে শুনালেন ঃ "আচারাঙ্গ সূত্র নামক প্রাচীন জৈনগ্রন্থের পশ্চিম বংগবাসী বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার উল্লেখ আছে। তখন রাঢ়দেশ বজ্রভূতি ও সুহ্মভূমি এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর পথহীন এই দুই প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময়ে এখানকার লোকেরা তাঁহাকে কামড়ায়। জৈন সন্ন্যাসীগণ অতিশয় খারাপ খাদ্য খাইয়া কোন মতে বজ্রভূমিতে বাস করেন। কুকুর ঠেকাইবার জন্যে সর্বদাই তাঁহারা এইটি দীর্ঘ দন্ড সংগে রাখিতেন। জৈন গ্রন্থকার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, রাঢ় দেশে ভ্রমণ অতিশয় কষ্টকর।"

বস্তুত, মহাবীর তীর্থঙ্করের সাথে রাঢ়ীদের এ নিষ্ঠুরতা আমাদের মহানবীর সাথে তায়েফবাসীর নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে বাংগালীরা মহাবীরকে সাদরে বরণকরে ব্যাপকভাবে যে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ পাই চীনা পর্যটক ফা-হিয়েনের বর্ণনায়।

এর কারণ সুস্পষ্ট। দু'এলাকায় দু'জাতের মানুষ বাস করত। তার পরিচয় পাই আমরা বিনয় ঘোষের বর্ণনায়। তিনি বলেন, "ছোট নাগপুরে ও সাঁওতাল পরগনা থেকে পশ্চিম বংগের উত্তরাংশের উচ্চভূমি সীমা পর্যন্ত আদি অষ্ট্রাল বা নিষাদ জাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিকার ও পশুপালনের ঐতিহ্য আজও পশ্চিম বংগের বহু উপজাতির মধ্যে জীবিত রয়েছে। এমন কি বন্য ফলমূল সংগ্রহ পর্যন্ত। শিকার উৎসব তাদের অন্যতম উৎসব।"

বলা বাহুল্য, এরা হল বংগের দ্রাবীড় বিতাড়িত জাতি। বর্বর সংস্কৃতির বিদর্শন নিয়ে আজও তারাই পশ্চিম বংগে ও পূর্ব বংগের পার্বত্য এলাকায় টিকে আছে। তারা পামীর ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আর্যদের কাছাকাছি এক সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল। শিকার, পশুপালন, বন্য ফলমূল সংগ্রহ ইত্যাকার ব্যাপার তাদের নিঃসন্দেহে আর্যদের সমগোত্রীয় বলে প্রমাণ করে। এগুলো সবই যাযাবর সংস্কৃতির নিদর্শন। পক্ষান্তরে, বংগের দ্রাবীড়রা হল নাগরিক সভ্যতা বিমন্ডিত। সুতরাং এ দু'টি বিপরীতমুখী সংস্কৃতির মানুষ যদি একত্রে থাকতে ব্যর্থ হয়, সেটাকে নেহাৎ স্বাভাবিক ব্যাপারই বলতে হয়।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের শাসনাধীন ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় বৃটিশ সরকার অনেক দিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড কার্জন অবশেষে ভারত সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গ বিভাগের অনুকূলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ পাওয়া মাত্রই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। দূর মফস্বলেও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিয়া অসংখ্য সভা-সমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইতে থাকে। কিন্তু লর্ড কার্জন তাঁহার সিদ্ধান্তে অচল অটল রহিলেন। অধিকন্তু এত বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও বড়লাট সদর্পে ঘোষণা করিয়া দিলেন, তাঁহার সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হইবে না এবং ১৯০৫ সালের ১৬ ই অক্টোবর হইতে পূর্ব বাংলা ও আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবে। বড়লাটের এই সদম্ভ ঘোষণার উত্তরে বাঙালী হিন্দুরাও অনুরূপ দর্পের সহিত জানান যে, তাঁহারা বঙ্গভঙ্গ নীতি কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইবেন না।

শাসনকার্যে সুবিধা এবং ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার তাগিদে লর্ড কার্জন প্রায় একেই সময় পাঞ্জাবের একটি ক্ষুদ্র অংশ সীমান্ত এলাকার সহিত জুড়িয়া দিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তথায় তেমন কোন প্রতিবাদ হয় না।

বঙ্গভঙ্গের অনুকূলে যতটা ছিল, ইহার বিপক্ষে ততটা ছিল না। এমতাবস্থায় লর্ড কার্জন যদি ধীরে সুস্থে এ ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গোটা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইত কিনা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। লর্ড কার্জনের গোঁয়ার্তমীর ফলে বাঙ্গালী হিন্দুদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে থাকে যে,

www.pathagar.com

তাহাদিগকে দুর্বল করার জন্যই তাহাদের একাংশকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং অপর অংশকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। লর্ড কার্জন প্রশ্নের এই দিকটা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা বলা শক্ত ।

প্রথম ভুলের সংশোধনের চেষ্টা করিয়া এ সময় লর্ড কার্জন আর একটি ভুল করিয়া বসেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দালনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তিনি বৃটিশের সেই সনাতন ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক অজ্ঞ মুসলমান সমাজের কাঁধে ভর করেন। মুসলমানদিগকে বুঝানো হইতে লাগিল, পূর্ববঙ্গ ও আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে তথায় সংখ্যাগুরু হিসাবে তাহাদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা যে একটা ভাঁওতা এবং মুসলমানকে দিয়া হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার একটা অপকৌশল মাত্র, তাহা মুসলমান শিক্ষিত শ্রেণীর এক অংশ সহজে বুঝিয়া লইয়া লর্ড কার্জনের ফাঁদ হইতে দূরে সরিয়া রহিল।

অনন্যোপায় হইয়া তিনি ঢাকার জমিদার নওয়াব খাজা স্যার সলিম উল্লাহ্‌র সাহায্য গ্রহণ করেন। বিশাল জমিদারীর মালিক হিসাবে ইনি স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া কিছুসংখ্যক মুসলমানের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গের মধ্যেই তাহাদের উন্নতি এবং সরকারী চাকুরী প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ইহার জওয়াবে ব্যারিস্টার এ.রসুল, মওলবী লিয়াকৎ হোসেন, মওলবী আবুল কাসেম প্রমুখ মুসলিম জননায়কগণ উক্ত নওয়াবের জমিদারী এবং নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসামের সরকারী চাকুরীতে নবনিযুক্ত হিন্দু কর্মচারীদের সংখ্যার উল্লেখ করিতে থাকিলে, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মুসলমানরা লর্ড কার্জন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের মুসলিম প্রীতির তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার দল হইতে আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িতে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞ মুসলমানদের উপর আরও কয়েক বৎসর নওয়াব সলিম উল্লাহ্‌র প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে অক্ষুণ্ন থাকে। সরকারী উস্কানির ফলে এ সময় বাংলার কোন কোন জেলায় ছোট-খাটো আকারে একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাও সংঘটিত হয়। এ সকল দাঙ্গার দরুন অজ্ঞ মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, সরকারের হাত অধিকতর শক্তিশালী, বঙ্গভঙ্গ সমর্থক মুসলমান নেতৃবর্গের খেতাব লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর এবং হিন্দু বিপ্লবীদের দল দ্রুত ভারী হইয়া উঠিতে থাকে। বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জনের মাধ্যমে হিন্দু জনসাধারণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করিয়া তোলে।

আন্দোলনের বিস্তৃতি

মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশের বিরোধিতা এবং সরকারী নির্যাতন সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শহর হইতে গ্রামে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। নেতৃস্থানীয় বিপ্লববাদীরা একটু দূরে থাকিয়া ভাবপ্রবণ ছাত্র সমাজ হইতে সদস্য সংগ্রহপূর্বক তাহাদের দলের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ্যের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। বিপ্লবীর তাঁহার নিকট নূতন প্রেরণা লাভ করেন। শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতার সাহায্যে দেশের সর্বত্র বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে থাকেন। ১৯০৭ সালে আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁহার ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রায় শুনিবার জন্য সেদিন আদালতে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রী বিপিন চন্দ্র ছিলেন সেই মামলার একজন প্রধান সাক্ষী। কিন্তু তিনি আদালতে শপথ গ্রহণ করিতে কিম্বা কোন প্রশ্নের

www.pathagar.com

উত্তর দিতে রাজী না হওয়ায়, মামলাটি ফাঁসিয়া যায়। ইহার ফলেই তাঁহাকে আদালত অবমাননার মামলায় শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আদালতের সম্মুখে জনতা নিয়ন্ত্রণের সময় মিঃ ই.বি. হুই নামক একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুশীল নামক একজন বিপ্লবীকে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারে। বীরবাহু সুশীল তৎক্ষণাৎ তাহার গায়ের সমস্ত শক্তি লইয়া মিঃহুইকে পাল্টা ঘুষি মারিয়া তাহার ঔদ্ধত্যের সুমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। ঘটনাস্থলেই সুশীল ধৃত হইয়া বিচারের জন্য কলিকাতার তদানীন্তন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের আদালতে অভিযুক্ত হন। পর দিবস ম্যাজিস্ট্রেট তাহার প্রতি পনর ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সহস্র সহস্র নাগরিক এবং দেশী-বিদেশী বহু পুলিশের উপস্থিতিতে সুশীল সেন মিঃ হুইকে ঘুষি মারিয়া যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দেন, তাহাতেই উপস্থিত বেশীর ভাগ লোক শুধু যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এমন নয়, তাহারা বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ, বিকল্পে উহা সমর্থন করার বিষয়ও চিন্তা করিতে করিতে সেদিন বাড়ী ফিরিয়াছিল। বেত্রাঘাতের পর সুশীল জাতীয় বীরের মর্যাদা লাভ করেন।

যুগান্তর ও অনুশীলন দল

কলিকাতা এবং ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানত বিপ্লব-আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার বিপ্লববাদীরা 'যুগান্তর' এবং ঢাকার বিপ্লবীবাদীরা 'অনুশীলন' নাম দিয়া তাহাদের সমিতি গঠন করেন। সাধারণত এই দুইটি সমিতির সদস্যগণই বোমা তৈরী ও আগ্নেয়াস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিতেন। ইহার পর অন্যান্য নামেও মফস্বলের কোন কোন স্থানে গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উহারা কোন সময় বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিতে পারে নাই। কারণ অস্ত্রশস্ত্রের জন্য সব সময় তাহাদিগকে কলিকাতার উপর নির্ভর করিতে হইত। কলিকাতা বন্দরে আগত বিদেশী জাহাজের লোকজনের নিকট হইতে সাধারণত উচ্চমূল্যে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইত। সময় সময় ফরাসী শাসনাধীন চন্দননগর হইতেও পিস্তল, রিভলভার ইত্যাদি খরিদ করা হইত।

অনভিজ্ঞতার দরুন ব্যর্থতার ভিতর দিয়া বাংলার বিপ্লববাদীরা। তাহাদের আদর্শ রূপায়নে অগ্রসর হন। এ কারণে তাহারা পূর্ববঙ্গ ও আসামের লেঃ গভর্নর স্যার ব্যামফিণ্ড ফুলার এবং পশ্চিমবঙ্গের লেঃ গভর্ণর স্যার ফ্রেজারকে বোমার আঘাতে হত্যার চেষ্টায় সফলকাম হইতে পারেন না। অবশ্য তাহাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট পশ্চিমবঙ্গের লেঃ গভর্নরের ট্রেনের কয়েকখানি বগি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিপ্লবাদীগণকে ধরিতে না পারিয়া সরকার রেলের কয়েকজন নিরপরাধ কুলীকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের দ্বারা স্বীকারোক্তি করাইয়া তাহাদের লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। আদালতে ইহারা তাহাদিগকে শেখানো জবানবন্দীতে বলে যে, কতিপয় অজ্ঞাত-পরিচয় যুবকের প্ররোচনা এবং অর্থ প্রাপ্তির লোভে তাহারা এই ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হইয়াছিল।

এ সময় কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডকেও হত্যার চেষ্টা-চরিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয় । মিঃ কিংসফোর্ডকে বাংলায় রাখা নিরাপদ মনে না করিয়া কর্তৃপক্ষ অতঃপর তাঁহাকে মোজফ্ফরপুরে বদলী করিয়া পাঠান। কিন্তু মোজফ্ফরপুরেও মিঃ কিংসফোর্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলেন না। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিন

www.pathagar.com

প্রফুল্লা চাকী এবং ক্ষুদিরাম নামক দুই জন বাঙালী যুবক মোজফ্‌ফরপুরের মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের বাংলার সম্মুখে রাত্রি আটটার সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমার আঘাতে গাড়ীখানিতে তৎক্ষণাৎ আগুন ধরিয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত গাড়ীখানি ছিল খ্যাতনামা ইংজ ব্যারিস্টার মিঃ কেনেডির–মিঃ কিংসফোর্ডের নয়। গাড়ীতে সে সময় মিঃ কেনেডির পত্নী ও তাঁহাদের এক কন্যা ছিল। বোমার আঘাতে কন্যাটি ঘটনাস্থলেই এবং মিসেস কেনেডি দুইদিন পর হাসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বোমা নিক্ষেপের পর প্রফুল্লা চাকী এবং ক্ষুদিরাম পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক হইয়া মোজফ্‌ফরপুর ত্যাগ করেন। পরদিবস সকালে মোজফ্‌ফরপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে একটি রেলওয়ে স্টেশনে মুদীর দোকানে বিশ্রাম গ্রহণের সময় ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। প্রফুল্ল চাকী মোজফ্‌ফরপুর হইতে সমস্তিপুর পৌঁছিয়া মোকামা ঘাটের উদ্দেশ্যে যেই গাড়ীতে উঠেন সেই গাড়ীতে শ্রী নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় নামক পুলিশের জনৈক সাব-ইন্‌সপেক্টর সাধারণ পোশাকে অন্যত্র যাইতেছিলেন। প্রফুল্ল চাকীর হাবভাব ও নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি মোজফফরপুরের ঘটনার কথা ইতোমধ্যে জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হন এবং এমন হাবভাব দেখাইতে থাকেন যাহাতে প্রফুল্ল চাকী বুঝিতে পারেন, তিনিও একজন দেশপ্রেমিক। নানা আলাপ-আলোচনায় তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়তর হওয়ায় তিনি মোকামা ঘাটে পৌঁছিয়া প্রফুল্লা চাকীকে গ্রেফতারের জন্য অগ্রসর হইতেই, প্রফুল্ল চাকী পিস্তল হস্তে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু নন্দলালের ডাকে পুলিশের লোকজন তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রফুল্ল চাকী অবশেষে স্বীয় পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ও ভদ্রলোক শ্রেণী

আসহাবুর রহমান

উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও 'স্বদেশীর' ধর্মীয় চরিত্র আন্দোলনের ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুঙ্কারে পরিণত হয়েছিল। ভদ্রলোক শ্রেণীর শক্তি প্রতীক ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ স্বদেশীকে হিংস্রতা অবলম্বনে সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। ১৯০৫ এর ২৮ শে সেপ্টেম্বর ছিল মহলয়া। ঐ দিনটিতে কালিঘাটের বিখ্যাত কালী মন্দিরে পুজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেয়া হয়েছিল।

২৪ ও ২৭ শে সেপ্টেম্বরের দুটো সভায় সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ বিভাগ বাস্তবায়নের দিন ১৬ ইং অক্টোবর "রাখী বন্ধন" দিবস ঘোষণা করলেন।[১] গেরুয়া সূতো জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালীর হাতে বেঁধে কবির বাঙালী জাতির অখণ্ডতা ও অবিভাজ্যতা প্রমাণ করবার এই প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। এর আগে ২২ শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার টাউন হলে বিখ্যাত বাগ্মী (ইংরেজী ভাষায়) লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো।[২] বঙ্গ বিভাগের পরে দুই বাঙলার ঐক্য ও সংহতি টিকিয়ে রাখার জন্য একটি 'ফেডারেশন' গঠন করবার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হলো। ৫ই অক্টোবর একটি ঘোষণায় বলা হলো এই উদ্দেশ্যে একটি মিলনায়তন নির্মাণ করা হবে এবং ১৬ই অক্টোবর তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার দিন ধার্য হলো ১৬ অক্টোবর চিৎকার রোডে ৫০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে "খণ্ডিত বঙ্গভূমির অবিচ্ছেদ্য বন্ধ নকে চিহ্নিত ও অক্ষুণ্ন রাখার" প্রতীক হিসেবে ফেডারেশন হলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান আনন্দ মোহন বসুর সভাপতিত্বে শুরু হলো। সভায় এই ইংরেজী ঘোষণাটি পাঠ করা হয়েছিল,

"whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali Nation, we hereby pledge and proclaim that we, as a people, shall do everything

www.pathagar.com

in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our reace, So God help us."[৩] সভার পর সভায় যোগদানকারীরা সুরেন্দ্রনাথসহ নগ্নপদে দু'মাইল 'দূরবর্তী বাগবাজারে পশুপতি বসুর গৃহে সমবেত হয়ে আরেকটি সভায় মিলিত হয়ে স্বদেশী আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য ৭০ হাজার টাকা চাঁদা তোলেন। [৪]

মহান জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথের আচরণেও 'স্বদেশীর' হিন্দু চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেবমূর্তির সামনে স্বদেশী প্রতিজ্ঞা নেয়ার পরিকল্পনা একটি মন্দিরের সামনে স্বদেশী সভায় ভাষণ দেয়ার সময় কীভাবে তাঁর মাথায় এসেছিল, সে সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন,

"As I spoke and had my eyes fixed upon the temple and the image, and my mind was full of the associations of the place, in a moment of sudden impulse I appealed to the audience to stand up and to take a solemn vow in the presence of the god of their worship. I administered the vow, and the whole audience, standing, repeated the words after me."[৫]

বৈদ্যবাটির কালিমন্দিরেও একটি সভায় অনুরূপভাবে স্বদেশী আন্দোলন সফল করার শপথ নেয়া হয়েছিল।[৬] স্বদেশীর হিন্দু চরিত্রের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে বীরভূম থেকে প্রচারিত এই ইসতেহারটি,

"Bande Mataram

Sir, you are the son of a Hindu, and are in the habit of worshipping gods and Brahmins. Our humble request is that you should not use sugar and salt, refined with blood and bones of cows and pigs, in worshipping gods and offering oblations to your forefathers. This is the injunction of the Shastras. We are sons of Hindus and should not disregard Shastras."[৭]

১৯০৩-এর ডিসেম্বর রিজলীর বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের পর প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতাবাসী উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিত করেছিলেন। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট বাংগালী মুসলমান নেতা স্বদেশীর সক্রিয় সমর্থক হয়েছিলেন।[৮] এদের মধ্যে আবুল কাসেম, আবদুল হালিম গজনবী, আব্দুল রসুল হুসেন, দিন মোহাম্মদ, দিদার বক্স, লিয়াকত হুসেন, আব্দুল গফুর এবং ইসমাইল হুসেন সিরাজী প্রমুখরা পূর্ব বাংলায় স্বদেশী নেতা হিসেবে বিশিষ্ট হয়েছিলেন। ১৯০৫ এর ২৩শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার রাজারবাজারে আব্দুর রসুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে আব্দুল রসুল বলেছিলেন, "We both Hindus and Mohammadans here belong to the same mother country Bengal." সভায় আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় লক্ষে এবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, "(1) recording the protest of the Mohamadean community against the current report to the effect that they had no sympathy with the measure adopted by the Hindus for the amelioration of their country and offering their support to the Hindus; (ii) expressing their desire to join the Hindus not merely regarding the Partition but also other

www.pathagar.com

matters; (iii) and also expressing their strong support in favour of the use of Swadeshi godds."[৯]

বলা বাহুল্য মুসলমান স্বদেশী নেতাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদ ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী ৪২ বছর বাংলার রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার দুটো যুধ্যমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

বাংলার প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন এভাবে দেশের জনমর্মান্তিক পরিণতি বয়ে এনেছিল চতুর্থ দশকের শেষে। স্বদেশী যুগের শেষ বিপ্লবী নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ সমন্বয়ের মাধ্যমে বাঙলার হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতিবর্ণের বাধা ভেঙ্গে বাঙ্গালীকে মেলাতে চেয়েছিলেন।[১০] কিন্তু তিনি ছিলেন একা এবং শেষ পর্যন্ত যে ভদ্রলোক শ্রেণী ১৯০৫ সালে বাঙলাকে বিভক্ত করার প্রতিবাদ এমন গৌরবময় স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দিয়ে ছিলেন ১৯৩৭-এর পর বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান মধ্যশ্রেণীর কাছে নেতৃত্ব হারানোর আতঙ্কে তাঁরাই শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দুর্ভাগ করার পক্ষে রায় দিলেন। ব্রমফিল্ডের ভাষায়,

"The basic objective of British policies in Bengla throughout this half-century was to combat Hinu bhadrolak exclusiveness, but the tragic effect of those policies was to reinforce that very characterstic. By their actions the British gave encouragement to the separatists, and when they finally yielded power it could only be to the opposing overnment of a divided Bengal." [১১]

---

১. Bengalee 26 and 28 September, 1906.
২. Haridas asn Uma Mukherjee, op. cit, পৃষ্ঠা, ৭৩।
৩. R.C Majumdar, History Of The Freedom Movement In India, Vol, পৃষ্ঠা, ২৬-২৭।
৪. ঐ পৃষ্ঠা, ২৭।
৫. Surendranath Baneriji, op. cit পৃষ্ঠা, ২২৮-২২৯।
৬. Haridas and Uma Mukherjee, op. ciot., পৃষ্ঠা, ৬০।
৭. ঐ পৃষ্ঠা, ২৭।
৮. Sumit Sarkar, op. cit., Chapter VII.
৯. Haridas and Uma Mukherjee, পৃষ্ঠা, ৬৯।
১০. J.H. Broomfield. op. cit., Chapters VI and VII.
১১. ঐ পৃষ্ঠা, ৩৩১।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ রদকারীরা কেমন আছেন?

আবদুল মান্নান তালিব

সুদূর ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের ক্ষুদ্র দ্বীপদেশের একটি জাতি সামুদ্রিক দস্যুবৃত্তিকে জীবিকার অংশীভূত করেছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ আবিষ্কারের পর দস্যুতার সাথে সাথে উপ-মহাদেশে বাণিজ্য বিস্তারেও আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় সহায়তায় গড়ে তুললো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। তারপর ভাগ্যের খেলা। কোথায় থেকে কি হয়ে গেলো! একদিন ক্ষমতার মসনদে বসলো সুবে বাংলার। মীর জাফরের ছিল ক্ষমতার লোভ। কিন্তু জগতশেঠ, উমিচাঁদ ও রায়দুর্লভদের অন্ধ করেছিল কিসের মোহ? যে মোহে অন্ধ হয়ে তারা ক্ষমতায় বসিয়েছিল ইংরেজকে সেই মোহই ১৯০৫ সালে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বঙ্গ ভঙ্গের বিরোধিতার। সেই মোহই ১৯৪৭ সালে আবার তাদেরকে উলটো পথে চালিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বঙ্গমাতাকে দ্বিখন্ডিত করতে তারা একটুও দ্বিধা করেনি। তাদেরই প্রস্তাবে, তাদেরই উদ্যোগে এবং তাদেরই তত্ত্বাবধানে বাংলা দ্বিখন্ডিত হয়েছে। মা তখন তাদের কাছে মাসী এমনকি বৈমাত্রেয় মাসীর কদরও পায়নি। অথচ ১৯০৫ সালে তারা একজোট হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধতা করেছে। কারণ তখন বঙ্গভঙ্গের মধ্যে ছিল মুসলিম স্বার্থ।

ইংরেজ শাসকরা নিজেদের প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গ করেছিল। একথা তো অস্বীকার করা যাবে না। মোগল আমলে সম্রাট মুহাম্মদ শাহের আমলে ১৭৩৩ সালে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা--এ তিনটি প্রদেশ নিয়ে বঙ্গদেশ গঠিত হয়। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজরা বঙ্গদেশ অধিকার করে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজরা তো দিল্লীর মোগল সুলতানদের থেকে সুবেদার সনদ হাসিল করে। তাই মোগল আমলে বাংলার যে ভৌগোলিক সীমানা ছিল সেই সীমানাই তখনো অব্যাহত থাকে। পলাশীর পরে ভারতে রাজ্য বিস্তারের মোহ ইংরেজদের পেয়ে বসে। পশ্চিম ও দক্ষিণের বিভিন্ন এলাকা তারা নানা ছলে-বলে-কৌশলে দ্রুত দখল করতে থাকে। তাদেরকে পুরোপুরি এবং মনে-প্রাণে সহযোগিতা করছিল তাদের এদেশীয় একদল এজেন্ট ভারতবর্ষীয় বিশাল হিন্দু সমাজের একটি

www.pathagar.com

বিরাট গোষ্ঠী। তারা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। সে স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের পরবর্তী একচ্ছত্র শাসক হবার। তারা জানতো ইংরেজরা তো এদেশে থাকবেনা। তাদের মধ্যে আছে হোম সিকনেস। স্বদেশ জ্বর। এ জ্বর একবার উঠলেই কোনো ইংরেজ স্থির থাকতে পারতো না। দরকার হলে চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে বৌ-বাচ্চা নিয়ে একেবারে জাহাজে চড়ে সাগর পাড়ি। সোজা ইংল্যান্ড। মুসলমানরাই তাদের একমাত্র বাধা। কাজেই মুসলমান স্বার্থের বিরোধিতা করতে হবে। এটি তাদের একটি মূল পলিসি।

১৯৭৪ সালে ওয়ারেং হেস্টিংসকে ইংরেজ অধিকৃত ভারতের সমস্ত এলাকার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত থাকে। পরবর্তী আশি বছর পর্যন্ত এভাবে সর্বভারতীয় গভর্নর জেনারেলের অধীনে বঙ্গ প্রদেশও শাসিত হতে থাকে। এ সময় এবং এর পরেও আসাম বাংলার সাথে যুক্ত ছিল। ১৮৫৪ সালে বঙ্গদেশের জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এর বিশ বছর পর বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা ও রাষ্ট্রীয় আয়তন ছেড়ে যাওয়ার ফলে প্রশাসনিক গুরুভার কমাবার জন্য ১৮৭৪ সালে আসামকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করে সেখানে একজন চীফ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। তারপর ১৮৯২ সালে বঙ্গদেশের লুসাই পার্বত্য অঞ্চলকে কেটে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপরও ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার বঙ্গদেশ একটি বিশালায়তন প্রদেশ হিসাবেই থেকে যায়। ১৯০৫ সালে এর আয়তন ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা সাড়ে ৮ কোটি।

এ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে যদি দু'ভাগে বিভক্ত করে থাকে তাহলে এটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলনা। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদাকৃত এ নতুন প্রদেশটির নাম দেয়া হয় 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম'। উত্তরের দার্জিলিং, জলপাইগুঁড়ি ও কোচবিহারসহ সমগ্র রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, মালদহ জেলা, পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য ও সাবেক সমগ্র আসাম এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ঢাকা হয় এর রাজধানী এবং চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর। এর আয়তন হয় ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫ শত ৪০ বর্গমাইল। অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের দ্বিগুণ। লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ ছিল মুসলমান। বাদবাকি অধিবাসীরা ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও বিভিন্ন উপজাতি। অন্যদিকে বঙ্গদেশের সংগে যুক্ত করে দেয়া হয় মধ্য প্রদেশ ও মাদ্রাজের উড়িয়া অধ্যুষিত অঞ্চল। এভাবে পুনর্গঠিত বঙ্গদেশের আয়তন হয় ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫ শত ৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা হয় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ।

হিন্দু বুদ্ধিজীবী, জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী বণিক ও মুৎসুদ্দী শ্রেণী এর বিরোধিতা করলো কেন? তারা কি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল? মানবতা প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল? বাঙ্গালী প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল? হয়তো এর সবগুলিই ছিল বা হয়তো কোনোটাই ছিলনা। তবে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় ছিল হিন্দু স্বার্থ প্রেম। এই হিন্দু স্বার্থ প্রেমের আবার একটা নেতিবাচক দিকও ছিল। সেটি হচ্ছে মুসলমানদের কোনো প্রকার অগ্রগতি সহ্য করা যাবে না।

এটা কেন? আমার মনে হয় এর মূলে আছে বর্ণবাদী আভিজাত্য। যার ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্ট একদল মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেনা। আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে কুকুরকে তারা চুমু খায়, কিন্তু তথাকথিত অনার্য তথা শূদ্রকে চুমু খেলে তাদের জাত যায়। অথচ কুকুরকে চুমু খেলে জাত যায় না। এদেরই প্রপাগাণ্ডা হচ্ছে, বাংলার বেশীর ভাগ মুসলমান নীচ জাতের হিন্দু ও

www.pathagar.com

শূদ্রদের থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে। কাজেই মুসলমানরা লেখাপড়া শিখে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়ে তাদের চেয়ে এগিয়ে যাবে, এটা তারা বরদাশ্‌ত করবেনা।

দ্বিতীয়ত তাদের বৈষয়িক স্বার্থ। ইংরেজের তল্পীবহনের বদৌলতে তারা জমিদারীর মৌরসি পাট্টা লাভ করে গরীব মুসলমান কৃষকের ঘাম ঝরা পয়সায়। কলকাতায় বসে আয়েশ করছে। বঙ্গভঙ্গ হলে নির্ঘাত এ আয়েশের সুযোগ আর থাকবেনা। মুসলমানরা সম্পদশালী হবে। লেখাপড়া শিখে বৈষয়িক উন্নতি করবে।

মোটকথা মুসলমানদের এগিয়ে যাবার উঠতি। ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার পেছনে তাদের এ ভীতিপ্রবণতাই ছিল মুখ্য। মুসলমানদের যত বেশী ক্ষতি করা যায়।

বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলে আসাম আলাদা প্রদেশে পরিণত হয়। এরপর ১৯৭১ সালে আমরা বাংলার মাত্র সেই অংশটুকুকেই স্বাধীন করতে পারলাম, যেটুকুকে কেটে তারা অর্থাৎ এই বর্ণবাদীরা পূর্ব পাকিস্তান করে দিয়েছিল। পাকিস্তান তো হয়েছিল ধর্ম ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। কিন্তু বাংলাদেশ তো ধর্ম ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে হয়নি। বাংলাদেশ তো হয়েছে বাংলা ভাষার ভিত্তিতে, এ কথার স্বীকৃতি আদায় করার ব্যাপারে বরং তারাই বেশী সোচ্চার। তাহলে আজ বাঙ্গালী ও বাংলাদেশী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হবার পথে তাদের বাধা কোথায়। কেন আজ তারা বাঙ্গালী হয়েও অন্যের তাঁবেদারী করছে?

বর্তমানে আমাদের দেশের শাসনযন্ত্রেও প্রচারযন্ত্রে দিন-রাত বাঙালীর মাহাত্ম্য প্রচারে যাদের দিনের আরাম ও রাতের নিদ্রা হারাম হয়ে গেছে তাদেরকে বলি, এক দল বাঙ্গালীর অন্য জাতির দাসত্বে আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কেমন করে? তাদের জন্য কি আপনাদের কিছুই করণীয় নেই?

www.pathagar.com

ঢাকা ঃ বাঙালী-মুসলমানের সাংস্কৃতিক রাজধানী

আবদুল মান্নান সৈয়দ

অনেক বছর ধরে পূর্ববঙ্গ মুসলমান প্রধান। আর পূর্ব বঙ্গের কেন্দ্র ছিলো ঢাকা। সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকা ছিলো মুঘল সুবাহ্‌র রাজধানী-তখনকার নাম জাহাঙ্গীরনগর। ইংরেজরা আসার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্থান শুরু হয় কলকাতার। কলকাতা ইংরেজের রাজধানী হয় ১৭৭৩ সালে। স্বভাবতই ঢাকা অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা-কেন্দ্রিকতাতেই আবির্ভূত হন নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমূখ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা অল্প কিছুকালের জন্যে প্রাদেশিক রাজধানী। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে ঢাকা আবার রাজধানিত্ব হারালো। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ঢাকার সাংস্কৃতিক জাগরণ শুরু হয় ফের। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাজনের পর ঢাকা হয় নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর গত পঁচিশ বছরে ঢাকার সাংস্কৃতিক উন্নতি দ্রুতধাবী হয়ে ওঠে। আসলে বাংলাদেশে গত পঞ্চাশ বছরে (১৯৪৭-৯৬) বাঙালী-মুসলমান রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অগ্রগতি অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক সর্বমুখে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষত সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্যে তো বটেই। বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরে বাঙালি-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে এমন একটি স্থির দৃঢ়তা স্থাপিত হয়েছে, যা আগে আর-কখনো ছিলো না।

বাঙালি-মুসলমানের ইতিহাস

ইসলামের এই বিজয় অভিযানের কারণ ছিলো এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সুরের মধ্যে লুকিয়ে। গ্রীস, রোম, পারস্য, চীন এমন কি ভারত বর্ষেরও প্রাচীন সভ্যতায় ঘুণ ধরে যাওয়ায় বিপুল

www.pathagar.com

জনসাধারণ যে চরমতম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হলো তা থেকে বাঁচিয়ে ইসলাম এক আলো-ঝলকিত দেশের নির্দেশ তাদের দিতে পেরেছিলো বলেই তার এই অসাধারণ বিস্তার সম্ভব হয়েছিলো। "কথ্য দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ইসলামের তলোয়ার আল্লার নামেই সঞ্চালিত হয়েছিলো, কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা এমন নতুন সমাজ গঠনের ও নতুন চিন্তাধারার পথকেই উন্মুক্ত করে দিয়েছে যে কার্যত তাই করেছে অন্যান্য সকল ধর্ম ও বিপ্লবের সমাধি রচনা।" (মানবেন্দ্রনাথ রায় Historical Role of Islam এর তর্জমা ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান') বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদান সম্পর্কে মানবেন্দ্র নাথ রায়ের এই বিশ্লেষণ, প্রশান্তি, স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কয়েক লাইনে বাংলাদেশে ইসলাম তথা বাঙালি-মুসলমানের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করবার চেষ্টা করছি।

ইসলামের আবির্ভাব হয় সপ্তম শতাব্দীতে। ঐ সপ্তম শতাব্দীতেই খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনকালে মুসলিম নৌবহর ভারতীয় পানি এলাকায় উপনীত হয়। (ডঃ তারা চাঁদ ঃ Influence of Islam on Indian Culture এর তর্জমা ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব') মুসলিম প্রশাসন এদেশে শুরু হয় আরো কয়েক শতাব্দী পরে। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশে কয়েকশো বছরের মুসলিম প্রশাসনের সূচনা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মোটামুটি মধ্যভাগ পর্যন্ত মুসলিম প্রশাসনকে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ('মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য') গ্রহণযোগ্য এই ক'টি ভাগে বিভাজন করেছেন ঃ

১. তুর্কী আমল ঃ ১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ

২. স্বাধীন মুসলিম বাংলা ঃ ১৩৫০-১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ

৩. মুঘল আমল ঃ ১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশে সারা মধ্যযুগ ভরে একছত্র রাজত্ব করেছে ইসলাম। 'তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্য শাসন-ব্যবস্থা লোপ পাওয়ায়, দেশ হইতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অপসারিত হইতে লাগিল। এই ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের স্থলাধিকারী হইল ইসলাম।' অস্ত্র বলে নয়, মানবিকতা দিয়েই ইসলাম হয়ে উঠলো এদেশের এক অদম্য ও অনতিরোধ্য শক্তি। ছ-শো বছরের অধিককাল ধরে এদেশের প্রশাসনের ভাষা ছিলো ফারসি। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ফারসি রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বহাল থাকায় চিরকালের মতো বাংলা ভাষার উপরে আরবি-ফারসি ভাষার প্রভাব মুদ্রিত হয়ে গেলো।' ..... ব্রাহ্মণগণ প্রথমত ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইহারা 'সর্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পূরণ অনুবাদকগণের জন্য ইহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন। .... আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল/মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালী হইয়া পড়িলেন।' (দীনেশ চন্দ্র সেন ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য')।

ঐ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ দশক পর্যন্ত আটশো বছর ধরে বাঙালি-মুসলমানের সংস্কৃতি তৈরি হয়ে উঠেছে। 'ইসলাম কী রূপরেখা'য় রাহুল সাংকৃত্যায়ন-নির্দেশিত ইসলামের ঔদার্যের কারণে স্থানিকতাকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলেই ইসলাম ভূমন্ডলে সম্প্রসারিত হয়েছে এই উক্তি বাঙালি মুসলমানের জন্যেও প্রযোজ্য। বাঙালি-মুসলমানের জীবন যাপনের ধারাতেও খুব স্বাভাবিকভাবেই মিশে গেছে স্থানিক রূপ-রেখা-রঙ। দুশো বছরের রাজত্বকালীন ইংরেজ প্রভাবও পড়েছে। এইসব প্রভাব সঞ্চারিত সঞ্চালিত হয়েও বাঙালি-

www.pathagar.com

মুসলমানের একটি নিজস্ব জীবন চেতনা ও জীবন ধারা গড়ে উঠেছে। তার পুরোটাই আবার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বা রাষ্ট্র কেন্দ্রিক নয়। বাঙালি-মুসলমানের জীবনধারায় বাংলা ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, সাহিত্য, সংগীত চিত্রকলা, ঈদ, মুহররম, শবেবরাত, রোজার পার্বণসমূহ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের প্রত্যেকটি ধারায়-বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক বৈজয়ন্তী উড়ছে আজ। সেই পিতাকায় রঙ-রেখ, রূপ বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, নিজস্ব একেবারেই তা বাঙালি-মুসলমানের। সেই পতাকার রঙ রেখা রূপ ইতিহাস ও ভূগোলের এক গভীর শাশ্বত বিস্ময়কর মিশ্রণের ফল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সেখানে নিঃশব্দে কাজ করেছে, ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে নিঃশব্দ কাজ করেছে। জীবনধারার এই প্রকাশ্য বহিরবয়ব বাদে এর অন্তরাত্মায় এমন কিছু আছে যাকে আমি বলছি জীবন চেতনা। এই প্রকাশ্য জীবনধারা আর পরোক্ষ জীবনচেতনা মিলেমিশে আমাদের বাঙাল মুসলমানের সংস্কৃতি।

সংস্কৃতিঃ উপ, অপ, আগ্রাসী

উপমহাদেশে কোনোকালে 'এক ভারতীয় সংস্কৃতি' বা এক বাঙালি সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল না। বাহির বিশ্ব হতে বৈদিক হিন্দু সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায় ও পরে পাশ্চাত্য জাতির এ উপমহাদেশে আবির্ভাবের ফলে এদেশে সংস্কৃতি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপে বিকশিত হয়েছে। প্রতিটি চক্রে এই সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা কৌতুককর ও শিক্ষা প্রদ ....। (আব্দুল মওদুদঃ মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর') (কৌতুককর শব্দটি লেখক এখানে 'কৌতুহলকর' চারিত্র বিশ্লেষণ সতত স্মরণীয়। এই বিবর্তমান সংস্কৃতি সব সময় বিদেশ ও বিজাতিক সংস্কৃতির সংঘর্ষে নব-নবায়মান হয়ে উঠছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এর সবটাই সদর্থক নয়। আধুনিক প্রযুক্তির নতুন মাধ্যমগুলো নিজে হয়তো অপরাধী নয় অনেক সময় সেই মাধ্যমগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ফলেই উৎপন্ন হচ্ছে উপসংস্কৃতি-সংস্কতির সংকীর্ণ চক্র, যা সমগ্র জনমন্ডলীর মধ্যে বিস্তৃত নয়; অপসংস্কৃতির-যার মধ্য দিয়ে অনেক অশালীনতা (আমাদের সামাজিক দৃষ্টিতে ও পটভূমিকায়) প্রবেশ করছে; আগ্রাসন-ভিন্ন প্রবলতর সংস্কৃতির অন্যায় প্রভাব এসে পড়ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে তাই সতর্কতা প্রয়োজন। আমাদের পারিবারিক জীবনের বন্ধন ও সুশান্তি আজো অটুট, কোনো মুল্যে আমরা একে খোয়াতে রাজি নই। বৃহত্তর বাঙালি সংস্কতির মধ্যেও বাঙালি-হিন্দুর ও বাঙালি-মুসলমানের সংস্কৃতির একটি ফারাক আছে-তা কেবল ধর্ম সম্পৃক্ত কর্মকান্ডে নয়, খাদ্যে-পোশাকে, বাচনে ও আচরণে-জীবনাচার থেকে জীবন চেতনায় সর্বত্র বিকশিত ও বিস্তারিত। একেবারে এই নব্বই-এর দশকে রোজার সময় সামাজিক মিলন ক্ষেত্র হিসেবে যে ইফতার পার্টি প্রবর্তিত হয়েছে, তা কেবল একটি সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। বাঙালি-মুসলমান নারীজাগরণ শুরু হয়েছে এই শতাব্দীর সুচনা মূহুর্ত থেকে; তখনি এই নারী জাগরণের অগ্রদূতী বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন ঃ অবরোধ-মুক্তি মানে পর্দাহীনতা নয়। পারিবারিক জীবনকে অটুট রেখেই আজ আমাদের নারী কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কেন তার পথ জুড়ে দাঁড়াবে ... অপদেবতারা? আমাদের তরুণদের সামনে সূর্য করোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কেন তাকে আক্রমণ করবে পাশ্চাত্য বিভ্রান্তি কিংবা ভিনদেশী আগ্রাসন? শবে-বরাতে আর একুশে ফেব্রুয়ারীর রাত্রি-জাগা তরুণদের যে উত্তরাধিকার, বাঙালি-মুসলমানের সেই জাগরণকে আমরা হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে আমাদেরই জীবনানুগ বাস্তবতার ছবি দেখতে চাই-আরোপিত বাস্তবতায় নয়। যে বাস্তবতা কেবল শ্রেণীসাম্যের কথা বলে, কল্পিত

www.pathagar.com

ফতোয়ার গল্প তৈরি করে, শতকরা ৮৬ ভাগ মানুষের দৈনন্দিন কৃত্যের চিত্র যাতে পাওয়া যায় না তাকেও আমরা অপসংস্কৃতির অঙ্গীভূত মনে করি।

উপসংহার

সংস্কৃতির একটি প্রতিশব্দ 'তমদ্দুন'। 'মদীনা' শব্দ থেকে এই 'তমদ্দন' শব্দটি তৈরি হয়েছে। ইসলাম নগরকেন্দ্রিক ধর্ম। সংস্কৃতিও সারা পৃথিবীতেই নগরকেন্দ্রিক। বাঙালি-মুসলমান শিক্ষা-দীক্ষায় রাজনীতিতে এবং সার্বিকভাবে পিছনে পড়ে থাকায় দীর্ঘকাল গ্রামকেন্দ্রিক ছিলো। তার প্রথম আধুনিক বিকাশ নিশ্চিতভাবে কলকাতায়। গড়ের মাঠে ঈদের জামাতের নামাজ বা ১০ই মুহররমের ব্যাপক অনুশীলন থেকে সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে তার নিজস্ব বিকাশ, স্বকীয় পরিচিহ্ন মুদ্রিত হতে থাকে। পূর্ণ বিকাশ ঘটতে থাকে দেশ বিভাগের পরে মফস্বলী ম্লানতা ঘুচিয়ে ঢাকা যখন রাজধানীতে রূপান্তরিত হলো।

কিন্তু তারপরই কি বাধা অপসৃত হলো? অখন্ড পাকিস্তান যখন ছিলো তখন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো ছিলো কিরকম আড়ষ্ট ও আরোপিত। এখন সে সব অনুষ্ঠানকেই মনে হয় কতো স্বতস্ফূর্ত কতো সাবলীল কিরকম প্রাণজাগরূক।

সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলামরা যা করেছিলেন চিত্রকলায় জয়নুল আবেদিন, সংগীতে আব্বাস উদ্দীন, নৃত্যে বুলবুল চৌধুরী উত্তরকালে চলেছে তারই সফল পরিবহন। ১৯৪২ সালে হুমায়ুন কবির লিখেছিলেন, 'ভারত বর্ষের জীবনে মুসলমান সম্প্রদায়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চারি দিকের আন্দোলন ও চাঞ্চল্যে তাদের মনেও সাড়া জেগেছে, কিন্তু অন্যের মতো নানা দিকের নানা টানে তারাও বিভ্রান্ত। বিভিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক আদর্শ যুগপৎ তাদের টানছে। ধর্ম ঐতিহ্যের বিচিত্র শক্তি তাদের মনেও সক্রিয় এবং এ সমস্ত আদর্শ ও আকর্ষণের শক্তি ও লক্ষ্য বহুক্ষেত্রেই বিভিন্ন।' (মোসলেম রাজনীতি) শ তাব্দীর শেষ দশকেও বাঙালি-মুসলমানের মধ্যে বহু বৈপরিত্য ও দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু তারপরও এই পঞ্চাশ বছরে বাঙালি-মুসলমানের অগ্রসরণের একটি স্পষ্ট ধারা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পরে যতোটা তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতবেগে ১৯৭১-এ স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাঙালি-মুসলমানের সার্বিক অগ্রগতি। এই সার্বিক অগ্রগতিরই অংগভাষ আমাদের সংস্কৃতি।

কালচারের দু'টি অংশ ঃ একটি আদর্শিক, আরেকটি স্থানিক। সংস্কৃতির স্থানিকতা ততোক্ষণে গ্রাহ্য যতোক্ষণ আদর্শকে আঘাত করে না। যেমন, বাঙালি মুসলমান স্থানিক পোশাক গ্রহণ করেছে-কিন্তু প্রতিমা পূজা করে না।

তৌহিদ বা স্রষ্টার একত্ব হচ্ছে বাঙালি-মুসলমানের মূল। এর সঙ্গে আছে সংগ্রামশীলতা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বজনীনতা, ধর্মীয় সহনশীলতা। আমাদের সংস্কৃতিকে এসবের ছাপ। বাঙালি-মুসলমান তার বাঙালিত্ব ছাড়েনি, তার মাতৃভাষা ছাড়েনি। বাঙালি-মুসলমান তার মুসলমানিত্ব ছাড়েনি, তার ধর্ম বিশ্বাস ছাড়েনি। বাঙালি-মুসলমান ধর্ম ও আধুনিকতার সমন্বয় করেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে নাগরিক সংস্কৃতির ব্যবধান লুপ্ত হচ্ছে দিনে দিনে। বাঙালি-মুললমানই একটি স্বাধীন সার্বভৌম নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে আজ বাঙালি-মুসলমান সংস্কৃতির বিকাশ খুব স্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত।

www.pathagar.com

বঙ্গ ভঙ্গ এবং তৎকালীন হিন্দু মানসিকতা

আবুল আসাদ

হিন্দু জাতীয় উত্থানের ঝড়োগতি ১৮৯৬ সালে শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে মারমুখি রূপ পরিগ্রহ করে। আর ঠিক এই সময় ১৮৯৩ সালে মারা গেলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ এবং ১৮৯৮ সালে মারা গেলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। সৈয়দ আমির আলীও বিলেতমুখো হলো ১৯০৪ সালে। সব দিক থেকে ঘোর অন্ধকারে তখন মুসলমানরা। এমনি এক পরিবেশে ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর বাংলার মুসলমানদের অন্ধকার জীবনে আলোর এক দ্বীপ শিখা হিসেবে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হলো। যার ফলে পূর্ব বাংলা আলাদা এক প্রদেশ হিসেবে গণ্য হবে। ঢাকা হবে যার রাজধানী। এই ঘোষণা আহত ব্যাঘ্রের মতো জাগ্রত ও হিংস্র করে তুলল হিন্দুদের। হিন্দুদের এই মারমুখো উত্থান মুসলমানদের জন্যে শক ট্রিটমেন্টের কাজ করল। মুসলমানরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অনুভব করল। এই প্রয়োজন থেকে গড়ে উঠল তাদের অত্মরক্ষার এক ঐতিহাসিক দুর্গ। বাংলা চৌদ্দ শতকের শুরুতে সংঘটিত এই ঘটনা বাংলা চৌদ্দ শতককে দান করল সুস্পষ্ট এক চরিত্র, নতুন এক গতি এবং অনন্য এক ইতিহাস। কি ছিল ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই বঙ্গভঙ্গের ঘটনা?

বঙ্গভঙ্গ আসলে নিছক কোন বঙ্গ-ভঙ্গ ছিলনা। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে লর্ড কার্জন তৎকালীন বিশাল বাংলা প্রদেশকে দু'টি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। একেই খারাপ অর্থে চিত্রিত করার জন্যে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ আখ্যায়িত করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ বা এই প্রদেশ বিভাগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ঘোষিত হলো ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনে ঘোষিত এ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাসহ সম্বলপুর, গাঞ্জাম ও ভিজাগাপত্তম এজেন্সি বাংলা প্রদেশের সাথে, অন্যদিকে বাংলার চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসাম প্রদেশের সাথে এবং ছোট নাগপুরকে মধ্য

www.pathagar.com

প্রদেশের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হলো।

প্রদেশ বিভাগের এই পরিকল্পনা পরে আরও সংশোধিত ও পরিবর্তিত হলো। ১৯০৪ সালের এপ্রিলে লর্ড কার্জন যখন লণ্ডন যান, তখনই তিনি বিষয়টির পুনর্বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলে গেলেন। কার্জন লণ্ডন গেলে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অ্যাম্পটহিল। তার সময়েই বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গবিভাগের নতুন পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করা হলো। এই ডিসেম্বরেই কার্জন ফিরে এলেন লণ্ডন থেকে। তিনি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৫ সালের ৯ জুন বাংলা বিভাগকে অনুমোদন দান করলেন। অনুমোদিত এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলার রাজশাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদহকে চীফ কমিশনার শাসিত আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলো। আর বাংলার অবশিষ্ট এলাকার সাথে সম্বলপুর ও উড়িষ্যার পাঁচটি এলাকা যুক্ত করে গঠিত হলো বাংলা প্রদেশ। হিন্দী ভাষা-ভাষী পাঁচটি এলাকা বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হলো গিয়ে মধ্যপ্রদেশের সাথে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে নতুন প্রদেশ বিভাগকে কার্যকরী করা হলো।

প্রদেশ পুনর্গঠনের পর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হলো ঢাকা। এই নতুন প্রদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়ালো ৩ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১ কোটি ৮০ লাখ, হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। অন্যদিকে বাংলা প্রদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়ালো ৫ কোটি ৪০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯০ লাখে, আর হিন্দুর সংখ্যা হলো ৪ কোটি ২০ লাখ। কলকাতা হলো বাংলা প্রদেশের রাজধানী। এই প্রদেশ বিভাগের ফলে জাতি হিসেবে মুসলমানরা লাভবান হলো। একদিকে ঢাকাকে তারা রাজধানী হিসেবে পেল, অন্যদিকে ১,৮৬,৫৪০ বর্গমাইল বিশিষ্ট বিশাল প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুর্শিদকুলি খান ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেবার পর পূর্ব বাংলার প্রতি যে অবহেলা শুরু হয়েছিল এবং বৃটিশ আমলে কোলকাতা কেন্দ্রিক শাসনে পূর্ব বাংলার উপর যে দুর্দিন চেপে বসেছিল, তার প্রতিকারের একটা পথ হলো নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে।

বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গ বিভাগ ছিল এখানকার বৃটিশ শাসকদের দীর্ঘ দিনের প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনার ফল। যা কার্যত শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। এ বছর বাংলার গভর্নরের (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) পদ সৃষ্টি করার সময় এ আশা পোষণ করা হয় যে, এর ফলে বাংলার প্রশাসন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ১৮৬৭ সালে উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের পর প্রণীত তদন্ত রিপোর্টে বাংলার আয়তন-জনিত প্রশাসনিক দুর্বলতাকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১] বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম গ্রে লরেন্সের নিকট লিখিত এক পত্রে বললেন, "বর্তমান বাংলা সরকারের মতো এমন অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ভারতে আর আছে বলে আমি জানিনা। ভারতে আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা আর গুরুত্বের দিক থেকে সর্বপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সরকারের কর্মক্ষমতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার অপেক্ষা অনেক কম ও শ্লথ।" [২] এই ভাবেই বঙ্গবিভাগের সুস্পষ্ট চিন্তা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। উল্লেখ্য, এ সময় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী উত্থানের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়নি। লেফটেন্যান্ট গভর্নর গ্রে যখন এ চিঠি লেখেন, তারও নয় বছর পর ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস। সুতরাং হিন্দুদের উত্থান প্রতিরোধ করার জন্যে বঙ্গবিভাগ চিন্তার উদ্ভব হয়নি। কার্জন গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার ২ বছর আগে ১৮৯৬ সালে বঙ্গবিভাগের সুস্পষ্ট প্রস্তাব প্রণীত হয়। চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বিভাগের কমিশনার ওল্ডহ্যাম ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপারিশ করলেন যে, আসামসহ চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের অংশবিশেষ নিয়ে পূর্ব বাংলা নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়া দরকার। ৩. চট্টগ্রাম অথবা ঢাকাকে তিনি এ নতুন নামে নতুন প্রদেশের রাজধানী করার কথা বললেন। এ বছরই নভেম্বর মাসে আসামের চীফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড আসামের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব দিলেন। ৪. উল্লেখ্য, এর আগে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লুসাই অধিবেশনের সুপারিশক্রমে চট্টগ্রাম জেলাসহ লুসাই অঞ্চলকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা অবশ্য তখন কার্যকরী হয়নি। ৫. সুতরাং ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো, গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড কার্জন আসার আগেই বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। লর্ড কার্জন এই চিন্তা, প্রস্তাবকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন মাত্র। অতএব, লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত--একথা কোন দিক দিয়েই ধোপে টেনেনা।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মাধ্যমে হিন্দু মনোভাব এক যুগান্তকারীরূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। হিন্দুরা তাদের শোষণ ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গ হারালো, পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা, কোলকাতার পশ্চাৎভূমি থেকে পূর্ববঙ্গের খসে পড়া এবং রাজধানী ঢাকা ও বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের বিকাশ লাভকে বরদাশ্‌ত করতে পারেনি। পারেনি বলেই হিন্দুরা একবাক্যে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধিতায় নেমে এল!

প্রথমেই মাঠে নামলেন 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। উল্লেখ্য, কোলকাতা কেন্দ্রিক ভদ্রলোক (বাবুশ্রেণী) ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে কোন মুসলমান ছিলনা) জনমত গঠন ও তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করার প্রধান দায়িত্ব ও নেতৃত্ব সুরেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন [৬]। ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত সরকারের সচিব রিজলীর বঙ্গবিভাগ সংক্রান্ত চিঠি প্রকাশ হবার সাথে সাথেই সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী তার কাগজ 'দি বেঙ্গলী'তে লিখলেন, "বাংলাকে খণ্ডিতকরণের প্রস্তাবের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমরা নিশ্চিত যে, গোটা দেশ একটা দেহের মত এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।"[৭] বাংলার জমিদার শ্রেণীর সংগঠন 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিবাদ সভা করল ১৯০৪ সালের ১৮ মার্চ তারিখে। এ প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করলেন উত্তর পাড়ার জমিদার, বেঙ্গল ও ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য প্যারীমোহন মুখার্জী। সভায় উপস্থিত ছিলেন নাটোরের জমিদারসহ ভুপেন্দ্রনাথ বসু, সীতানাথ রায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ শীর্ষ হিন্দু ব্যক্তিত্ব। সভায় বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করে ভারত-সচিবের কাছে প্রেরিত স্মারক পত্রে বলা হলো, "বাঙ্গালী জাতিকে আলাদা আলাদা অংশে বিভক্তিকরণ এবং তাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভাষাগত বন্ধনে ভাঙ্গন সৃষ্টি অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করবে।" ১৯০৪ সালের ৩ রা ফেব্রুয়ারি তারিখে বেঙ্গল চেম্বারস অব কমার্সের অনারারী সেক্রেটারী সীতানাথ রায় বাহাদুর এবং ১৯ শে মার্চ এই সংগঠনের সেক্রেটারী ডাব্লিউ পার্সন আর তাদের সঙ্গে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী মহারাজ প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, ১৯ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠান। এদের সাথে ভারতের শ্বেতাঙ্গ চা ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী সংগঠন' 'ইন্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন' ক্যালকাটা বেলড জুট এ্যাসোসিয়েশন', 'ইন্ডিয়ান জুট মিলস এ্যাসোসিয়েশন' এবং 'ইন্ডিয়ান মাইনিং এ্যাসোসিয়েশন',-এর এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারীদের চিঠিও শামিল ছিল। এভাবে

www.pathagar.com

কোলকাতা ভিত্তিক জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অর্থাৎ 'পাওয়ার এলিট'দের সকলে একজোট হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করল। এর সাথে এসে যুক্ত হলো প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতাও। ১৯০৫ সালের ১০ ই জানুয়ারী কোলকাতা টাউন হলে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করল। এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। ১৯০৫ সালের ৭ ই আগস্ট মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোলকাতা টাউন হলের জনসভায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করা হলো। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুংকারে পরিণত হলো। ১৯০৫ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন কালিঘাটের বিখ্যাত কালি মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেয়া হলো। [৯] এর দু'দিন আগে ২৪ ও ২৭ শে সেপ্টেম্বরের দু'টি জনসভায় সভাপতির ভাষণে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ হিসেবে বঙ্গবিভাগ বাস্তবায়নের দিন ১৬ ই অক্টোবর 'রাখীবন্ধন' দিবস ঘোষনা করলেন [১০]।

অন্যদিকে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করল। উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিভ্রান্তির পর মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনাকে জাতির জন্যে এক মহাসুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। বৃটিশ পার্লামেন্টের নেতা কেয়ার হার্ডিকে লেখা নবাব সলিমুল্লার এক চিঠির ভাষায় মুসলমানদের মনোভাব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ঐ চিঠিতে সলিমুল্লাহ লিখেছিলেন, "আমরা বঙ্গবিভাগ সমর্থন করছি। এটা আমাদের উপকারে আসবে। এ ব্যাপারে সামান্য কোন সন্দেহও নেই। মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং ফল স্বরূপ এখানে তারা গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের স্বার্থকে এখানে যত্নের সাথে দেখা হবে। পুনর্গঠিত জেলা প্রশাসনের অধীনে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি উৎসাহ লাভ করছে। আগের ব্যবস্থায় এটা সম্ভব ছিলনা। কারণ প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে যে মনোযোগ লাভের প্রয়োজন ছিল, তা আগের ব্যবস্থা দিতে পারেনি।"[১১]

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মুখপাত্র তখন ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। বঙ্গভঙ্গের পক্ষ-বিপক্ষ আন্দোলনের কঠিন দিনে তিনি জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবিভাগের প্রথম বার্ষিকী হিন্দুরা উদ্‌যাপন করল 'জাতীয় শোক দিবস' পালনের মাধ্যমে। মুসলমানরা এদিন আনন্দ উৎসব করল বটে, কিন্তু তাদের কণ্ঠ ছিল দুর্বল।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের উৎকট ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তার প্রকাশ ঘটেছিল। স্বদেশ-জাতীয়তাকে আরাধ্য দেবীতে পরিণত করা হয়েছিল এবং আগেই এই দেবীর জন্য প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার সব পণ করা হয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকায় বলা হলো, "হে বাঙ্গালী, তুমি কি নর-কীট হতে জন্মেছিলে?..... যখন বাঙ্গালাদেশ দু'ভাগ হল দেখে সাত কোটি বাঙ্গালী মর্মাহত হয়ে পড়লো, সেদিনকার কথা আজ একবার ভাব। সেদিন স্বদেশের জন্য কোটি কোটি হৃদয়ের ব্যথা যেমনি এক হল, অমনি মাতৃরূপিনী স্বদেশ শক্তি পলকের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র আপনাকে প্রকাশ করিলেন, বাঙ্গালীও সর্বত্র আচম্বিতে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া উচ্চঃস্বরে মাকে আহ্বান করিল।..... সেদিন যেন এক নিমিষের জন্যে বাঙ্গালীর কাছে মা আমার প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেদিন যে বাঙ্গালী বড়ই ব্যথা পেয়েছিল, ভেবেছিল মা বুঝি দ্বিখণ্ড হয়েছে, তাই মা আত্মপ্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমি দ্বিখন্ড হই নাই, তোদের একত্র রেখে সহজেই শক্তিদান কর্তুম, আজ সেই বাঁধা ঘর শত্রুরা ভেঙ্গে দিলে মাত্র; যেদিন আমার জন্যে স্বার্থ ও সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিতে অগ্রসর হবি, সেদিন আবার সেই শক্তি তরঙ্গ মাঝে আমার দেখা পাবি, আমি মরি নাই। ..... এস বাঙ্গালী, আজ মার সন্ধানে

www.pathagar.com

বেরুতে হবে। সে বার মা আপনি এসে দেখা দিয়েছিলেন, এবার মার জন্য লক্ষ রুধিরাক্ত হৃদয়ের মহাপীঠ প্রস্তুত করে রেখে মাকে খুঁজে খুঁজে কারামুক্ত করে নিয়ে আসব। ..... একবার সকলে বুকে হাত দিয়ে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার সমস্ত পণ করে আজ মার সন্ধানে বেরুতে পারবে কিনা?..... বাঙ্গালীকে 'বন্দেমাতরম' মাতৃমন্ত্র শিখাইতে হইবে। ..... সর্বাগ্রে মাকে সাক্ষাৎ বন্দনা কর, মাকে তাঁর উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে বিদ্যা, অর্থ, মোক্ষ ইত্যাদি সবই ক্রমশ আসিয়া পড়িবে।"

এই হিন্দু-জাতীয়তাবাদী উম্মাদনার সাথে রবীন্দ্রনাথও পুরাপুরি একাত্ম হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী দু'টি সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বাস্তবায়নের দিনকে তিনি 'রাখি বন্ধন' দিবস ঘোষণা করেন। 'রাখি বন্ধন'-এর দিন সকালে গঙ্গাস্নানের মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই গঙ্গাস্নান অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলেন। সে প্রার্থনা সঙ্গীতে তিনি বললেন-

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক।
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পুণ্য হউক পূণ্য হউক
পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাংগালীর পণ বাঙ্গালীর আশা
বাংগালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাংগালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

এই সঙ্গীত শেষে বীডন উদ্যানে ও অন্যান্য জায়গায় রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পার্শী বাগান মাঠে অখন্ড বাংলার 'বঙ্গভবন' স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে 'ফেডারেশন হলের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে উল্লেখ করেন, " যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।" ('অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৮২, ৮৩) রবীন্দ্রনাথের এ কথা মিথ্যা হয়নি। 'বন্দেমাতরম'-এর খণ্ডিত

www.pathagar.com

মা'কে অখণ্ড করার জন্যে 'প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসারকে পণ করে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তার সাথেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল।" ১৯০২ সালে তিনি (শ্রী অরবিন্দ) মারাঠী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তার ছোট ভাই ও শ্রী যতীন মুখার্জীকে কলকাতায় পাঠান। এ সময়ে যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলার বিপ্লবী দলের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হন [১৪]।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও একথা বলেছেন, "আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ' খন্ড, পৃষ্টা-৩৩)

গুপ্তবিপ্লবী বা স্বদেশী বা সন্ত্রাসবাদী এই দল কতকটা বাম ঘেঁষা ছিল। তাই বলে ভাববার কোন কারণ নেই যে, এদের শরীরে কোনরূপ অসাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ ছিল। এদের লক্ষ্য যেমন ছিল ধর্মরাজ্য, তেমনি এরা কট্টর ধর্মনীতি অনুসরণ করতো। শ্রী নলিনী কিশোর গুহ তার 'বাংলার বিপ্লববাদ' (চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৬ বাংলা, প্রকাশক এ, মুখার্জি এন্ড কোম্পানি প্রাঃ লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২) বইয়ে বিপ্লবী দলের নতুন রিক্রুটদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের যে রীতি-নীতির বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে প্রমাণ হয় বিপ্লবী-স্বদেশীরা পুরোপুরি হিন্দু রীতি-আদর্শের দ্বারা পরিচালিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের মতো কথিত 'মানবতাবাদী' ব্যক্তিরা হিংস্র, উগ্র হিন্দু জাতীয় উত্থানের সাথে জেনে-শুনেই নিজেদের শামিল করেছিলেন।..... রবীন্দ্রনাথের যে 'জাতীয়তাবাদ' বিরোধিতা, সেটা হতে পারে কোন কাব্যিক সৌখিনত্ব।

১৯০৫ সালের আগস্টে মুখ্যত বঙ্গভঙ্গ রদের জন্যে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলো, তার দু'টি রূপ। একটি প্রকাশ্য, অন্যটি গোপন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে চলল স্বদেশী নামের রাজনৈতিক আন্দোলন। অন্যদিকে গুপ্ত সমিতি অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে চলল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মদনমোহন মালব্য, প্রমুখ, কংগ্রেস নেতারা রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছিলেন।

১৯০৭ সালের শেষের দিক থেকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠল। বাংলার বড়লাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বিশেষ রেলগাড়ির ওপর কয়েকবার হামলা হলো। চন্দননগরের কাছে পরপর দু'বার এবং নারায়ণ গড়ে আরেকবার। হামলার কাজে ডিনামাইট ব্যবহার করা হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৯০৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর। বারিন ঘোষের দল এই তৎপরতা চালায়। টার্গেটদের হত্যার জন্যে পার্সেল বোমাও ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের একটা বোমা বুক-পার্সেল আকারে পাঠানো হয়েছিল কিংসফোর্ডের কাছে। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে চন্দনগরের মেয়রের উপর বোমা হামলা চালানো হলো। ঠিক এই সময়েই বোমা হামলার শিকার হলো কিংসফোর্ডের গাড়ি। কিন্তু বোমাটি কিংসফোর্ডের গাড়িতে না লেগে আঘাত করল অন্য একটি গাড়িকে। এ গাড়িতে আরোহী ছিলেন দু'জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা। দু'জনই নিহত হলো। ঘটনাটা ঘটেছিল মোজাফফরপুর নামক স্থানে। প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদরাম বসু ছিলেন এই হামলার নায়ক। ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়লেন, কিন্তু প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়ার আগেই নিজের গুলীতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বিচার হলো ক্ষুদিরামের। বিচারে তার ফাঁসি হলো।

মোজাফফরপুরের ঘটনা ইংরেজ সরকারকে দারুণভাবে বিচলিত করেছিল। গুপ্ত আন্দোলনের লোকদের ধরার জন্যে সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ হন্যে হয়ে উঠল। ঘটনার ২ দিন

www.pathagar.com

পরেই (২ রা মে ১৯০৮) সুপরিকল্পিতভাবে পুলিশের আটটি দল গুপ্ত সমিতির আটটি ঘাঁটিতে হামলা দিল। গুপ্ত সমিতির সদস্যরা ধরা পড়ল সেই ২৫ জুন [১৫]। এদের সাথে অরবিন্দ ঘোষও ধরা পড়লেন। সর্বমোট ৩৬ জনের বিরুদ্ধে আলীপুর কোর্টে মামলা দায়ের হলো। ১২৬ দিন শুনানির পর ১৯০৯ সালের ১৪ ই এপ্রিল রায় হলো। ফাঁসির আদেশ হলো বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের [১৬]। কয়েকজনের হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অবশিষ্টরা বেরিয়ে এলেন দোষ প্রমাণ না হওয়ায়। ইংরেজ সরকার যাকে ধরা ও শাস্তি দেয়ার জন্য সবচেয়ে উদগ্রীব ছিল, সেই অরবিন্দ ঘোষও এদের মধ্যে শামিল ছিল। শ্রী অরবিন্দের পক্ষে চিত্তরঞ্জনদাস যে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে মামলা পরিচালনা করেছিলেন, তা ছিল এক অনন্য ঘটনা। অরবিন্দ সম্পর্কে বিচারক বিচক্রফটকে সি,আর, দাস অত্যন্ত আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "যখন সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটবে, যখন উত্তেজনা ও আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং যখন তিনি আর এই মাটির পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন না, তারও বহু পরে মানুষ বলবে তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের কবি এবং মানবতার পূজারী। তার দেহাবসানের বহু পরে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সুদূর সাগর পারের নানা দেশেও তাঁর বাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হবে।" [১৭] শিবাজীর চিন্তা, চেতনা ও সংগ্রামের উত্তরসূরী শ্রী অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাসের এই ধারণা ও মন্তব্য লক্ষ্য করবার মতো।

গুপ্ত সমিতির ঐ বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ঝিমিয়ে পড়ল। শ্রী অরবিন্দ জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন, 'স্বাধীনতার গতিবেগ স্তব্ধ করার জন্য ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সভা-সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, জাতীয় শক্তির কেন্দ্রগুলো একে একে আক্রান্ত ও বিচূর্ণ জনপ্রিয় নেতারা কারারুদ্ধ বা বহিষ্কৃত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কন্টকিত ও বিঘ্নিত। কলিকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বাকেরগঞ্জের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃত সমিতি', 'সাধনা সমাজ' সরকারী আদেশে বন্ধ ঘোষিত। অরবিন্দ জেলে যাবার পূর্বে, ১৯০৮ সালে, বাংলার আকাশে-বাতাসে শুনতে পেয়েছিলেন 'বন্দেমাতরমের' জয়ধ্বনি, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে, ১৯০৯ সালে, তিনি লক্ষ্য করলেন সেই মাতৃমন্ত্র ক্ষীণ। [৮]

এভাবেই স্বদেশী আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার একটি পর্যায় স্তিমিত হয়ে পড়ল। এই ত ৎপরতা কি ব্যর্থ হয়েছিল? না ব্যর্থ হয়নি। এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার হিন্দুদের মনোভাব টের পেয়েছিল। ইংরেজ সরকার ভীতও হয়েছিল। ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের যে সিদ্ধান্ত নেয়, তার পিছনে এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। [১৯]

সন্ত্রাসী তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়লেও আন্দোলনের নেতারা বিশেষ করে শ্রী অরবিন্দ তার ত ৎপরতা বন্ধ করেননি। স্বদেশী রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে তিনি সরব থাকলেন। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'দি বেঙ্গলী', কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং কমুদিনী মিত্রের 'সপ্রভাত' প্রভৃতি কাগজে শ্রী অরবিন্দ লিখলেন। বক্তৃতা করলেন, 'গো রক্ষিণী' ও ' স্বদেশী সভা'য়। ১৯০৯ সালে ৩০ শে মে 'গো রক্ষিণী সভা'র এক বক্তৃতায় তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের সহযোগী বাংলার কংগ্রেস নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে অভিহিত করলেন 'One of the mightiest prophets of Nationalism', অর্থাৎ সন্ত্রাসী আন্দোলনের নেতারা ইংরেজ সরকারের তাড়া খেয়ে এবার তাদের কাজ কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাঁধে তুলে দিতে এগিয়ে এলেন।

কংগ্রেস নেতারাও এগিয়ে এলেন। এ সময় হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হলো

www.pathagar.com

হিন্দু মহাসভা। অনেক কংগ্রেস নেতাও হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেন। কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃস্থানে অবস্থান করেও যারা হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন এই সমর্থন তারাই জ্ঞাপন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপতরায়, বালগঙ্গাধর তিলক', বিপিনচন্দ্র পাল, প্রভৃতি ২০। দু'টি বিষয় এই হিন্দু মহাসভা গঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করেছিল। একটি ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে মুসলমানদেরকে পৃথক নির্বাচন ও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুবিধা দান। দ্বিতীয়টি হলো গুপ্ত সন্ত্রাসী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়া। হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাগণ চেয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার মত উগ্র ও সোচ্চার হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠনের মাধ্যমে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি, অনুশীলন সমিতি অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতা পূরণ করতে এবং মর্লি-মিন্টোর সংস্কারকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে যা কংগ্রেসকে সাহায্য করবে।

কংগ্রেস এ সাহায্য পেয়েছিল। স্বদেশীদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এই চাপই ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করল বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। স্বয়ং বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের বক্তব্যেই এর নিশ্চিত প্রমাণ মিলে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতের ভাইসরয়, লর্ড হার্ডিঞ্জকে লিখেন, "আমি আশা করি আপনি, ভারতের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সম্রাটের প্রথম ভারত সফরকে কিভাবে অবিস্মরণীয় করে রাখা যায় সে সর্বাত্মক কর্মসূচী প্রণয়ন ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হবেন। বাঙালীদের (বাংলা হিন্দু) সন্তুষ্ট করার জন্যে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মত উভয় বাংলাকে একত্র করা যায় কিনা সে বিষয়েও বিচার বিবেচনা করবেন। ..... বাংলায় বিরাজমান অসন্তোষ, রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী' কার্যকলাপ উপশম এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার লাঘবে এই পদক্ষেপ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।" ২১

হিন্দুদের চাপই অবশেষে কার্যকরী হয়েছিল। সম্রাট যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ভাইসরয়-এর কাছে, তা-ই তিনি কার্যকরী করেছিলেন ১৯১১ সালের ১২ ই ডিসেম্বর তাঁর দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দানের মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চাপ ও অসন্তোষের কথা বিবেচনা করা হয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের হৃদয় যে ভেঙ্গে গেল তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হলো না। এইভাবে হিন্দুদের হিংসারই জয় হলো ২২ । কিন্তু এই হিংসা দুই জাতিকে দুই প্রান্তে ঠেলে দিল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে উৎসাহিত করল দু'টি জাতীয়তাবাদকে, একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান ২৩। শুধু তাই নয় ডঃ আম্বেদকরের মতে, বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে এবং সেই সঙ্গে স্বরাজলাভের দাবি করে তারা (হিন্দুরা) একদিন মুসলমানদের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের শাসক করে তুলবেন। ডঃ আম্বেদকরের এই উক্তির অর্ধেকটা সত্যে পরিণত হয়েছে ইতিমধ্যেই।

সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বিজয় এবং মুসলমানদের সর্বনাশ দেখার জেদ বঙ্গভঙ্গ রদ করেই শেষ হয়ে গেলনা এবং মর্লি-মিন্টো সংস্কারের পৃথক নির্বাচন ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব-সুযোগের বিরোধিতা অব্যাহত রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলোনা, মুসলিমবিরোধী তাদের সহিংস মন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও মেনে নিতে পারল না। উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলমানদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার ১৯১২ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ল

www.pathagar.com

হিন্দুরা। ১৯১২ সালের ২৮ শে মার্চ কলকাতায় গড়ের মাঠে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে তারা সভা করল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ[২৫]। বিস্ময়ের ব্যাপার, পূর্ববঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জমিদারি ছিল, সে রবীন্দ্রনাথও তার মুসলিম প্রজারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক তা চাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেদিন একাট্টা হয়ে প্রচারে নেমেছিল হিন্দু সংবাদপত্রগুলো। হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন শহরে মিটিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করে পাঠাতে লাগলেন বৃটিশ সরকারের কাছে [২৬]। এভাবে বাবু গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলার এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি সহকারে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধিগণ বড় লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবেনা [২৭]। বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে সব হিন্দু যেমন এক হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তাই হলো। পূর্ববঙ্গের, এমনকি ঢাকার হিন্দুরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে এল। A History of freedom Movement' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ "The Controversy that started on the proposal for founding a university at Dacca, throws interesting light on the attitude of the Hinds and Muslims. About two hundred prominent Hindus of East Bengal, headed by Babu Ananda Chandra Ray, the ledading Pleader of Dacca, Submitted a memorial to the viceroy vehemently against the establishment of a University at Dacca For a long time afterwards. They tauntingly termed this University as 'Mecca University.,[২৮] অর্থাৎ ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে বিতর্কের সৃষ্টি করল তাতে হিন্দু ও মুসলমানের ভূমিকা সম্পর্কে মজার তথ্য প্রকাশ পেল। পূর্ব বাংলার প্রায় দুইশ' গণ্যমান্য হিন্দু ঢাকার প্রখ্যাত উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করে ভাইসরয়কে একটি স্মারকলিপি দিয়েছিল। পরে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে বিদ্রূপ করা হতো।'

হিন্দুদের এই সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের বিরোধিতা ও ঘৃণা তারা অব্যাহতই রাখল। এর একটা সুন্দর প্রমাণ পাই আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক শ্রী দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর'-এর ক্তব্যে। শ্রীভান্ডারকর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া তার এক বক্তৃতায় বলেন, "কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা নদীর তীরে হরতগ নামক একজন অসুর জন্ম গ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋষি এবং তাদের শিষ্যগণ বাস করেন। এই অসুর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্যে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রমে নিয়ে যাবে। যারা অর্থ লোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে এই অসুরের আকর্ষণে বৃদ্ধ গঙ্গার তীরে যাবে, তারাও ক্রমে অসুরত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তারা অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

www.pathagar.com

পরিষ্কার যে, শ্রী ভান্ডারকর এই বক্তব্যে 'হরতগ' বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ ফিলিপ হরতগ' কে বুঝিয়েছেন। মিঃ হরতগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৫ বছর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। শ্রী ভাণ্ডারকরের বক্তব্যে হরতগ-এর 'আশ্রম' বলতে বোঝানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়কে। আমাদের 'বুড়িগঙ্গা' হয়েছে শ্রী ভান্ডারকরের বক্তব্যে 'বৃদ্ধগঙ্গা'। আর মূল গঙ্গা-তীরের 'পবিত্র আশ্রম' বলতে শ্রী ভান্ডারকর বুঝিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। শ্রী ভান্ডারকরের কথায় ঢাকা অর্থাৎ পূর্ব বাংলা অসুরদের স্থান। পবিত্র স্থান কলকাতা থেকে যেসব ঋষি শিষ্য ঢাকায় চাকরি করতে আসবেন তারাও অসুর হয়ে যাবে। এ থেকেই বোঝা যায়, মুসলমানদের প্রতি শ্রী ভান্ডারদের বৈরিতা কত তীব্র, ঘৃণা কত গভীর!

তাদের এ বৈরিতার কারণে উপযুক্ত বরাদ্দের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভীষণ অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয় এবং অঙ্গহানিও হয়েছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর ভাষায়, "(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়) মুসলমানরা খুবই খুশী হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণত যারা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তারাও এবার এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাস বিহারী ঘোষ ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। তাদের প্রধান যুক্তি হলো এই যে, প্রশাসন ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে এখন একটি সাংস্কৃতিক বিভাগ করা হচ্ছে। ফলে, এতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের এমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার ক্ষমতা ও অধিকার ঢাকা শহরের দশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।" ৩০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এইভাবে হিন্দুরা একে 'ঠুটো জগন্নাথে' পরিণত করে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিন্ডিকেটে হিন্দু যারা নির্বাচিত হয়ে আসতেন তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈরিতা ত্যাগ করতেন না, তাদের ভোট বিশ্ববিদ্যালয়কে (সিনেটের) সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক ছিল মুসলমান এবং অর্ধেক ছিলেন হিন্দু। প্রফেসররা কোর্টের সদস্য ছিলেন। বার লাইব্রেরীতে অনেক উকিল রেজিস্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এর সভ্য হতেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে হিন্দুরা ভাল চোখে দেখেনি, একথা পূর্বই বলেছি। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত করায় মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে, অনেকটা তা পূরণ করার জন্যই এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে হিন্দুগণই অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি কোর্টে হিন্দুসভ্যরা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রীতির চোখে দেখেননি। বাইরে এ বিষয়ে যে আলোচনা হত কোর্টের সভায় হিন্দু সভ্যদের বক্তৃতায় তা প্রতিফলিত হত। অবশ্য ভোটের সময় জয়লাভের ব্যাপারে আমরা অনেকটা নিশ্চিত ছিলাম। মুসলমান সদস্য এবং হিন্দু শিক্ষক সদস্যরা একত্রে হিন্দু সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন।" ৩১

সংখ্যাগুরু হিন্দুরা মুসলমানদের কোন ভালই সহ্য করতে পারেনি। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিল, মর্লি-মিন্টোর শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তারা বরদাশত করেনি, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে তারা সহ্য করতে পারেনি এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের সহ্য হলোনা। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের প্রতি

www.pathagar.com

হিন্দু মনোভাব সবচেয়ে নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে 'গুরুতর বিপদ' অবলোকন করেছে। এই 'গুরুতর বিপদটা' কি? সেটা মুসলমানদের উন্নতি ও উত্থান। অর্থাৎ হিন্দুরা হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের অস্তিত্বের বিরোধী, যা মাথা তুলেছিল শিবাজী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রী অরবিন্দের আন্দোলনে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উত্থিত এই সংহার মূর্তিই সেদিন মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামকেই অপরিহার্য করে তুলেছিল। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির জন্যে সংগ্রাম ছিল এরই ফলশ্রুতি।

---

১. 'Yules's Minute, July 18, 1867, No. 1, Paras III and III, Feres Minute. December 2, 1867 cited in Z. H. Zaidi, op-cit, Page 115, ('বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৪, ১৫)।

২. 'Grey to Lawrence, July 1867 (John Lawrence Collection. Vol-4913).

৩. Commissioner of Chittagong Division to Government of Bengal, Reb. 7, 1867, No 722 P.L. 1897, Vol. 24.

৪. Chief Commissioner of Assam to Government of India. Nov. 25, 1896, NO. 583, Page 17-19.

৫. The preocedings of Government of India of the Foreign Department 1883-E of July, 25, 1892, See also Lansodowne to cross. Janu, 6. 1892 (The coross Collection. Eur. E, 243 Vol. 32-1.O.L).

৬। সুরেন্দ্র নাথ সম্পর্কে দেখুন তার নিজের লেখা ঃ A Nation in the Making, Calcutta, 1925.

৭। The Bengalee', December 13, 1903

৮। Papers Relating to the reconstitution of Bengal and Assam, London, 190.

৯। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৬।

১০। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৬।

১১। 'Keir Hardie and the first Partition of Bengal M.K.U. Mollah. Appendix B. Rajshahi University Studies, Vo,. iii. January, 1970, Page 18.

১২। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৬ (যুগান্তর পত্রিকার' যোগ ক্ষ্যাপার চিঠি' নামক এই নিবন্ধের রচয়িতা ছিলেন, দেবব্রত বসু, ঐ, পৃষ্ঠঃ ১৬)।

১৩। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পুর্নেন্দু দস্তিদার।

১৪। 'বিপ্লবী দলের কাজকর্ম ইতালীর কার্বোনারী ও রাশিয়ার গুপ্ত সমিতিগুলোর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল।' ('স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' 'পত্রিকার দান', পৃষ্ঠা-১১)।

১৫। ধৃতব্যক্তিরাঃ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, শিশির কুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয়ী কুমার নাগ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায়, পরেশচন্দ্র মল্লিক, শচীন্দ্র কুমার সেন, কুঞ্জলাল সাহা, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণ চন্দ্রসেন, নরেন্দ্রনাথ বঙ্গী, হেমেন্দ্র কুমার ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

বন্দোপাধ্যায়, ধরণী নাথ গুপ্ত, অশোখ চন্দ্র নন্দী, বিজয় রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস, কানাইলাল দত্ত এবং নিরাপদ রায়। এ ছাড়া নরেন্দ্র নাথ গোঁসাই, ঋষিকেশ কাঞ্জিলালসহ আরও ৯ জন ধরা পড়ল পরে। ('স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান', পৃষ্ঠা ৩৫)।

১৬। পরে হাইকোর্টের রায়ে ফাঁসির আদেশ বাতিল হয়।

১৭। 'Sri Aurobindo's Ploitcal Thought', Uma Mukhapadhay & Hari das Mukhopadhay, page 17.

১৮। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান', পৃষ্ঠা ৪০।

১৯। 'একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা এবং অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, আশ্বীনীকুমার দত্ত প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন গণ-আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ সংগ্রাম এক উচ্চতর রাজনৈতিক পর্যায়ে, উপনীত হয়।" (ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন, বদরুদ্দীন উপর, পৃষ্ঠা ৯৫)।

২০। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্টা ৮৯।

২১। ভাইসরয়ের প্রতি সম্রাট, ডিসেম্বর ১৬,১৯১০, HP. ১০৪ ('বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮)।

২২। 'বাঙালী হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ব বঙ্গের বাঙালী মুসলমানরা যাতে যোগ্য স্থান না পেতে পারে, সেই আকাঙ্খার বাস্তবায়ন।', (প্যাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া', আম্বেদকর, পৃষ্ঠা ১১০)।

২৩। 'ভারত কি করে ভাগ হলো', বিমলানন্দ শাসমল, হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৪।

২৪। 'পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া', ডঃ আম্বেদকর, পৃষ্ঠা ১১০।

২৫। এই তথ্যটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আব্দুন নূর তাঁর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিলেবাস বিতর্ক এবং অতীত ষড়যন্ত্রের কাহিনী শীর্ষক নিবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন। তার নিবন্ধনটি প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামের ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৩, সংখ্যায়।

২৬। দ্রষ্টব্য ঃ Calcutta university commission report. Vol. IV, পৃষ্ঠা, ১১২, ১৫১।

২৭। দ্রষ্টব্য ঃ Calcutta university commission report. Vol. IV, পৃষ্ঠা, ১৩৩।

২৮। A history of the Freedom Movemnet', গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের Dacca 'University : Its role in Freedom Movement' শীর্ষক অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০ (Published in 1970).

২৯। শ্রী ভান্ডারকরের এই উক্তিটি ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তার স্মৃতিকথা 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে' উল্লেখ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সভায় শ্রী ভান্ডারকর ঐ উক্তি করেন, সে সভায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

৩০। 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে', ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

৩১। 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে', ডক্টর রমেশেচন্দ্র মজুমদার।

www.pathagar.com

কলকাতার বই ঃ মুখোশধারী আধিপত্য

আল মাহমুদ

বাংলাদেশের বইয়ের বাজারে এখন ভারতীয় বই আমদানি ও বিক্রয়ের প্রবহমান জোয়ার বইছে। সন্দেহ নেই, কলকাতার বই-ই এখন বাংলাদেশের বাজার দখল করে নিয়েছে। একদা যে-সব বই বিক্রেতা এবং প্রকাশক বাংলাদেশের সাহিত্য প্রকাশের এবং বিক্রয়ের একটা ক্ষীণধারা তৈরী করেছিলেন, যাতে জাতীয় সাহিত্য কিছু পরিমাণে হলেও পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিল এখন ভারতীয় বইয়ের জোয়ারে তা তলিয়ে যেতে বসেছে। কলকাতার বই আমদানি ও বাংলাদেশী বই রফতানির যে সমতা রক্ষার একটা নীতিমালার কথা শুনি তা যে অন্তঃসারশূন্য তা এখন কারো বুঝতে বাকী নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রাজধানী একদা ঢাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হবে—এ ধরনের আশা যারা পোষণ করতেন, ভাষা আন্দোলনকারীদের সেই স্বপ্ন এখন আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের কূট-কৌশলের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। একুশে ফেব্রুয়ারীতে যারা প্রভাতফেরী গাইতে গাইতে অসংখ্য ফুলের মালা নিয়ে শহীদ মিনারে যাবে, বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক উত্তেজনায় লাফালাফি করে তারা জানতেও পারে না যে আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলেও আমাদের জাতীয় সাহিত্যের রাজধানী একদল তথাকথিত 'প্রগতিশীল পুস্তক ব্যবসায়ীর'দৌলতে আর ঢাকায় নেই। কারণ একুশের বইমেলায় বিদেশী বই বিক্রয় নিষিদ্ধ হলেও সারা বছর বাংলাদেশের বাজারে যে কলকাতার বই বিক্রির মেলা চলছে তা বন্ধ করার কোনো উপায় আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

এদেশের কয়েকজন লেখক ও বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্রে ভারতের বই আমদানির অসমতায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতিও দিয়েছেন। বিবৃতিটিতে বই আমদানি-রফতানির সমতা রক্ষা অর্থাৎ যে পরিমাণ ভারতীয় বই আমদানি হবে সমতা রক্ষা করে সে পরিমাণ বাংলাদেশী বই-পুস্তকও যাতে ভারতীয় বই বিক্রেতারা গ্রহণ করে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে অনুরোধ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। আমরা জানি, বাণিজ্যিক লেনদেনে কবি-সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীদের কথায় কান দেওয়ার মত সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নেই। থাকলেও বিষয়টা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' পরিপন্থী কি-না এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেই অনেক সময় চলে যাবে। ততদিনে বাংলাদেশের পাঠক রুচি জাতীয় সাহিত্য পাঠ করে যেটুকু গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ পরাভূত হবে এবং মননশীল বাংলাদেশী সাহিত্যের বদলে কলকাতার সাহিত্য এসে আমাদের পাঠকদের সাহিত্য পিপাসা পরিতৃপ্ত করবে।

আসলে এদেশের তথাকথিত প্রগতিপন্থীরা মূলত ভারতপন্থী। আধুনিক বাংলা ভাষার গৌরব ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা তাদের কাম্য নয়। ওদিকে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার একাধিপত্যের দিন হিন্দীর চাপে মুহ্যমান। এই দুর্দশার প্রধান কারণ, কলকাতার সাহিত্যকে যারা শাসন করে অর্থাৎ বড় বড় প্রকাশনা সংস্থা তারা এমনি জীবনবিমুখ ও সাম্প্রদায়িক যে, তাদের উচ্চাশা পূরণের জন্য কলকাতার সংকীর্ণ বইয়ের বাজারই তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের নতুন বাজার বা উপনিবেশ দরকার। তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ঢাকার সাংস্কৃতিক জগত বিশেষ করে সাহিত্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চায়। ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে বাংলাদেশীদের সেন্টিমেন্ট তাদের অজানা নয়। এই আবেগপ্রবণতার রন্ধ্র ধরেই তারা আমাদের বইয়ের বাজারে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। তারা ভাবছে, ভাষার ঐক্যের দোহাই দিয়ে কলকাতার জীবনবোধহীন এবং সার্বভৌম বাংলাদেশের জীনবধারার সাথে সম্পর্কহীন সাহিত্যের আধিপত্য ঢাকায় বিস্তার করবে। এ ব্যাপারে তাদের সহায়ক হবে এমন সব কবি-সাহিত্যিক ও পুস্তক ব্যবসায়ী—যারা নিজেদের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বিনাশের ভয়ে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে সাহসী হবে না।

বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিটি এই ধারণার স্বপক্ষে নয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই তারা সরকারকে সতর্ক করেছেন। তাদের মধ্যে কোন হীনমন্যতা নেই। জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত থাকুক—এটা তাদেরও কাম্য। তারা বলেছেন, যে পরিমাণ বই ঢাকায় আমদানি হয় সে পরিমাণ বই এখান থেকেও যেতে হবে।

আমাদের প্রশ্ন হল–এই সমতা যেখানে আমদানি নীতির কোথাও ঠিকভাবে অনুসৃত হচ্ছে না, সেখানে বইপত্রের আমদানি-রফতানীর ব্যাপারে তা কিভাবে কার্যকর হবে? আমরা জানি, বাংলাদেশে প্রকাশিত গ্রন্থাদির কলকাতার বাজারে দারুণ চাহিদা। কিন্তু কলকাতার লেখক, প্রকাশকগণ এই চাহিদার বিষয়টি কিছুতেই প্রকাশ করতে চায় না; বরং চেপে রাখতে চায়। মুখে যদিও ভাষার ঐক্যের কথা বলে, কিন্তু ঢাকার বই কলকাতায় বিক্রয় বিষয়টি তাদের অস্বস্তি বাড়ায়। এটা সেখানকার কোনো লেখক ও পুস্তক ব্যবসায়ের সাথে জড়িত কারোরই সুবিধা দেবে না। তাছাড়া বাংলাদেশের সাহিত্যের আধুনিকতার সব লক্ষণগুলোই যেহেতু ঢাকার সাহিত্যে ফুটে উঠেছে, সে কারণে আজ না হলেও অদূর ভবিষ্যতে ঢাকাই হবে আধুনিক বাংলা ভাষা-সাহিত্যের রাজধানী, যা কিছুতেই কলকাতার লেখককুল ও প্রকাশনা গোষ্ঠীর মনঃপূত নয়।

আমরা চাই, বাংলাদেশের সরকার আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করুন এবং জাতীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করুন। আমরা ভারতীয় পুস্তক আমদানিরও বিরোধী নই। তবে যেহেতু ঢাকার উদীয়মান সাহিত্য ভাষার একটা প্রোটেকশন দরকার সে কারণে পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষার রচিত সৃজনশীল সাহিত্যের উন্মুক্ত বাজার ঢাকায় অবাধ রাখা কিছুতেই সুবিবেচনার কাজ হবে না।

www.pathagar.com

শতবর্ষের ফেরারী

আহমদ ছফা

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্ব স্থায়িত্ব লাভ করার মধ্য দিয়ে বাঙালি সমাজে একটা বড়োরকম ভাঙচুর চলতে থাকে। মুসলিম অভিজাত শ্রেণী, যাঁরা ছিলেন শাসক নেতৃশ্রেণীর অংশ, তাঁদের অবস্থা ভীষণ রকম শোচনীয় হয়ে পড়ে। নতুন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার তাঁদের না ছিলো মানসিকতা, না ছিলো যোগ্যতা। সিপাহী যুদ্ধের অবসানের পর যে মুষ্টিমেয় অভিজাত কোনো প্রকারে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে নতুন পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অবস্থান নির্মাণের চেষ্টা করে আসছিলেন, বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের সঙ্গে তাঁদের কোনো সামাজিক সম্পর্ক ছিলো না। পশ্চিমা শিক্ষা লাভ করে ইংরেজ সরকারের আমলাতন্ত্রে স্থান করে নেয়া হয়তো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁরা সযত্নে সাধারণ জনগণের সম্পর্ক পরিহার করে চলতেন। তাঁরা বাংলা ভাষায় কথাও বলতেন না। উর্দু ভাষার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। মুসলিম সমাজের এই অংশ থেকেই সৈয়দ আমির আলি, নওয়াব আব্দুল লতিফ এই সকল ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়। সৈয়দ আমির আলি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থাদি রচনা করে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর মনীষা সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে কোনো রকম অনুপ্রেরণা, কোনো রকম প্রণোদনা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। তারপরেও একথা সত্যি যে, সৈয়দ আমির আলির মতো এরকম প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ তৎকালীন হিন্দু সমাজেও অধিক ছিলেন না। নওয়াব আব্দুল লতিফ মুসলিম সমাজের প্রয়োজন এবং দাবি দাওয়ার প্রশ্নে সজাগ ছিলেন, কিন্তু তিনি মনে করতেন বাঙালি মুসলমানের মুখের ভাষা উর্দু হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

উইলিয়াম হান্টার তাঁর গ্রন্থে যাঁদেরকে কাঠ কাটা এবং পানি বইবার ভারবাহী জীব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তারাই ছিলেন বাংলার মুসলমান সমাজের যথার্থ প্রতিনিধি। বাঙালি মুসলমানের সামগ্রিক চিত্র আরো করুণ। শহর কোলকাতার বাঙালি হিন্দু চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে যে সকল নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন, বলতে গেলে মুসলমান সমাজকে তা স্পর্শই করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাসমূহ রচনা করেছিলেন, রাষ্ট্র সমাজ ইত্যাকার বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন, সেই সময়ে কোলকাতায় মুসলমানেরা বড়োজোর চিৎপুর রোডের সোনাউল্লার মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা গুলে বাকাওলির কিসসা কিংবা আমির হামজার পুঁথি শোনায় মশগুল। অথবা মিলাদ শুনে পীরের দরবারে ধরনা দিয়ে পূণ্য সঞ্চয়ে রত। মিলাদ, উরস, পুঁথিপাঠ, ঘটা করে খানা, মেজবানীর এন্তেজাম এই সবের মধ্যেই বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতিচর্চা সীমাবদ্ধ। সামর্থ্যের সীমাহীন দীনতা এবং আচার -সংস্কারের সহস্র রকম বেড়াজাল মুসলমান সমাজকে কপাট জানালাহীন অচলায়তনে পরিণত করেছে। মুসলমান সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবন-জীবিকার তাড়নায় লাঙ্গলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ওপরের দিকে তাকানোর কোনো সাহস তার নেই। এ রকমের একটা পরিস্থিতিতে মীর মোশাররফ হোসেনের মতো একজন শক্তিধর লেখক যে মুসলমান সমাজ থেকে বেরিয়ে এলেন, তাও কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। মীর মোশাররফ হোসেনের মানস জগত, সাধারণ মুসলমানদের মানস জগতের চাইতে খুব বেশি আলাদা নয়। কিন্তু তাঁর অনুভব করার মন ছিলো, প্রকাশ করার ভাষা তিনি রপ্ত করেছিলেন। আর ইন্দ্রিয়গুলো ছিলো অতি মাত্রায় সজাগ এবং জ্ঞান শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মীরের প্রধান রচনা বিষাদসিন্ধু প্রকৃত প্রস্তাবে শহীদে কারবালা পুঁথিরই আধুনিক রূপায়ণ। সেখানে জীবন জগতের নতুন জিজ্ঞাসা মীর ছাড়ি তুলতে পারেননি। তাঁর অন্যান্য রচনাসমূহে মীর সহজাত প্রকাশ ক্ষমতা বলে সমাজ বাস্তবতার চিত্র গাঢ় রঙে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। মীরের রচনায় সর্বপ্রধান গুণ প্রকাশভঙ্গির স্বতঃস্ফূর্ততা। এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মীর মোশাররফ হোসেনের রচনা পাঠ করে মন্তব্য করেছিলেন, এই লেখকের রচনায় পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ বেশি পাওয়া যায় না। একজন মুসলমান লেখকের একজন হিন্দু লেখকের কাছ থেকে পাওয়া এটাই হলো শ্রেষ্ঠ শিরোপা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শহর কোলকাতায় যে একটি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান, যে শ্রেণী আকাশের নক্ষত্রের মতো অনেক উজ্জ্বল দীপ্তিমান মনীষী পুরুষের জন্ম সম্ভাবিত করেছে, তার মধ্যে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ একেবারেই নেই বললেই চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের সমগ্র জাগরণ ক্ষেত্রটাই ছিলো হিন্দুধর্ম এবং সমাজকেন্দ্রিক। যদিও বাঙালি মুসলমানেরা সারা বাংলা প্রদেশে সংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দুদের চাইতে বেশি না হলেও অন্তত সংখ্যায় অর্ধেক। হিন্দু সমাজের তরুণরা পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাস ছুঁড়ে ফেলছেন। প্রতিভাবলে তরুণেরা খ্রীস্টধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করছেন। তাঁরাই প্রাচীন হিন্দুধর্ম নতুন করে গঠন করেছেন, হিন্দুধর্মের সংস্কারে লাগছেন। তারাই নতুন বিত্তের মালিক হচ্ছেন, তাঁরাই বড়ো বড়ো চাকরিগুলো করতলগত করছেন, তারাই নিলামে জমিদারী খরিদ করছেন। এই ফুটন্ত জাগ্রত হিন্দু সমাজের পাশে মুসলমান সমাজের উপস্থিতি একান্তই দীন, মলিন এবং করুণ। নতুন ভাবাদর্শে বলীয়ান হিন্দু সমাজের প্রতিভাবান মানুষেরা নতুনতরো সমাজের কথা চিন্তা করছেন, কেউ কেউ নাস্তিকতার প্রচার করছেন, কেউ আবার মাতৃভূমির ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সুন্দর চিত্রপট নির্মাণ করছেন। কিন্তু সবকিছু ঘটছে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের পাটাতনে, কোনো কিছু মুসলমান সমাজকে স্পর্শই করছে। এমন কি তাঁরা যখন সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধিতাও করছেন, তাও তাদেরকে পার্শ্ববর্তী সমাজের জনগোষ্ঠীর মাঝে টেনে আনছে না।

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দীতেই আধুনিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু তার বীজতলাটি ছিলো সম্পূর্ণরূপে হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে সংস্থাপিত। বৃহত্তর হিন্দু সমাজের ভেতরে তাঁদের পরিচয় আস্তিক, নাস্তিক, গোঁড়া কিংবা নব্য হিন্দু, ব্রাহ্ম অথবা নবদীক্ষিত খ্রীস্টান যাই হোক না কেনো, এ অংশের বাইরে তাঁদের কর্মকাণ্ডের এবং চিন্তা-চেতনায় পরিধি বিস্তারিত হতে পারেনি। ব্যক্তিগত বিশ্বাসে তাঁরা যতোই সংস্কারমুক্ত এবং উদার হোন না কেনো সামগ্রিক বাঙালি সমাজের প্রেক্ষিতে তাঁদের ভূমিকা অবশ্যই গৌণ একথা স্বীকার করতে হবে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন কি বিবেকানন্দ এই সকল মহীরুহ পুরুষ সকলের উত্থান ঘটেছে হিন্দু বীজতলাটি থেকে। তাঁদের সকলের ক্ষেত্র এক নয়। একজনের সঙ্গে আরেক জনের মিলও খুঁজে পাওয়া যাবে না, তথাপি তাঁদের চিন্তা-চেতনা আবর্তিত হচ্ছে হিন্দু সমাজকে ঘিরেই। এমন কি যখন তাঁরা বিশ্বজনীন মতবাদ প্রচার করেছেন, তখনো তার ভারকেন্দ্রটি ধারণ করে আছে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ পাটাতন। উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্রের লক্ষণ বিচার এভাবে যদি করা হয় আশা করি অন্যায় হবে না। রামমোহন রায় ছিলেন নতুন পুরাতনের সঙ্গে সেতুবন্ধ, সবচাইতে পরমতসহিষ্ণু উদার এবং নিবেদিত প্রাণ, আধুনিক চিন্তাধারার প্রবক্তা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান চারিত্র্যলক্ষণ মানবকল্যাণে সংস্কারক এবং বাংলা ভাষা বিকাশের প্রতি অঙ্গীকার শিক্ষা বিস্তার এসবের মধ্যেই সন্ধান করতে হবে। পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন সনাতন হিন্দুধর্ম চিন্তার সার্থক প্রতিনিধি। মধুসূদন দত্ত সর্বঅর্থে ছিলেন বিদ্রোহী এবং ডিরোজিয়োর যথার্থ উত্তর সাধক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নব জাগ্রত ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুখাতে বইয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কেশব সেন ব্রাহ্ম ধর্মমতের সঙ্গে খ্রীস্টিয় মতের সংশ্লেষ ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস শিল্পের সার্থক স্থপতি এবং আধুনিক হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন কবি এবং মনীষী। তাঁর একক সাধনাবলেই বাংলা ভাষা রাতারাতি প্রাদেশিকতার স্তর অতিক্রম করে বিশ্ব পরিসরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। বিবেকানন্দ হিন্দু সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মর্মবাণী ইউরোপ আমেরিকায় প্রচার করেছেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করতে প্রয়াসী হয়ে উঠেছিলেন। আরো অনেক ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করা যেতো, কিন্তু আমাদের একই উপসংহারে ফিরে আসতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর এই যে হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান তার দুটি প্রান্ত। এক প্রান্ত স্পর্শ করেছে হিন্দুধর্ম এবং সমাজ। আরেক প্রান্ত বিকশিত করে তুলছে আধুনিক সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সংস্কৃতিচিন্তা, সাহিত্যচিন্তা। এ দু'য়ের মধ্যবর্তী কোনো জল অচল কক্ষ না থাকলেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলার প্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিলো। বৃটিশের ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যেই এই আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিলো বলেই তার বিকাশ বিকলাঙ্গ এবং একপেশে হয়েছিলো। মুসলমান সমাজ এই আধুনিকতার প্রতি যেমন মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারেনি, তেমনি তা হিন্দুদের মতো করে গ্রহণও করতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তায় অভিঘাতে আরেকটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস মুসলিম সমাজের ভেতর থেকে স্ফুরিত হয়ে উঠেছিলো। তার ফল এই হয়েছে যে, বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। বাংলা তথা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দু'টো অঞ্চল মিলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সিকি শতাব্দীর অবসান না হতেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী ভাষাভিত্তিক একটি স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের জন্ম সম্ভাবিত করে তোলে। জন্মের পর থেকেই এই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের এক দোলাচল মানসিকতার মধ্য দিয়েই সময় অতিবাহিত করতে হচ্ছে। অনেক সময় তার প্রকোপ এমন মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, রাষ্ট্রের চরিত্রের ওপর তা অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্নে

www.pathagar.com

জাতির মধ্যে দ্বিধা বিভক্তির লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস তথা আত্মপরিচয়ের সঙ্কট তার রাষ্ট্রসত্তার ভবিষ্যত অন্ধকারে আবৃত্ত করে রাখে। বর্তমান বাংলাদেশ এক সময় অবিভক্ত বাংলাদেশের অংশ ছিলো। আবার পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। ব্যক্তির মতো জনগোষ্ঠীও অতীতের টান অগ্রাহ্য করতে পারে না। ভাষাভিত্তিক জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সর্বপ্রধান সংকটসমূহের একটা হলো ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে একটা মেলবন্ধন রচনা করা। অদ্যাবধি বাংলাদেশের কৃত্যবিদ্য শ্রেণীর লোকেরা যে বেশিদূর এগিয়েছেন সে কথা কিছুতেই বলা যাবে না।

ঘোষণা দিলেই একটা রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যায় না। একটি দরিদ্র কৃষিপ্রধান দেশ কিছুতেই এক লাফে সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করতে পারে না। সে একটা সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এই প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আমি, 'শুরু করতে হবে', এই বাক্যটি জোর দিয়ে উচ্চারণ করছি। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের অগ্রগণ্য প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের বিরাট একটি অংশ বাঙালিয়ানার নামে সে সব চিন্তা-চেতনা প্রচার করে আসছেন, তার বেশিরভাগই পশ্চিম বাংলা কোলকাতা কেন্দ্রিক চিন্তাচর্চার চর্বিত চর্বন। মুসলিম প্রধান একটি সমাজে বাঙালিয়ানার প্রচার ঘটাতে হলে বাঙালিয়ানার একটা নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করতে হবে। এই সংজ্ঞা নির্মাণ পদ্ধতিতে দু'টো বিষয় অবশ্যই সমান গুরুত্বে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। প্রথমতঃ ধর্মশাসিত বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মতান্ত্রিক সামন্ত চিন্তার একচ্ছত্র প্রতাপের অবসান ঘটাতে হবে। যে জাড্যতা, যে বদ্ধমত, যে কূর্মবৃত্তি এই সমাজমানসকে সঙ্কুচিত, অসহিষ্ণুতার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার একটি সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া করা না হলে, বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক বিশ্বের সামনে নির্ভয় চিত্তে কখনো দাঁড়াতে পারবে না। বাংলাদেশে মুসলমান ছাড়া আরো নানা সম্প্রদায় রয়েছে। তথাপি মুসলমান সমাজের কথা বললাম একারণে যে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ স্বেচ্ছায় যদি নিজেদের মানস পরিবর্তনের পথটি অনুসরণ না করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর পক্ষে বেশি কিছু করা সম্ভব হবে না। বাঙালি মুসলমানের মানস ভুবনের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে মধ্যযুগ এখনো রাজ্যপাট বিস্তার করে আছে। মধ্যযুগীয় মানস পরিমণ্ডলে আধুনিক যুগের আলো বিকিরণ করা সহজ কাজ নয়। বাঙালি মুসলমান নিজের ভারেই নুইয়ে আছে।

সাম্প্রতিক কালের বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণের দ্বিতীয় শর্তটি হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির যে পাটাতনটি সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে একটি গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড আবিষ্কার করা। বাঙালি সমাজের নানামুখী জাগরণের সমস্ত বীজতলাটাই ছিলো হিন্দু সমাজের অধিকারে। বাঙালি সংস্কৃতিতে এই শ্রেণীটি অনেক উৎকৃষ্ট কিছু সংযোজন করেছেন, কিন্তু পাশাপাশি তাঁদের সম্প্রদায়গত প্রবণতাসমূহও ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতি এমন এক ধরনের মোহমুগ্ধতা ক্রিয়াশীল, সেটাকে অনেকটা অন্ধত্বের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই অসঙ্গত অতীতমুখীতা তাঁদেরকে বর্তমানের প্রতি সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য বিমুখ করে রেখেছে। মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে অনেকগুলো সংস্কার এবং সামাজিক আন্দোলনের উত্থিত হওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে, সমাজ সংগঠনের মধ্যে মানব সম্পর্কের ক্ষেত্র পুরোনো মূল্যচিন্তার স্তরে একগুচ্ছ নতুন মূল্যচিন্তা সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে না পারলে বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করা কখনো সম্ভব হবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের প্রেক্ষিতটা ভেঙ্গে ফেলে বাঙালিত্বের সম্পূর্ণ একটা নতুন প্রেক্ষিত নির্মাণ করা প্রয়োজন। ইতিহাস বাংলাদেশের মানুষদের হাতে বাঙালিত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। এই প্রস্তাবিত নতুন সাংস্কৃতিক পাটাতন সমস্ত বাঙালি জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সুস্থ বিনিময়ের পথ অনেকখানিই সম্প্রসারিত করবে।

www.pathagar.com

লাইভ স্টক

ওবায়দুল হক সরকার

১৯০৫ সালের আগে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানরা 'লাইভ স্টক' বা গৃহপালিত পশু ছিলেন। ভারতের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ডঃ সুমিত সরকার এই নির্মম সত্যটি স্বীকার করেছেন। তিনি অবশ্য কিশোরগঞ্জের (তখন ময়মনসিংহ জেলার মহকুমা) জমিদার বাড়ির সন্তান শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে এ তথ্য তুলে ধরেছেন। দিল্লীর বিকাশ পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত "দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ" গ্রন্থে ডঃ সরকার লিখেছেন ঃ

"Recalling his boyhood days at Kishoreganj, Nirad C. Choudhury has tried to sum up the pre-1905 bhadralok Hindu attitude-towards the Muslims as a compound of four modes of feeings ..... 'Our fourht feeling was mixed concern and contempt for the Muslim peasant, whom we saw in the same hight as we saw our low cost Hindu tenants,or in other word as our livestock.' The judgement is harshly worded but not perhaps fundamentally unjust."

— Dr. Sumit Sarkar, the Swadeshi Movement in Bangal : Vikas Publishing House ; Pvt Ltd, New Delhi, 1973 p 412.

অধ্যাপক ডঃ সুমিত সরকারের স্বীকৃতি ঃ নীরদ বাবুর উক্তি মুসলমান প্রজাদের আমরা আমাদের লাইভ স্টক বা গৃহপালিত পশু মনে করতাম- কথাটা একটু কড়া হয়ে গেলেও মূলত মিথ্যা নয়। বিবেকবান হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সত্যকে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার "Glimpses of World History" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

"ভারতের অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি, এরা ছিল গরীব প্রজা বা অতি ক্ষুদ্র-ভূস্বামী। জমিদার সাধারণত হত হিন্দু, গ্রামের বানিয়াও তাই। এই বানিয়াই হচ্ছে টাকা ধার দেবার মহাজন আর গ্রামের মুদি। কাজেই জমিদার এবং বানিয়া প্রজার ঘাড়ে চেপে বসে তার রক্ত শুষে নেবার সুযোগ পেত। সুযোগের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারও করে নিতে ছাড়ত না। এই কথাটা মনে রাখা দরকার। কেননা, হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ তার মূল রয়েছে এইখানে।"

– জওহরলাল নেহরু ঃ বিশ্ব ইতিহাস প্রথম (অনুবাদক– শ্রী সুবোধ চন্দ্র মজুমদার) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড– কলিকাতা-৯, পৃঃ ৩৮১।

নবাব সলিমুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই "গৃহপালিত পশুদের" হিন্দু জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের রক্ত শোষণের হাত থেকে উদ্ধার কল্পে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের নিকট বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব দিলেন ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম মিলে পৃথক প্রদেশ করা হোক। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয় ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর, তবে তা কার্যকর করা হয় ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।

বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। মুসলমানরা মানবেতর জীবনের অভিশাপ কাটিয়ে মানবোচিত জীবনের সন্ধান পেল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। পাকিস্তান হিস্‌টোরিকেল সোসাইটির বোর্ড অব এডিটরস সম্পাদিত "এ হিস্ট্রি অব দি ফ্রীডম মুভমেন্ট" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"The Partition came as a blessing to the Muslims of Eastern Bengal and Assam ; their needs and requirements now received due consideration of the government. The close contact between the Government and the people, so essential for a healthy administration and for general well-being had hitherto been backing under the frame work of the old Bengal administration ; this was now established. The lieutenant-Governor, stationed at Dacca had better opportunities of having direct knowledge of social, economic and educational problems, and of taking adequate steps towards their solution. The new province began to make progress in various spheres of life. Dacca as the capital city started regaining its past glory, construction work on a fairly large scale had begun; a survey of land was undertaken and records of landed rights made to check land disputes and litigation which had hitherto been often accompanied with murder ; the volume of trade and commercial activities increased several times and their were clear indications of the Muslims taking interest in them. In the field of education this progress was quite marked. Whereas the total in qease in the number of pupils of all community registered an increase by

www.pathagar.com

6.8 per cent. The number of Muslim pupils at different stages increased from 425, 840 in 1906-07 to 575, 667 in 1911-12 and their proportion to total number from 52.2. to 53.8 percent. The rate of increase during the five years was as high as 35.1 percent. There is one more significant point to be noticed ; the returns of these years reveal that the increase in the number was much more marked in Government than in private institutions and that over 92 percent of the Muslims under instruction were attending schools of the former class Obviously the Muslims had taken full advantage of the opportunities offered to them by the Government.

Thus within little over five years the Partition had proved to be beneficial to the Muslims of the new Province. They had taken the road to progress and prosperity. But misfortune was soon to befall the lot of the community. During all these years the Congress and the members of the Hindu community had been carrying of their agitation for the annulment of partition."

— The Board of Editors : Pakistan Historical Society : A History of the Freedom Movement : Vol III, Karachi : 1961 pp. 25-26.

বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের জন্য পৌষ মাস আর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য সর্বনাশ হয়ে দেখা দিল। আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জনাব কামরুদ্দীন আহমদ তার "এ সোসিও পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল এন্ড দি বার্থ অব বাংলাদেশ" গ্রন্থে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করার কারণ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"The caste Hindus of Bengal launched a mass movement because their very existence was at stake. The East India Company and later on her Majesty's Goverment made them the trading community the commercial magnets. The administrators, land lords and the leading intelligentia thus allowing them to create vested interest in the capital city of Calcutta. The British rajereated the by draheaded monster and they could not but pay for it. The cast Hindus had their `Zomindary' in East Bengal but they lived in Calcutta. The writers, authors, journalists who orginally came from the districts of East Bengal could not leave Calcutta though they also depended on their income from East Bengal. The lawyers of the Calcutta high court had to depend on their clients in East Bengal. The Government servants in the secretariate mostly belonged to East Bengal.

www.pathagar.com

— Kamrudding Ahmed : A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh, pp. 2-3.

উপরোক্ত বক্তব্যে দেখা যাচ্ছে, বর্ণহিন্দুদের জমিদারী ছিল পূর্ব বঙ্গে, কিন্তু তারা বাস করতেন কলকাতায়। লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সবাই পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলার, কিন্তু থাকতেন কোলকাতায়। তাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল পূর্ব বঙ্গ। কোলকাতার হাইকোর্টের আইনজীবীদের নির্ভর করতে হতো পূর্ব বঙ্গের মক্কেলদের উপর। সচিবালয়ের অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীর বাড়ি পূর্ব বঙ্গে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলো। তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের চেয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি বেশি জোর দিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম" প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"১৯০৭ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা "অনুশীলন" সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে আর এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজবিরোধী ছিল না। তারা মুসলিম বিরোধীও ছিল।"

– অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলাম ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় দিবস ১৯৭৪, পৃঃ ৩৪৫।

আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতা ও বর্তমান সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুর রাজ্জাক একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ঃ

"আমরা ঠিক করলাম আমাদের বেস হবে ছাত্র লীগ। এরপর একটা বই প্রকাশ করা হয়। নাম বিদ্রোহী বাংলা। এ ব্যাপারে আমাদের গুরু ছিলেন কমরুদ্দিন আহমেদ। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। তিনি আমাদের খুব উৎসাহ দিলেন। তিনি তখন সোসাল হিস্ট্রী অব ইস্ট বেঙ্গল বইটা লেখেন। সেই বইটা আমাদের চেতনা বিকশিত করতে সাহায্য করে।"

প্রচ্ছদ কাহিনী ঃ সাপ্তাহিক 'মেঘনা' ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭।

আওয়ামী লীগের গুরু (জনাব আবদুর রাজ্জাকের মতে) জনাব কামরুদ্দীন আহমদ "পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি" শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অভাব ছিল এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দুর্বলতা। কেবলমাত্র চাঁদার উপর নির্ভর করে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব ছিল না। কাজেই অর্থ সংগ্রহের জন্য এদের অবলম্বন করতে হল ডাকাতির পথ। নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অনুশীলন দল প্রায় তিরিশ বছর ধরে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। .....

১৯০৬ সালে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় দল স্থাপিত হয় কলকাতায়। অধ্যাপক অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর ভাই রাবীন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বে। এর নাম হলো 'যুগান্তর' দল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।"

– কামরুদ্দীন আহমদ ঃ পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি ঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ৫৪৩/এইচ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ; ঢাকা-৫, পৃঃ ৫ ও ৬।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রফিকুল ইসলামের মন্তব্য "এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজ-বিরোধী ছিল না। তারা মুসলিমবিরোধীও ছিল"– এর কণ্ঠিপাথরে কামরুদ্দীন সাহেবের দাবী "কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন" যাচাই করলে রবীন্দ্র চরিত্র

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিমবিরোধী ছিলেন বলে মুসলমান প্রধান শিলাইদহের বিশাল জমিদারিতে কোথাও কোন বিদ্যালয় স্থাপন করেননি, অথচ হিন্দুপ্রধান পশ্চিম বঙ্গের বোলপুর শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। পূর্ব বঙ্গের জমিদারীর আয় পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়নে ব্যয় করলেন। রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল পূর্ব বঙ্গের "লাইভ স্টক"রা শিক্ষার পরশ পেলে মানুষ হয়ে উঠবে। তাই কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূর্ব বঙ্গে নেই।

বঙ্গভঙ্গের ফলে বিশ্ব কবির বিশাল জমিদারী হাতছাড়া হয় দেখে রবীন্দ্রনাথ আর বিশ্বকবি না হয়ে শুধু হিন্দুর কবি হয়ে রচনা করলেন "সোনার বাংলা"। উল্লেখ্য, 'সোনার বাংলা' যে মাতৃবাদের (মা কালী) ওপর রচিত মুসলমান বিশ্বাস করে এই আকাশ, বাতাস সব একমাত্র এক আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ নারী বা পুরুষ কোনটাই নন। 'সোনার বাংলা' বঙ্গভঙ্গ রদ করলো ; আবার যুক্ত বাংলা হলো ; ঢাকা তার রাজধানী রইলো না, মুসলমানের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হলো, তারা আবার 'লাইভ স্টক' হয়ে পড়লো। ১৯৪৭ সালে হিন্দু নেতৃবৃন্দের ইচ্ছায় এবার আবার বঙ্গভঙ্গ হলো। পূর্ব বঙ্গ গেল পাকিস্তানে আর পশ্চিম বঙ্গ ভারতে। ১৯৭১ সালে পূর্ব বঙ্গ পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ করলো, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ ভারতে রয়ে গেল। যুক্ত বঙ্গ আর হলো না, তবু অর্ধ বঙ্গ মানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করা হলো "সোনার বাংলা"।

জনাব কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, সন্ত্রাসবাদী দল অর্থ-সংগ্রহের জন্য ডাকাতির পথ অবলম্বন করলেন। সূর্য সেনের সন্ত্রাসী দল ডাকাতি করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস "জিন্না হল" মুছে নাম করা হলো "সূর্য সেন হল"। কোথায় ইতিহাস আর কি হলো আমাদের আচরণ। বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি কি দাঁড়ালো?

আমরা খুব জাঁকজমকের সাথে সেই সব মুসলিম বিদ্বেষীদের জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী পালন করি; কিন্তু যাদের অবদানে আমরা তাদের নাম শুনলে আঁৎকে উঠি। হাবে-ভাবে মনে হয়, বাইরে আমাদের ভোল পাল্টালেও, ভিতরে আমরা আজও সেই "লাইভ স্টক"।

www.pathagar.com

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গ ও আজকের বাংলাদেশ

আরিফুল হক

যদি বলি বঙ্গভঙ্গ বাংলাদেশের সূচনাকাল। জাতীয়তাবাদের অনুবন্ধ। পূর্ব বঙ্গের মজলুম মুসলমানদের নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ। যদি বলি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ না হলে, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হতো না, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত না হলে ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ হতো না, দেশ বিভাগ না হলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হতো না। তাহলে কি ভুল বলা হবে? আসলেই বঙ্গভঙ্গ আমাদের ইতিহাসের মস্তবড় একটা বাঁক। যে বাঁকে দাঁড়িয়ে আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে স্বচ্ছ, অনাবিলভাবে দেখা যেতে পারে। ভারতের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রী বিমলানন্দ শাসমল তাঁর "ভারত কি করে ভাগ হলো" পুস্তকে সত্যই লিখেছেন, "১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে সৃষ্টি করেছিল দু'টি জাতীয়তাবাদ, একটি হিন্দু এবং অপরটি মুসলমান।"

জাতীয়তাবাদের ভিন্নতার ফলেই উপমহাদেশের বিভক্ত হলেছিল, অভ্যুদয় হয়েছিল স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। ইতিহাস চর্চাটা আজ একাডেমিসিয়ানদের হাত থেকে মতলববাজ্ সুবিধাভোগীদের হাতে চলে যাওয়ার ফলে শুধু ইতিহাস বিকৃতিই ঘটছে না, ইতিহাস কল্পকথায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে শুনতে হচ্ছে 'আমরা ক্ষুধিরামের সন্তান', 'প্রীতিলতার সন্তান' "সূর্য্য সেনের সংগ্রামের ধারাবাহিকতাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা" ইত্যাদি আজগুবি কথা। এই আজগুবি কথামালার অন্ধকার থেকে সত্যাশ্রয়ী ইতিহাসকে উদ্ধার করে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা আজ একান্ত প্রয়োজন।

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর করা হলেও এর সূচনা বা পটভূমি রচিত হয়েছিল অনেক আগে। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্ট যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বেঙ্গল ফোর্ট

www.pathagar.com

উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর এলাকা ছিল আসাম, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার এবং ছোটনাগপুর অঞ্চল নিয়ে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর সীমা ছিল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার, ৭৮৬ বর্গমাইল। ১৮৬৫ সালে উড়িষ্যায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার ৬টি জেলা, বিহারের অংশবিশেষ এবং উত্তর বঙ্গের প্রায় ২ লাখ ৬৫ হাজার লোক মারা যায়। তৎকালীন লেঃ গভর্নর স্যার সি বেডন এই প্রচুর লোকক্ষয়ের কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বলেন যে, বিশালায়তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বল্পতা হেতু তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারেননি। তাছাড়া গভর্নর জেনারেলের উপর অত্যধিক কাজের চাপ থাকায় এ ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়াও সম্ভব হয়নি।

সেই সময়ের আরও কিছু ঘটনা ইংরেজ শাসকদের বিব্রত করে তোলে। যেমনি ১৮৬৭-৬৮ সালে নাগা উপজাতিরা আসামের শিবসাগর জেলায় কয়েক দফা হামলা চালায়। ১৮৭০-৭১ সালে নাগা বিদ্রোহীরা ত্রিপুরা রাজার এলাকা ছাড়াও সিলেট জেলায় আক্রমণ চালায়। একই বছরে নাগাদের আক্রমণে আসামের একটা চা বাগান ধ্বংস হয় এবং ইংরেজ প্ল্যান্টার মিঃ উইনচেস্টার বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন ও তাঁর অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যা অপহৃতা হয়। এ রকম এক পরিস্থিতিতে প্রশাসন কাজের সুবিধা এবং এলাকায় শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১২ ই অক্টোবর প্রথমবারের মত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে ১০টি জেলাকে আলাদা করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে পৃথক আসাম প্রদেশ গঠন করা হয়। জেলাগুলো ছিল কামরূপ, দারাং, নওগাঁ, শিবসাগর, লক্ষীপুর, গারোহিল্‌স, খাসিয়া এন্ড জয়ন্তিয়া হিল্‌স, নাগা হিল্‌স, কাছাড় এবং গোয়ালপাড়া। এই বছরই এক সরকারি নির্দেশ বলে সিলেট জেলাকেও আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপরও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আয়তন থেকে যায় ২ লাখ ৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ, যা কি-না ইউরোপের স্পেন দেশের সমান। এরপর লুসাই পার্বত্য অঞ্চলকেও আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যার ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আয়তন দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল।

এই সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর পৌরসভার সংখ্যা ছিল ১৫৮টি। যখন ইংরেজশাসিত অপর প্রদেশ মাদ্রাজের পৌরসভার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬১টি। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সচিবালয়ে যে সব চিঠিপত্র রিসিভ এবং ইস্যু করা হয়েছিল তার সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ১২টি। তাছাড়া এই প্রদেশের লোকসংখ্যাও ছিল ইংরেজ শাসিত অন্যান্য প্রদেশগুলোর থেকে অনেক বেশি। যেমন, মাদ্রাজের লোকসংখ্যা যখন সাড়ে ৪২ মিলিয়ন, ইউপির ৪৮ মিলিয়ন, বেঙ্গল প্রভিন্সের লোকসংখ্যা তখন ৭৮ মিলিয়ন। এই অবস্থায় ১৯০২ সালের ২৪ শে মে গভর্নর জেনারেল জর্জ ন্যাথানিয়েল কার্জন লন্ডনের ভারত সচিব লর্ড হ্যামিলটনের কাছে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার স্বার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে ভাগ করার যুক্তি দেখিয়ে এক পত্র পাঠান। ঐ পত্রে তিনি উল্লেখ করেন যে, এখানে অবস্থা এমনই জটিল যে, বেঙ্গলের লেঃ গভর্নর সমস্ত বছর ধরে সফর করলেও তার এলাকার একাংশের বেশি সফর করতে পারবেন না। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেও পাঁচ বছরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কটক, রাচী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো একবারের বেশি সফর করতে সমর্থ হবেন না। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের খসড়া তৈরি করেন। বিলাতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পর ১৯০৫ সালের জুন মাসে ভারত সচিব সেটি অনুমোদন করেন। ১৯০৫ সালের ৫ ই জুলাই বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব প্রচারিত হয়, ১লা সেপ্টেম্বর প্রদেশ গঠনের সরকারি ঘোষণা দেয়া হয়। লর্ড কাইন নতুন প্রদেশের নাম দিয়েছিলেন উত্তর-পূর্ব

www.pathagar.com

প্রদেশ। ১৯০৫ সালের ১১ ই অক্টোবর ভারত সচিব নতুন প্রদেশের নাম 'পূর্ব বাংলা আসাম' রাখার পরামর্শ দিয়ে তারবার্তা পাঠান এবং প্রবল বাধা ও উত্তেজনার মধ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে 'পূর্ব বঙ্গ আসাম' প্রদেশ জন্মলাভ করে। যার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন আসামের চীফ কমিশনার বামফিল্ড ফুলার। ঢাকার ফুলার রোড সড়কটি আজও তার স্মৃতি বহন করে চলেছে। প্রায় পৌনে দু'শ বছর পর ঢাকা আবার পূর্ব বঙ্গ আসাম প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে এবং চট্টগ্রাম হয় প্রধান বন্দর নগরী।

নতুন প্রদেশের সীমানা

অবিভক্ত বাংলার ১৪টি জেলা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের প্রায় সব ক'টি জেলা ও দু'টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে নতুন প্রদেশের সীমানা নির্ধারিত হয়। যেমন–চট্টগ্রাম, নোয়াখালী-বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, মোমেনশাহী, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, মালদহ, জলপাইগুঁড়ি, ত্রিপুরা, পার্বত্য ত্রিপুরা ও কুচবিহার। এই নতুন প্রদেশের আয়তন দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৬ হাজার ৫৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ এবং অমুসলমানদের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ২০ লক্ষ বেশি।

অপরদিকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে থেকে গেল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুরের ৫টি হিন্দি রাজ্য ছাড়া বাকি অংশ, সম্বলপুর ও উড়িষ্যার ৫টি রাজ্য। বঙ্গ বিভাগের পরও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষ। যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ।

বঙ্গভঙ্গের পূর্বে পূর্ব বাংলা-আসাম প্রদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব বাংলা-আসাম প্রদেশের সীমানা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল যে, সেখানে কোন হিন্দীভাষী অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। চা, পাট ছাড়াও বন ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও এই প্রদেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা ছিল সীমাহীন। ইংরেজদের আশীর্বাদপুষ্ট হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারে এ দেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষা-ভুষারা দীর্ঘদিন থেকেই শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত হয়ে আসছিল। ভারতীয় গবেষক অধ্যাপক অমলেন্দু দে তাঁর "বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ" বইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন– "(ফরিদপুর জেলার সিকদার ও ঘোষ পরিবারটি)" গো-বধ বন্ধ করার এবং কালী পূজা, দূর্গাপূজার কর আদায়ের চেষ্টা করেন"।

তিনি পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণ দেব রায়ের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, তিনি জমিদারিতে আইন জারি করেছিলেন যে,

> "যাহারা দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাঁটিবে তাহাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে। মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা, প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। গো-হত্যা করিলে হত্যাকারীর হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গো-হত্যা করিতে না পারে"।

www.pathagar.com

এত গেল সামাজিক নিপীড়নের চিত্র।

শিক্ষা এবং সরকারী চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন– "১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের দুয়ার মুসলমান ছাত্রদের জন্য বন্ধ ছিল"। অথচ ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে সরকারি কাজে ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণীটিই একচেটিয়াভাবে সরকারি চাকরির সুযোগ লাভ করে। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে সরকারি কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ডেপুটি কমিশনার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদগুলো ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে সিদ্ধান্ত করা হয় যে মুন্সেফ, দারগা ও উকিলের পদের অর্ধেক তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স অথবা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে সমস্ত আইন পরীক্ষা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে হয় ঐ বছরই এক সরকারি সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হয় যে, কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষায় সফল হতে পারলেই ভালো সরকারি পদ লাভ করা সম্ভব হবে। এরকম পরিস্থিতিতে মুসলমানদের অদৃষ্টে বেয়ারা, পিওন, দফতরী, ড্রাইভার, কোতোয়াল, লস্করের চাকরি ছাড়া ভালো সরকারি চাকরি না জোটাই স্বাভাবিক। কারণ আগে থেকেই তাদের ইংরেজী শিক্ষা থেকে দূরে রাখা হয়েছিল।

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজী শিক্ষার জন্য হিন্দু মহল্লায় প্রথম 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় (পরবর্তীকালের কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ)। সেখানে বর্ণ হিন্দু ছাড়া অন্যান্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয় তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছিল ২৪৪ জন, তাদের সবাই উচ্চবর্ণের হিন্দু। এভাবেই ইংরেজ ও বর্ণহিন্দুদের চক্রান্তে মুসলমানরা শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ হিসেবে লর্ড এলনবারের মন্তব্য ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে,

> "পরাশক্তি ইংরেজের বশ্যতা যত সহজে এবং আগ্রহের সাথে বাঙালী হিন্দুরা মেনে নিয়েছিল, এ দেশের সন্তান হিসেবে বাঙালী মুসলমানরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং প্রায়শঃই বিদ্রোহের রক্তাক্ত পথ অনুসরণ করেছিল। এরই ফল হিসেবে ইংরেজ শাসন আমলে বাঙালী মুসলমানদের বিরাট কাফফারা দিতে হল।.... বাঙালী মুসলমানরা প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো থেকে বিতাড়িত হল"। (কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী ঃ এম আর আখতার মুকুল)

১৯০৩. খ্রীস্টাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'নবনূর' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগেই হিন্দু প্রাধান্য বিদ্যমান। যখন সরকারি বৃত্তি বন্টনের দায়িত্ব হিন্দুদের উপর অর্পিত হয় তখন তারা প্রতিভাসম্পন্ন মুসলমান ছাত্রদের বঞ্চিত করে সেই সব বৃত্তি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে বন্টন করেন। সুতরাং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপন মুসলমানদের অগ্রগতির পথে অন্তরায়"। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য বলা যেতে পারে যে, ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত ৬৯ বছরে ফরিদপুরের মুজিবুর রহমান ছাড়া বাঙালী মুসলমান পরিবারের কোন সন্তান আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আর একজন আইসিএস, গাইবান্ধার নূরুন্নবী চৌধুরী ছিলেন ওয়ার আইসিএস।

প্রকৃতপক্ষেই বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে, জমিদার মানেই

www.pathagar.com

হিন্দু, খাতক মানেই মুসলমান। ধনী গৃহস্থ হিন্দু, ক্ষেতমজুর মুসলমান। উকিল হিন্দু, মক্কেল মুসলমান। ডাক্তার হিন্দু, রোগী মুসলমান। ব্যবসায়ী হিন্দু, মুটে-মিস্তি মুসলমান। সরকারি অফিসার হিন্দু, ঝাড়ুদার-চৌকিদার-পিয়ন-চাপরাশি মুসলমান। মানব জাতির ইতিহাসে এমন ঘটনা হয়তো বিরল যে, দুটো সম্প্রদায় শতাব্দীব্যাপী পাশাপাশি বাস করেছে অথচ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি চালিয়েছে নির্যাতন এবং সম্প্রদায়টি হয়েছে নিগৃহীত, নির্যাতিত।

এই রকম পরিস্থিতিতে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ায় বঙ্গের মুসলমানরা সন্তুষ্ট হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, এর ফলে তাদের দুর্গতি লাঘব হবে, ভাগ্য ফিরাবার সুযোগ আসবে, ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হওয়ায় রাস্তাঘাট, কোট-কাচারী, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ-সুবিধা বাড়বে। কলকাতার শোষণ থেকে তারা কিছুটা মুক্ত হবেন।

বঙ্গ ভঙ্গের বিরোধিতা

কিন্তু বাধ সাধলেন সম্মিলিত বঙ্গের সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু বর্ণহিন্দু জমিদার বাবু সম্প্রদায়। তারা উদ্বিগ্ন হলেন এই ভেবে যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম প্রজা-প্রধান পূর্ব বঙ্গের জমিদারি প্রথা বিলোপ হয়ে যেতে পারে।

আইনজীবীরা ভাবলেন, ব্যবস্থাপক সভা, রাজস্ব বোর্ড, কোর্ট-কাচারী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ায় মুসলমান মক্কেল হাতছাড়া হয়ে যাবে।

মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা ভাবলেন, কলকাতা বন্দরের পরিবর্তে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর চালু হলে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করতে হবে। তাতে ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে।

এছাড়াও বর্ণহিন্দুরা ভাবলেন ধর্মগতভাবে তারা সংখ্যালঘু জনসমষ্টিতে পরিণত হওয়ায় নতুন প্রদেশে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।

পশ্চিম বঙ্গের গবেষক সুমিত সরকার তাঁর "দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল" বইতে সেই আমলের ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিসলের ১৯০৪ সালের ৭ ই ফেব্রুয়ারীর একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করে তৎকালীন বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি লেখেন–

"বিক্রমপুরের বাবুগণ এই ভেবে সন্ত্রস্ত হবেন যে, সরকারী চাকরিতে তাঁদের এত দিনকার আধিপত্য বুঝি বিলুপ্ত হল, প্রস্তাবিত ভাগরেখার দু' পারেই যে সব জমিদারের ভূসম্পত্তি আছে তাঁদের দু' সেট করে প্রতিনিধি ও উকিল নিয়োগ করতে হবে। ভাগ্যকুলের রায়েরা– কলকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে যাঁদের কাঁচা পাট ও চালের বিরাট ব্যবসা ভীত হয়েছে এজন্য যে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প বাণিজ্য পথ খোলা হবে, কলকাতার আইন ব্যবসায়ীদের ভয় শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের এক্তিয়ার অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে (পূর্ব বঙ্গ-আসাম) অবস্থান করতে হলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদগণ ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। আর কংগ্রেস রাজনীতিতে কলকাতা এবং বাংলার (বর্ণ হিন্দুদের) ক্ষমতা এবং আধিপত্য নিশ্চয়ই এক চরম সুপরিকল্পিত আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে"।

জনাব এম, আর, আখতার মুকুল তাঁর 'কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী' বইতে লিখেছেন–

"১৯০৫ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের জন্য সবচেয়ে বেশি আতংকগ্রস্ত হয়েছিল কলকাতায়

www.pathagar.com

বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় বর্ণহিন্দু জমিদার গোষ্ঠী। যদিও এঁরা আদতে অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর পদলেহী ছিলেন, তবুও নিজেদের স্বার্থহানির ভয়ে একমাত্র বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারটি এঁরা মেনে নিতে পারেনি।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে জমিদারদের চাঁদা

১৯০৬ সালের বেঙ্গল পুলিশ রিপোর্টের বরাত দিয়ে জনাব এম, আর, আখতার মুকুল তার উক্ত বইতে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য জমিদার বাবুরা যে বিপুল অর্থ চাঁদা দিয়েছিলেন তার তালিকা দিয়েছেন। সেখান থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল।

১। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী – ১০ হাজার টাকা, ২। মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী– ৫ হাজার টাকা, ৩। মহারাজা টি পালিত ৫ হাজার টাকা, ৪। মহারাজা ড্যানকী রায়– ৫৪ হাজার টাকা, ৫। গজেন্দ্র নাথ ঠাকুর-৫ হাজার টাকা, ৬। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা)–১ হাজার টাকা, ৭। নাটোরের মহারাজা–১ হাজার টাকা এবং আরও অনেকে।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজনীতিবিদ বুদ্ধিজীবীদের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া

ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক সরল চট্টোপাধ্যায় তাঁর "ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ" গ্রন্থে লিখেছেন–

"বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য সভা-সমিতি সারা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৪-এর জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৫০০ সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৯০৫ পর্যন্ত ছোট-বড় এবং অতি বিশাল প্রায় দু'হাজার বঙ্গভঙ্গবিরোধী সভায় বঙ্গের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন"।

শ্রী সরল চট্টোপাধ্যায় উক্ত বইতে আরো লিখেছেন–

"১৯০৫-এর অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবে বলে সরকার ঘোষণা করে। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান অনুযায়ী এই দিনকে 'রাখী বন্ধন' দিবসরূপে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ১৬ ই অক্টোবর প্রতিবছর 'রাখী বন্ধন' উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বরীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই দিন শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং পথের দু'ধারে সবার হাতে রাখী পরিয়ে দেয়া হয়। রাখী বন্ধন উৎসব বঙ্গবিভাগবিরোধী রাজনৈতিক উৎসবে পরিণত হয়। শুধু তা-ই নয়, ১৯০৫-এর ২৫ আগস্ট বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে টাউন হলে (কলকাতা) এক বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'অবস্থা ব্যবস্থা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।"

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৩ সালে তাঁর বিখ্যাত গান "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" (যেটি বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত) লিখে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করেন।

১৯০৫ সালের ২০ শে জুলাই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দিনাজপুরের এক বিরাট জনসভায় মহারাজা গিরিজানাম এক বছরব্যাপী শোক পালনের এবং জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সমস্ত সদস্য পদত্যাগ করার কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশ পুত্তলিকা দাহ করা হয়। অশ্বিনী কুমার স্বদেশ বান্ধব সমিতির ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনকে গণ-সংগ্রামে পরিণত করেন। কারণ, কবি মুকুন্দ দাস বরিশালের কালি মন্দিরকে কেন্দ্র করে যাত্রা গানের মাধ্যমে

www.pathagar.com

অশ্বিনী কুমারকে সহযোগিতা দান করেন।

কিছু দিনের মধ্যেই একশ্রেণীর হিন্দু নেতৃবৃন্দ অনুভব করলেন যে, শুধু বিক্ষোভ, সভা-সমিতি এবং প্রতিবাদের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের টনক নড়ানো যাবে না, তখন তারা প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথ অনুসরণ করলেন। শুরু হল বিলেতী পণ্য বয়কট, জ্বালাও–পোড়াও আন্দোলন এবং দোকানে দোকানে পিকেটিং ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আন্দোলন।

চরমপন্থী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন অতি দ্রুত নমরপন্থীদের হাত থেকে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের কব্জায় চলে যায়। ১৯০৬ সালে এসে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আশীর্বাদপুষ্ট 'অনুশীলন সমিতি' পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত হয়। এই সন্ত্রাসবাদীদের স্বদেশী বলা হলেও তারা ছিলেন চরম সাম্প্রদায়িক।

শ্রী সুপ্রকাশ রায় তাঁর "ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস" বইতে লিখেছেন যে, অনুশীলন দলের উচ্চ স্তরের নেতা পি মিত্র (ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র) এবং পুলিন দাস দলের সদস্যদের যেভাবে প্রতিজ্ঞা করাতেন তা হল–

"নির্জন সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দিরে যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। প্রত্যেকেই দীক্ষান্তে কালী মূর্তিতে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রণাম করিত"। শ্রী সুপ্রকাশ রায় আরও লিখেছেন– "প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞার শিরোনামে লেখা ছিল– "ওঁ বন্দে মাতরম।"

তারপর এই প্রতিজ্ঞাপত্রের 'ঙ'র ১ নম্বরে লেখা ছিল "স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসেবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতিলব্ধ অর্থের একটি কপর্দকও আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া সমুদয় অর্থ আমাদের পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিব। আমাদের প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া তিনি যাহা আমাদের দিবেন আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব"।

এখানে লক্ষণীয় যে, বিপ্লবীরা বাড়ি থেকে টাকা আনতেন না, চাঁদা দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল না। বরং ডাকাতির ফান্ড থেকে বাড়িতে অর্থাৎ সংসারে টাকা দেবারও ব্যবস্থা ছিল। যাই হোক, শ্রী সুপ্রকাশ রায় 'অনুশীলন' গোষ্ঠীর অসংখ্য ডাকাতির তালিকা তাঁর উক্ত বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান ও সাধারণ মানুষ।

যেমন তিনি লিখেছেন– "১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে ডাকাতি শুরু হয়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে এক বিধবা রমণীর বাড়িতে ডাকাতি করিতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী দল জানিতে পারে ঐ গ্রামে একজন দারোগা আছেন। তাহারা ভয় পাইয়া পালাইয়া যান।"

নারায়ণগঞ্জে ১৯০৬-এ ডাকাতি করা একটা লোহার আইরন সেফ নিয়ে নৌকায় চাপিয়ে সন্ত্রাসবাদী দল পালাতে চেষ্টা করলে নৌকা ডুবে যায়। সামান্য কিছু টাকা লাভ হয় কিন্তু গৃহস্থের সর্বনাশ হয়। ১৯০৭-এ ঢাকায় এক পাটের অফিসে ডাকাতি করতে গিয়ে দোনালা বন্দুকটি লাভ হয়। ১৯০৯-এ রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে ট্রেন ডাকাতি করে ২৩ হাজার টাকা 'লুণ্ঠন' করা হয়। ১৯১১-৫৪ জানুয়ারি 'অনুশীলন' দল এক বাড়ি থেকে ৫৫৫০ টাকা 'লুণ্ঠন করে'। ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় উক্ত বইতে বিপ্লবী গোষ্ঠীর ডাকাতির এক বিশাল তালিকা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, সেই তালিকায় কোন জমিদার শ্রেণী বা ইংরেজ ধনাঢ্য ব্যক্তির নাম নেই।

সেই আমলে ঢাকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অনুশীলন এবং কলকাতার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'যুগান্তর

www.pathagar.com

দল ছাড়া আরও বেশ কিছু সংগঠন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বজায় রাখে। ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে তারা নবগঠিত পূর্ব বঙ্গ-আসাম প্রদেশের লেঃ গভর্নর বামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর স্যার ফ্রেজারকে বোমার আঘাতে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী ব্যর্থ হন। পরে তাদের ফাঁসি হয়।

যা-ই হোক, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এমনভাবে পরিচালিত হয় যে, এই আন্দোলন সম্পূর্ণ মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে রূপ নেয়।

পশ্চিমবঙ্গের লেখক শ্রী বিমলানন্দ শাসনমল তাঁর 'ভারত কি করে ভাগ হল' বইতে লিখেছেন– "বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ছিল সন্দেহাতীতভাবে মুসলমানবিরোধী এবং গভীরভাবে মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। এই আন্দোলনের তাগিদে যে সকল সন্ত্রাসবাদী বা বিপ্লববাদী নেতা কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন তারা সকলেই ছিলেন গভীরভাবে মুসলমানবিরোধী"।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম' বইতে লিখেছেন– "বিপ্লববাদীরা যে শ্রেণী থেকেই আসুন না কেন, প্রত্যেকেই ছিলেন মুসলমানবিরোধী"। তিনি আরও লিখেছেন– "বিপ্লবীরা মনে করতেন ভারতের মুক্তি সাধনায় মুসলিমরা হল পথের কাঁটা। বাধা স্বরূপ বলেই সে কাঁটা সরাতে হবে।"

স্যার চার্লস টেগার্ট তাঁর 'টেরেরিজম ইন ইন্ডিয়া' বইতে লিখেছেন– " আমি আপনাদের প্রথমেই বোঝাতে চাই যে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন মূলত হিন্দু আন্দোলন"।

ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনাকারী ডঃ বি আর আম্বেদকর তাঁর "পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া" বইতে লিখেছেন–

"বাঙালী হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল পূর্ব বঙ্গে বাঙালী মুসলমানেরা যাতে যোগ্য স্থান না পেতে পারে সেই আকাংখার দরুন। বাঙালী হিন্দুরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে এবং সেই সঙ্গে রাজস্ব লাভের দাবি করে তারা একদিন মুসলমানদের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের শাসক করে তুলবেন"।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের সভা-সমিতি, প্রতিবাদ-বয়কট এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শ্রী প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক ভারত' পুস্তকে লিখেছেন–

"স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুধর্ম ও আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান জনগণের মনেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যেমন-'ইসলাম প্রচারক', 'মিহির ও সুধকার' 'হাফিজ'-এ মুসলমান লেখকরা প্রচার করতে লাগলেন যে, তিলক, অরবিন্দু, বিপিণ চন্দ্র পাল, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ হিন্দু ধর্মকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন তা উগ্রভাবে ইসলামবিরোধী"।

১৯০৬-এর মুসলিম লীগ গঠন

লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, বঙ্গভঙ্গ বিষয়টি আঞ্চলিক হলেও তা উপমহাদেশের মুসলমানদের একটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। নতুন প্রদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য নওয়াব

www.pathagar.com

সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার শাহবাগে সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার ঘটনায় মুসলমানরা সেখানে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত সর্বভারতীয় ৮০০ মুসলিম প্রতিনিধির এক বিশেষ সভায় নওয়াব ভিকার-উল্-মুলক এর সভাপতিত্বে, অটোয়ার নওয়াব মহসিন-উল্-মুলক্-এর প্রস্তাবক্রমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মোকাবিলায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠন করা হয় (১৯০৬ খৃঃ ৩০ ডিসেম্বর, রোববার)। এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থে বঙ্গ বিভাগকে স্বাগত জানানো হয় এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে আরও একটি ঘটনা ঘটে, যেটি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে উদারপন্থী লিবারেল পার্টি জয়লাভ করায় ভারতে লর্ড কার্জনের স্থলে কানাডায় অবস্থানকারী লর্ড মিন্টোকে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয় এবং ভারত সচিব নিযুক্ত হন কৃতি রাজনীতিবিদ গ্ল্যাডস্টোনের জীবনী রচয়িতা জন মর্লি। ১৯০৬ সালে কংগ্রেস নেতা গোখলের সাথে মর্লি-মিন্টোর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে ভারতীয়দের কিছু কনসেশন প্রদান করা ছাড়াও সীমিত নির্বাচনের মাধ্যমে আইন পরিষদ গঠনের প্রশ্নটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সিদ্ধান্ত হয় ৬০ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদে নমিনেশন ছাড়া যে ২৭টি আসনে সরাসরি ভোটে সদস্য নির্বাচিত হবেন, সেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকার থাকবে না, ভোট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সম্পত্তি ভোটাধিকার চালু হবে। অর্থাৎ ভোটাধিকার লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি থাকতে হবে। এখানেও মুসলমানদের বঞ্চিত করার প্রয়াস। মুসলিম নেতৃবৃন্দ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তারা ভাবলেন, ভারতীয় মুসলমানরা একে তো সংখ্যালঘিষ্ঠ, তার উপর 'সম্পত্তি আইন' চালু হলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মুসলমানদের প্রয়োজনীয় সম্পত্তি না থাকায় বিপুলসংখ্যক মুসলমান ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

এই ধরনের এক পরিস্থিতিতে অটোয়ার নওয়াব মহসিন উল্-মূল্ক-এর উদ্যোগে ৩৬ জন সর্ব-ভারতীয় মুসলমান নেতা মহামান্য আগা খানের নেতৃত্বে লর্ড মিন্টোর সাথে সিম্‌লায় এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন নওয়াব মহসিন-উল্-মুল্ক, নওয়াব ইমদাদুল মুল্ক, নওয়াব ভিকার উল্-মুল্ক, হেকিম আজমল খান, স্যার আলি ইমাম, স্যার মোজাম্মেল উল্লাহ খান, স্যার রফিক উদ্দীন আহমদ, স্যার মুহম্মদ শফি, স্যার আবদুর রহিম, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এবং বিচারপতি শাহেদীন প্রমুখ। এই বৈঠকেই বড় লাট মিন্টো নীতিগতভাবে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রতি স্বীকৃতি দান করেন এবং ১৯০৯ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-এ সর্বপ্রথম পৃথক নির্বাচনপদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে ছিল ২৭টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে মুসলমানরা পাবে ৬টি সংরক্ষিত ও ৪টি অন্যান্য আসন। হিন্দু নেতা গোখলে দুঃখ করে বললেন– "মুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুধু অন্যায্য হয়নি, ভয়াবহভাবে অন্যায্য হয়েছে"। (অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস) আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশনের আগে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। লর্ড মিন্টোর প্রাণনাশের চেষ্টা হল। নাসিকের কালেক্টর জ্যাকসন, ভারত সচিবের সহকারী কার্জন ওয়াইলি, আলিপুর বোমা মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাস গোয়েন্দা বিভাগের শামসুল আলম সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হলেন।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের লাভ

বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ায় পূর্ব বঙ্গের মুসলমানরা উপকৃত হয়েছিলেন বেশি করে। কারণ, এতদিন ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বঙ্গ ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণ হিন্দু শ্রেণীর লুণ্ঠন ক্ষেত্ররূপী খামার বাড়ি। পূর্ব বঙ্গের কৃষকের উৎপাদিত কাঁচামালের পয়সায় কলকাতা এবং তার আশপাশের জেলায় উন্নতি হত। পূর্ব বঙ্গ পড়ে থাকতো রুর‍্যাল স্লাম হয়ে। পূর্বের মানুষের রক্ত পানি করা পয়সাতেই কলকাতায় গড়ে উঠতো শিল্প কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল। পূর্ববঙ্গের মানুষ থাকত রিক্ত-নিঃস্ব-অশিক্ষিত। বঙ্গভঙ্গের ফলেই তাদের আত্মজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ী চট্টগ্রাম-রেঙ্গুন রুটে যাতায়াতের জন্য স্টীমার কোম্পানী খোলেন। এই সময়েই মুসলমানরা শিল্পে, বাণিজ্যে ও কৃষিতে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে উদ্যোগী হন।" এমন কি 'ইসলাম প্রচারক' প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক শিল্প বিজ্ঞান ও কৃষি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য মুসলমান ছাত্রদের ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান দেশে প্রেরণের কথাও আলোচনা করে। এভাবে স্বদেশী আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম মুসলমানদের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পথে চলতে উৎসাহিত করে"। (অমলেন্দু দে ঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ)

বঙ্গভঙ্গের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রদেশে যে অসামান্য উন্নতি হয় তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল শিক্ষা। নতুন প্রেরণায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন কি কৃষক প্রজাদের ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজের সাথে পরিচিত হচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর মাত্র পাঁচ বছরে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় মুন্সীগঞ্জের এক জনসভায় নওয়াব সলিমুল্লাহ বলেছিলেন– "বঙ্গভঙ্গ আমাদের নিষ্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে"।

বঙ্গ ভঙ্গ রদ

পূর্ব বঙ্গ আসাম প্রদেশের উন্নতির গতিধারা যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তখনি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বঙ্গভঙ্গ রদ আইন ঘোষিত হল। হিন্দু নরমপন্থী নেতাদের হাত করতে এবং সন্ত্রাস প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১১ সালের ১২ ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে দিল্লীর দরবার থেকে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখ দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করান।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে শুধু বাংলার নয় গোটা ভারতের মুসলমানগণ কঠিন আঘাত হত-বিহ্বল হয়ে পড়লেন। দারুণভাবে আহত হলেন নওয়াব সলিমুল্লাহ্। বঙ্গের বাইরের নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন নওয়াব ওয়াকার-উল-মুল্‌ক। ১৯১১ সালের ২০ শে ডিসেম্বর তিনি আলীগড় ইন্সটিটিউট গেজেটে 'ভারতীয় মুসলমানদের কর্মপন্থা' নামে এক আবেগময় প্রবন্ধ লিখলেন। তিনি বললেন–

"বঙ্গ বিভাগ রদ করে সরকার মুসলমানদের প্রতি অন্যায় উদাসীনতা দেখিয়েছেন। আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প কর্মপন্থার কথা ভাবতে হবে। মুসলমানদেরকে সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকার পরামর্শ দেয়া অর্থহীন। কারোর উপর ভরসা করার সময় এখন উত্তীর্ণ। নিজেদের শক্তির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। আমাদের গৌরবান্বিত পূর্ব পুরুষগণ আমাদের জাতির জন্য সে নজীর রেখে গেছেন"।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ১৯১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর বাঁকিপুরে অনুষ্ঠিত অল

www.pathagar.com

ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল তার সদ্য প্রণীত গঠনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের (Self Government) দাবি অন্তর্ভুক্ত করে, ১৯১৩ সালের ২২ শে মার্চ মুসলিম লীগের লখনৌ অধিবেশনে তা অনুমোদিত হয়।

১৯১৪ সালের ১৩ ইং এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত রঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক বলেন–

"বঙ্গভঙ্গ রদ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই সময়ের ব্যবধানেও এই ক্ষতি মোচন সম্ভব নয়, কেননা এটি ছিল আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য আত্মসম্মান হানিকর একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা"।

বঙ্গভঙ্গের পথ ধরেই নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রদত্ত কয়েকশ' বিঘা জমির উপর ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হল শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হকের বিখ্যাত পুস্তিকা "Muslim Subberings Under Congress rule"। সেখানে তিনি বললেন, মুসলমান ছাত্রদের বন্দে মাতরম সঙ্গীত পরিবেশনে বাধ্য করা হয়, গান্ধী টুপী আর খদ্দরের কাপড় পরতে বাধ্য করা হয়। গান্ধীর ওয়ার্ধা শিক্ষার পরিকল্পনা, ইসলামী সংস্কৃতিকে বিপন্ন করারই নামান্তর।

বঙ্গভঙ্গের পথ ধরেই শেরে বাংলার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল আত্মপরিচয়ের সেই অমোঘ বাণী– "I am Muslim First, then I am a Bengali".

বঙ্গভঙ্গের পথ ধরেই ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ লাহোরের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল মুসলিম হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার সেই ঐতিহাসিক বাণী– 'লাহোর প্রস্তাব'।

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের পথেই মুসলমানরা অনুভব করতে পারে যে, কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের বুলি মুখ্যতঃ হিন্দু রাজ্য) প্রতিষ্ঠারই নতুন চাল। তখনই তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়

"We donot want to be ruled by you. We are a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of value and proportion, legal laws and normal codes, customs and calender, history and traditions. In short we have our own disdtinctive out look on life By all canons of International law, we are a nation.

অর্থাৎ আমরা আপনাদের দ্বারা শাসিত হতে চাই না। আমরা এমন এক জাতি যাদের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি আছে, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য রীতি আছে, নাম ও নামকরণ প্রণালী, মূল্যবোধ ও মাত্রা বোধ আছে, আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সংস্কার পঞ্জিকা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আশা-আকাংখা এবং সুনির্দিষ্ট জীবনের লক্ষ্য আছে। সকল বিচারে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেও আমরা একটি ভিন্ন জাতি"।

সুতরাং, বঙ্গভঙ্গের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্বতন্ত্র জাতিসত্তাই আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির উৎসমূল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গই আমাদের ইতিহাসের সেই সুউচ্চ মিনার, উপকূলের সেতু বাতিঘর, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা শত্রু-মিত্র চিনতে পারব, সামনে চলার সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা পাব। বঙ্গভঙ্গই আমাদের ইতিহাসের প্রকৃত আলোকবর্তিকা।

www.pathagar.com

বাংলাভাষীরা কি কখনও এক হবে ?

এরশাদ মজুমদার

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ কেন, এমন প্রশ্ন কখনও মনে জাগলে উত্তর কি হবে।

প্রশ্নটি দেখতে সাদামাটা হলেও সাদামাটা নয়। এর উত্তর চট্ করে সহজে দেয়া যাবে না বললেই চলে। অনুরোধ এসেছে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে কিছু লিখতে। বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারটা এই সেদিনের ব্যাপার। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১১ সাল। তখন আজকের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিম বাংলা নিয়ে বঙ্গদেশ ভারতের প্রদেশ ছিল।

তারও আগে ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন সুবে বাংলা দখল করে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি প্রদেশ বা সুবাহ্ ছিল। এই সুবাহ্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল দিল্লীতে মোগলদের হাতে। সুবাহ্র নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা

বৃহৎ বঙ্গদেশ (বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা) নানা সময়ে নানা নামে অভিহিত হয়েছে। যারা এ বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন তারা নামগুলো জানেন।

সুপ্রাচীনকালে পুরাণ বা মহাভারতের যুগে এ অঞ্চলে বলি রাজা নামে একজন শাসক ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি একজন ঋষিকে আহ্বান জানালেন তার স্ত্রীর সাথে মিলনের জন্য। সে যুগে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিলো। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বলি রাজার পাঁচ সন্তান জন্ম নিলো। একজনের নাম ছিলো বঙ্গ। এই বঙ্গের নামেই এই অঞ্চলের নাম বঙ্গদেশ হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে বিদেশীরা এলাকার নাম বঙ্গাল, বাঙ্গাল বা বেঙ্গল নামে অভিহিত করে। বিশেষ করে, আরব ব্যবসায়ীরা শব্দের আগে বা পরে 'আল' যোগ করে শব্দ রচনা করে। কারো কারো মতে, বঙ্গ+আল করেই কালক্রমে বাঙ্গালা বা বাঙ্গাল রূপধারণ।

বাংলায় মুসলমান ব্যবসায়ী ও ধর্ম প্রচারকদের আগমন শুরু হয় সাতশ' সালের শেষের দিকে।

www.pathagar.com

আরব ব্যবসায়ীরা খৃষ্ট-পূর্ব আমল থেকে সমুদ্র পথে বাংলায় আসতে শুরু করে। স্থলপথে ধর্ম প্রচারক ও ব্যবসায়ী হিসেবে মুসলমানরা বাংলায় আসে আটশ' সালের শেষ দিকে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন মধ্যভারতে হর্ষবর্ধন শাসক হিসেবে নাম করে। বাংলায় ছিলেন রাজা শশাংক। এ সময়ে বাংলার সাধারণ মানুষের অবস্থা ছিলো খুবই শোচনীয়। বর্ণবাদ বা বর্ণভেদের কারণে শাসক এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকীদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না।

ঠিক এ সময়েই বাংলায় মুক্তির বাণী নিয়ে মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ আসেন। ফলে, নির্যাতিতরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমান ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রচারক ও সূফীগণ বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার মূল শক্তি ছিলেন।

এরও চারশ' বছর পরে ১২০৪ সালে বাংলায় মুসলমান শাসকের পত্তন হয়। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা দখলের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে ৫শ' বছর ছিল মুসলমান শাসনে। সাবেক বঙ্গদেশে মুসলমানরা ছিল শতকরা ৬০ ভাগ। যুক্ত বাংলায় পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সালে তিনজন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন মুসলমান।

১৭৫৭ সালের জুন মাসে ইংরেজ শাসন শুরু হলে বাংলার মুসলমানদের দুর্গতি শুরু হয়। বাংলার হিন্দুরা ইংরেজ শাসনকে অভিনন্দন জানায়। ফলে, সর্বত্র হিন্দুদের অগ্রগতি সূচিত হয়। এ বিষয়ে উইলিয়াম হান্টারের বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলায় কখনও বাঙ্গালীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাংলা সম্পদে পরিপূর্ণ উৎপাদনশীল সাধারণ মানুষের দেশ ছিল। বহিরাগত ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়রা যোগসাজশে দেশটি চালাতো। পাল, গুপ্ত ও সেন কেউ এদেশের মানুষ ছিল না।

দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা বহিরাগত মুসলমানদের হাতে গেলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা কখনও ক্ষমতার দূরে ছিল না। এ কারণেই ভারতের মুসলমানরা কয়েক শতাব্দী ধরে ক্ষমতার শীর্ষে ছিল।

ইংরেজ শাসনামলেই হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের বিষয়টি প্রকট হয়ে দেখা দিলো, যা আজও অব্যাহত আছে। মুসলমানরা টুকরো ভারতকে এক শক্তিশালী দেশে পরিণত করেছিল। ইংরেজরা সেই ভারতকে ১৯৪৭ সালে দুইভাগ করেছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দুই ভাগ হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন হয়।

ইংরেজ শাসনের পটভূমিতে পিছিয়ে পড়া বাংলার নির্যাতিত মুসলমানরা নিজেদের অধিকার সচেতন হতে শুরু করলে আজকের বাংলাদেশের (পূর্ব বঙ্গ) মুসলমানদের স্বার্থেই ১৯০৫ সালে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। এই প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সমুদ্র বন্দর ছিল চট্টগ্রাম।

পশ্চিম বঙ্গের অগ্রসরমান হিন্দুদের গঠিত আলাদা প্রদেশ পশ্চিম বঙ্গ। রাজধানী ছিল জবচার্ণকের কলিকাতা।

নতুন ব্যবস্থাকে বাংলার (পূর্ব বঙ্গ) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু হিন্দু ভাইরা তা মানলেন না। বঙ্গ মাতাকে দুই টুকরো করা যাবে না বলে তারা আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলায় সন্ত্রাসী গ্রুপের জন্ম নেয়। এমন কি আমাদের প্রাণপ্রিয় কবিগুরু নিজেই বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনে যোগ দিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতি দিলেন। শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

ইংরেজরা হিন্দু বন্ধুদের খুশী রেখে আরও কিছুকাল ভারত শাসনের জন্য ১৯১১ সালের ১৬ই অক্টোবর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রতিষ্ঠা বাতিল করলো। কবিগুরুসহ প্রিয় হিন্দু নেতারা খুশী হলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় অখন্ড বঙ্গদেশ ও আসাম নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দাবী উঠলে কংগ্রেস ও পশ্চিম বাংলার হিন্দু নেতারা রাজী হলেন না। এবার তারা বল্‌লেন বঙ্গমাতাকে দ্বিখন্ডিত করতে হবে। হাজার বছরের বাংলার বাঙ্গালীরা অখন্ড স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করলো না। সেদিনের অখন্ড স্বাধীন বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলো এত অবহেলিত থাকতো না। এমন কি পশ্চিম বাংলার মানুষ দিল্লীর অধীনে নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ ১৯৭১ সালে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ আমাদের জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় সঙ্গীত আছে।

আমাদের নিকট দেশগুলোতে কোটি বাংলাভাষী আছে যাদের কোন জাতীয় সঙ্গীত নেই, জাতীয় পতাকা নেই। অথচ আমরা সবাই বাঙ্গালী।

শুধু ধর্মের কারণেই কি বিভিন্ন দেশে কোটি কোটি বাঙ্গালীরা আজ শোষিত? এভাবে আর কতকাল তারা শোষিত হবে?

www.pathagar.com

১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ দুই বঙ্গভঙ্গ ও মধ্যকালীন রাজনীতি

শামসুল ইসলাম

ঐতিহাসিকরা এর নাম দিয়েছিলেন বেঙ্গল প্রপার, ইংরেজরা বেঙ্গল প্রভিন্স্ বা বাংলা প্রদেশ। বেঙ্গল বা বেঙ্গল প্রভিন্স্-এর আয়ু ছিল মাত্র ৩৫ বছর–১৯১২ থেকে ১৯৪৭। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, এদেশীয়দের মধ্যে মতানৈক্যের সুযোগ গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে সামরিক শক্তির সাহায্যে ইংরেজ ১৮০৩ সালে দিল্লি পর্যন্ত তাদের সীমানা সম্প্রসারিত করে। বাংলা প্রেসিডেন্সির সীমানা তখন পাঞ্জাবের শতদ্রু নদী পর্যন্ত পৌঁছে। ১৮৩৫ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং ১৮৭৪ সালে আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। তবুও বাংলা, বিহার উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বেঙ্গল ছিল ১,৯০,০০০ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত প্রদেশ। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলো এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে এক প্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামকে নিয়ে ঢাকা রাজধানীসহ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' গঠিত হয়। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নিয়ে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গকে যুক্ত করে বেঙ্গল বা বাংলা প্রদেশ গঠিত হলো। আসামকে আলাদা প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হলো।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জন। যদিও তিনি এর উদ্যোক্তা ছিলেন না। ১৮৯৮ সালে ৩৬ বছরের যুবক কার্জন যখন বড়লাট হিসেবে ভারতে আসন তখন তিনি কংগ্রেসের প্রিয় ব্যক্তিত্ব। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি রমেশচন্দ্র মজুমদার তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে, কার্জনের আগে কোনো বড়লাটই, জনগণের সাহায্যে এবং জগণের সহযোগিতায় কাজ করার সদিচ্ছা নিয়ে ভারতে আসেননি। গান্ধীও ছিলেন কার্জনের গুণমুদ্ধ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এস গোপাল যথার্থই বলেছেন যে, এই ব্যবস্থাটি গৃহীত হয়েছিল কেবলমাত্র প্রশাসনিক কারণে, কিন্তু এর বিরোধিতা করা হয়েছিল রাজনৈতিক ও আবেগজনিত কারণে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এটিকে একটি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ইস্যু এবং আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা হয়। আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত হয়, এর ফলে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার আগে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় সভার সভাপতি তার ভাষণে বলেন, এই নতুন প্রদেশে মুসলমানরাই হবে সংখ্যাগুরু, বাঙালী হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমি শঙ্কিত। মুসলমানরা নতুন প্রদেশ গঠন করার ফলে ধীরে ধীরে এর সুবিধা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হন এবং বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কার্যক্রম শুরু করেন।

মুসলমানরা নতুন প্রদেশ গঠনকে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো শিক্ষা, চাকরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের নৈরাজ্যজনক অবস্থা থেকে উন্নতির পথে অগ্রসরের এক সুযোগ বলে মনে করতে থাকে। ইংরেজ রাজত্বে প্রথম থেকে মুসলমানরা, বিশেষভাবে বাংলার মুসলমানরা, যেভাবে বঞ্চিত, অবহেলিত এবং বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তাতে শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল শোচনীয়। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এই ১০ বছরে যতো ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে তার মধ্যে মাত্র ৫.২% ছিল মুসলমান; অন্যদিকে কলকাতা শহর ও তার কাছাকাছি জেলাগুলোতেই শিক্ষিতের হার ছিল বেশি এবং পূর্ববঙ্গে সবচেয়ে কম। ১৯০১ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেবল কলকাতা শহরের জন্য যে টাকা খরচ করা হয়েছিল সারা মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গের জন্য খরচ করা হয়েছিল তার চেয়েও কম। ১৯০৫ সালে পুলিশের ইনসপেক্টরের চাকরিতে ৫৪ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন এবং সাব-ইনসপেক্টরের পদে ৪৮৪ জনের মধ্যে শুধু মাত্র ৬০ জন ছিল মুসলমান। অন্যদিকে ১৯০৬ থেকে ১৯৯১ (পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের স্থায়িত্বকালে) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ১৪ হাজার থেকে বেড়ে ১৯ হাজার এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ৯ হাজার থেকে বেড়ে ২১ হাজার হয়েছিল। অবশ্য শিক্ষায় মুসলমানদের পেছনে পড়ে থাকার অন্যতম কারণ ছিল ইংরেজি শিক্ষায় তাদের নিজেদের অনীহা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষায় ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন অন্তরায় সৃষ্টি। শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় গোঁড়ামির বদলে দারিদ্র্যই মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথমদিকে কবি রবীন্দ্রনাথ নিজে খুবই অগ্রণী ভূমিকা নেন এবং সভা-সমিতিতেও যোগ দেন। কিন্তু ৩ মাসের মধ্যেই তিনি আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তীকালে তিনি এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, তথাকথিত স্বদেশী ভাবাপন্ন ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত, প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এ জন্য যে, আন্দোলনকারীরা দেশ বলতে বোঝেন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, দেশের কল্যাণ বলতে বোঝেন নিজেদের সুযোগ-সুবিধা, মধ্যবিত্তের স্বার্থ। আন্দোলনের উত্তেজনা যতোই বাড়তে থাকলো রবীন্দ্রনাথ ততোই নিশ্চিত হলেন যে, এ আন্দোলন ধনীর স্বার্থে, শহুরে মধ্যবিত্তের স্বার্থে, গরীব গ্রামবাসীর স্বার্থে নয় এবং অনিবার্য কারণেই গ্রামের সাধারণ মুসলমানও আন্দোলনে শরিক হতে পারবে না। তাঁর এই উপলব্ধি তিনি পরে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, বিশেষ করে ঘরে বাইরে উপন্যাস। মুসলমানদের হতবুদ্ধি করে, পূর্ববাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সমাপ্তি ঘটিয়ে হিন্দু চরমপন্থীদের খুশি করার জন্য এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইংরেজ স্বার্থরক্ষার ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেওয়া হলো। এই সিদ্ধান্তে সাহায্য করলো পশ্চিম ভারতের মুসলমান নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম লীগের সভাপতি আগা খান। আগাখান যে কেবল বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন তাই নয়, বরং বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করার জন্য তিনি মুসলমানদের

www.pathagar.com

পরামর্শও দিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে মুসলমানদের যে ডেলিগেশন সিমলায় বড়োলাট লর্ড মিন্টোর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন তাতে পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দের জেদের ফলে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পূর্ববঙ্গ ও আসামের স্থায়িত্বের কথাটি উল্লেখ করা হয়নি। ধারণা করা হয়, এ জন্যই ঢাকার নবাব উক্ত ডেলিগেশনে যোগ দেননি। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরই হতাশাগ্রস্ত নবাব রাজনৈতিক জীবন থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। সিমলায় ডেলিগেশনের স্মারকলিপিতে পূর্ববঙ্গ আসামের সমস্যার অনুল্লেখ নিশ্চয়ই বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্তে ইংরেজদের উৎসাহ যুগিয়েছিল। আগা খানকে অবশ্য ১৯১১ সালে কংগ্রেস সভাপতির পদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যদিও তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরে তিনি মুসলিম লীগ সভাপতির পদও ত্যাগ করেন।

১৯১০ সাল থেকে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মধ্যে সুসম্পর্কের সুবাতাস বইতে শুরু করে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলে লীগের বিধানাবলী পরিবর্তন করে কংগ্রেসের নির্ধারিত লক্ষ্যের কাছাকাছি নিয়ে আসার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। ১৯১৩ সালে কংগ্রেস সভাপতি সরোজিনী নাইডুর উপস্থিতিতে মুসলিম লীগ কাউন্সিল লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হিসেবে স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ করে। এই সময়ের লীগকংগ্রেস সহযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল লক্ষ্ণৌ–চুক্তি। লক্ষ্ণৌ-চুক্তি ছিল ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কারে প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ঐকমত্য ফর্মুলা। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য আলাদা প্রতিনিধিত্ব মেনে নেয়, সেই সঙ্গে পাঁচটি মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশে মুসলমানরা তাদের জনসংখ্যার বেশি প্রতিনিধিত্বের অঙ্গীকার পায়। এই চুক্তিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলার মুসলমান। বাংলায় তাদের জনসংখ্যা ৫২.৬% হলেও তারা পায় মাত্র ৪০% আসন; অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪.৩% এবং ১৪% হলেও তারা পায় যথাক্রমে ১৫ এবং ৩০। বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ বিক্রয় করে পশ্চিম ভারতের মুসলমান নেতৃত্ব নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘটনার পর এটা ছিল বাংলার মুসলমানদের প্রতি পশ্চিম ভারতের মুসলিম লীগ নেতৃত্বের দ্বিতীয় বিশ্বাস ভঙ্গ। ফলে, ১৯১৯ সালের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে (যা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা নামে পরিচিতি) বাংলার মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও কাউন্সিলে মোট ১১৩টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে মাত্র ৩৯টি আসন এবং সংখ্যালঘু হিন্দুরা ৪৬ আসন পায়। এছাড়া বিভিন্ন পেশার আসনগুলোতেও তাদের বেশিসংখ্যক আসন পাওয়া নিশ্চিত ছিল। নতুন আইনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে। এই নির্বাচনে ৫৬টি নির্বাচিত হিন্দু আসনের মধ্যে মধ্যপন্থীরা ২৭টি আসন পায়, যার প্রায় সবক'টিতেই জমিদার ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত নির্বাচিত হন। মুসলমানদের মধ্যে নির্বাচিতদের ভিতরে প্রায় এক ডজন ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল অংশগ্রহণ করে এবং মোট হিন্দু আসনের ৭৫% এবং মুসলমান আসনের ৫০% আসন দখল করে। কিন্তু যেহেতু স্বরাজ্য দল সরকারে অংশগ্রহণ না করে ভিতর থেকে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অকেজো করার নীতি গ্রহণ করেছিল, তাই তারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধারণ মানুষের মধ্যে এক আশার সঞ্চার করে। ১৯২৩ সালে দাশ বাংলা কংগ্রেস দখল করতে সমর্থ হন এবং খিলাফত নেতা মাওলানা আকরাম খাঁকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট নামে এক চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে,

www.pathagar.com

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থাসহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ৪০% এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ৬০% আসন এবং চাকরিতে মুসলমানদের জন্য বৃহত্তর কোটার ব্যবস্থা করা হয়। এই চুক্তি প্রাদেশিক কংগ্রেসের অনুমোদন পেলেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করেনি। ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনে দাশের দল বিরাট সাফল্য লাভ করে। তিনি নিজে মেয়র ও হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র এবং সুভাষচন্দ্র বসু প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯২৫ সালে হঠাৎ চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে বেঙ্গল প্যাক্ট এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আবারো অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে আসে। ১৯২৬ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেসে শরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করা হয়। এই সভায় কংগ্রেস সভাপতি সরোজিনী নাইডু নিজে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে তিনি হতাশকণ্ঠে বলেছিলেন, এই চুক্তির বিরোধিতা করে আপনারা বৃহত্তর বঙ্গবিভাগের ব্যবস্থা করলেন। মিসেস নাইডুর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। দাসের মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলমান সমঝোতা সুযোগ এবং পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কাউন্সিলে মুসলমান সদস্যরা কৃষিসংস্কার এবং কৃষকদের জন্য মঙ্গলজনক আইন প্রণয়ন করার দিকে নজর দেয়। এসব আইন হিন্দু জমিদার এবং হিন্দু মহাজনদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত হানে। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী গোপাল হালদার যথার্থই বলেছেন, ১৯২৫ সাল থেকে মুসলমানরা বাঙ্গালী মুসলমান হিসেবে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনে, কিন্তু প্রয়োজনে তাদের সমর্থন ছাড়াই, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। বেঙ্গল প্যাক্ট–এর প্রত্যাখ্যানের মূলে ছিল কংগ্রেসের উগ্রপন্থী বিপ্লবীরা, যারা খোলাখুলিভাবেই মুসলমানবিরোধী ছিল। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে কৃষক সাধারণ পল্লীবাসী এবং খাতকদের উপকারের জন্য যে কটি আইন কাউন্সিলে পেশ করা হয় তার প্রত্যেকটি জমিদার, কংগ্রেস এবং স্বরাজ্যদলীয়রা যুক্তভাবে বিরোধিতা করে। পল্লী অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে হিন্দু ভদ্রলোকের মনোভাব আত্মশক্তি পত্রিকা ১৫ মে ১৯২৫ সংখ্যায় এভাবে ব্যক্ত করে, আমরা যদি পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করি এবং খবরের কাগজ পড়ার শিক্ষা দিই, তাহলে আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবো। অন্যদিকে মুসলিম লীগ অবস্থা বুঝে ১৯২৮ সালেই প্রজা ও রায়তের পক্ষ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে ঐক্যের অভাবে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তার 'রোয়েদাদ' দেন। এই রোয়েদাদ 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক ভোট ব্যবস্থা চালু থাকে; বাংলার মুসলমানরা মোট আসনের মাত্র ৪৮.৪% এবং হিন্দুরা ৩১.২% আসন পায়। ফলে ২৫০ আসনবিশিষ্ট বাংলা পরিষদে মুসলমানরা ১১৯টি এবং হিন্দুরা ৮০টি আসন পায়। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস এই বাটোয়ারা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে; ফলে মুসলমান কংগ্রেসিরা কংগ্রেস ত্যাগ করে। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের ভারত আইন প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে প্রমাণিত হয় যে, বাংলার মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতিতে তখনো অভ্যস্ত হয়নি। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ ৩৭টি আসন, প্রধানত মুসলমান ভোটারদের সমর্থনপুষ্ট প্রজা পার্টি ৪০টি আসন এবং বিশেষভাবে ৪২ জন স্বতন্ত্র মুসলমানের নির্বাচন থেকে নির্বাচনী রাজনীতিতে মুসলমান ভোটারদের ভোটদানের প্রবণতা অনুধাবন করা যায়। তবে মোট ১১৭টি মুসলমান আসনের ১১১টিই ছিল গ্রামীণ নির্বাচনী এলাকা। উল্লেখ্য, ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট প্রথমবারের মতো রাজনীতিকে গ্রামভিত্তিক করে দেয় এবং পুরনো দিনের

www.pathagar.com

কলকাতাভিত্তিক রাজনীতি হুমকির সম্মুখীন হয়। ত্রিশ দশকে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাভাব এবং কৃষিপণ্যের দাম না পাওয়া যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে সঙ্কট দেখা দেয়, নতুন নির্বাচন ব্যবস্থায় এর প্রভাব গ্রামপর্যায়ে পৌঁছে। বাংলার পূর্ববর্তী কাউন্সিলে আনীত এবং উত্থাপিত বিভিন্ন আইন কৃষকস্বার্থের অনুকূল এবং জমিদার ভদ্রলোক স্বার্থের প্রতিকূল বলে বিবেচিত হয়। বিশেষভাবে ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনব্যবস্থাকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এক সন্ধিক্ষণ বলে মনে করা হয়। ঐ আইন সম্পর্কে ভোটাভুটির সময় বাংলার আইন পরিষদে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সদস্যরা সাম্প্রদায়িক কাতারবন্দি হয়ে ভোট দিয়েছিলেন। সেই বিলে কংগ্রেসি-অকংগ্রেসি, প্রজা-জমিদার– সব মুসলমান সদস্য প্রজার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা এবং পরবর্তী সময়ে পুনা প্যাক্ট (গান্ধী এবং তফসিলি নেতাদের মধ্যে চুক্তি)-এর ফলে কাউন্সিলে বাংলার বর্ণহিন্দুদের আসন কমে যায়। এই রোয়েদাদ এবং চুক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু ভদ্রলোকের বিরোধিতা তীব্র হতে থাকে। হিন্দুরা সম্ভাব্য মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। এর ফলে রোয়েদাদের পক্ষে মুসলিম জনমত বেড়ে যায়। ফজলুল হকের মতো নেতাও বলতে বাধ্য হন যে, বাংলার হিন্দু চরম স্বার্থপরতানির্ভর সাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক। ১৯৩৬ সালে রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে বাংলার হিন্দুরা নিজেদের 'হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' হিসেবে উপস্থাপন করে নিজেদের 'উচ্চতর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারক' হিসেবে অনগ্রসর মুসলমানদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা পাওয়ার দাবি পেশ করে। অধ্যাপক জয়া চ্যাটার্জির মতে, উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতিই আগামীদিনের প্রাদেশিক পরিষদে নিজেদের বেশি আসনের দাবির মূল যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়। এসব কার্যক্রমে সমসাময়িক কালের প্রায় সমস্ত দিকপালই সমর্থন দেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজাপার্টির নির্বাচনী ইশতেহারে প্রধান বিষয়গুলো ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, খাজনা ঋণ মওকুফ, ঋণসালিশী বোর্ড গঠন, হাজামজা নদী সংস্কার, থানায় হাসপাতাল স্থাপন, বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি। অর্থাৎ এর সবগুলোই গ্রামীণ উন্নয়ন এবং গ্রামের কৃষক-প্রজা ভোটারদের লক্ষ্য করে প্রণীত। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ১৯২৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এক প্রস্তাবে কৃষক-প্রজার দাবি সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অন্যদিকে কংগ্রেসের জমিদারপ্রীতির ফলে অভদ্রলোক ভোটারদের কাছে তারা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ১৯৩৫ সালের আইনে ভোটার সংখ্যা বেড়ে যায়। দেশের লোকসংখ্যার ১৩% বেশি ভোটার শ্রেণীভুক্ত হয়। ভোটারের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে কেন হিন্দু ভদ্রলোক রাজনীতিকরা শঙ্কিত বোধ করেন, এই প্রশ্ন রেখে সমসাময়িক কালের বাংলার ইতিহাসের গবেষক ক্রুখফিল্ড তার এলিটি কনফ্লিক্ট বইয়ে বলেছেন যে, অভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রলোকদের যোগাযোগের অভাবেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ভদ্রলোকেরা ভয় করতে থাকে, যদি তারা সরকারি শাসন প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে না পারে তবে এগুলোর নিয়ন্ত্রণ অভদ্রলোকদের হাতে চলে যাবে এবং এগুলো ভদ্রলোকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। ফলে সংসদীয় পদ্ধতির সম্প্রসারণ হিন্দু ভদ্রলোকের জন্য সুযোগের বদলে একটি ভীতিকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন হলো। বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিন্দু ভদ্রলোকের জন্য ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক মহাজন-খাতক সম্পর্ককে আরো জটিল করে তোলে। খুব উঁচু হারে ধার্যকৃত সুদ মুসলমান কৃষকদের পক্ষে ফেরৎ দেয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। ঋণসালিশী বোর্ডের সৃষ্টি হিন্দু ভদ্রলোকদের স্বার্থবিরোধী হিসেবে প্রতিপন্ন হলো। মুসলিম লীগ জমিদার এবং অভিজাতদের হাতে বন্দী থাকলেও মুসলিম ভোটারদের স্বার্থে তাদের পক্ষ সমর্থন করতে

www.pathagar.com

হতো। তাছাড়া ছিল ধর্মের দোহাই। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের বিপরীতে মুসলমানদের মুখপাত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিল। সর্বভারতীয় লীগে বাংলার লীগের অবস্থান ছিল খুবই দুর্বল। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত লীগ কাউন্সিলে ৩১০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬০ জন ছিলেন বাংলার সদস্য, অথচ উত্তর প্রদেশের মুসলিম জনসংখ্যা বাংলার একপঞ্চমাংশের কাছাকাছি হলেও উত্তর প্রদেশের কাউন্সিলে সদস্যসংখ্যা ছিল ৫০। এমন সার্বিক পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত আইনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এস গোপালের মতে, ১৯৩৬ এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিগণিত হলো।

১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলার লীগ-কৃষক-প্রজা মন্ত্রিত্ব শপথ নেয়। অমৃতবাজার পত্রিকা দুঃখ করে লিখলো, বাংলায় 'মুসলিম-রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসলে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে অস্বীকার করাতেই ফজলুল হক লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করতে বাধ্য হন। তাছাড়া কৃষক-প্রজা পার্টির কাছে কৃষক-প্রজার স্বার্থের যে রাজনৈতিক অগ্রাধিকার এবং প্রতিশ্রুতি ছিল, কংগ্রেসের তা ছিল না। পরবর্তীকালে বাংলা পরষদ পেশকৃত এসব আইন ইচ্ছাকৃতভাবে 'হিন্দু ভদ্রলোকদের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য', 'সাম্প্রদায়িক' এবং বিপ্লবী ব্যবস্থা হিসেবে' চিহ্নিত করা হয় ; ফলে দেশকে নৈরাজ্য, ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়া হচ্ছে বলে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, হক-লীগ মন্ত্রিসভা কর্তৃক আনীত বিভিন্ন আইন কৃষকদের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছিল। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলায় হিন্দু মহাসভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলো। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইয়ে সুভাষ বসুর পরাজয়ের পর বাংলা কংগ্রেস থেকে বসুর দলের বহিষ্কারের ফলে দলটি থেকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল নেতৃত্ব বিদায় হলো, সেখানে হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারীরা জায়গা করে নিলো। ঢাকা শহরে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের কংগ্রেস 'সাম্প্রদায়িক সাহায্য' দান করতে কার্পণ্য করেনি।

ইতিমধ্যে ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ইংরেজদের বিরুদ্ধে আগস্ট আন্দোলন এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রতি নিরপেক্ষ ছিল। এই আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস আরো শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এর আগে মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ইংরেজ সরকারের এক প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলার মুসলিম লীগ ১১৭টি মুসলমান আসনের ১১৫টিতে জয়ী হয়। মুসলিম লীগ শহরের ভোটের ৯৫% এবং গ্রামীণ ভোটের ৮৫% পায়। সুতরাং লীগের বিজয় ছিল নিরঙ্কুশ। মুসলিম লীগে নির্বাচনী ইশতেহারে সখ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং গরীবের অধিকারের কথা উল্লেখ ছিল। ইশতেহারে প্রগতিশীলতার সঙ্গে ইসলামিক আদর্শ এবং শরিয়ার কথা থাকলেও পাকিস্তানকে ইসলামিক রাষ্ট্র করার কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না। উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে ছিল আইনের চোখে সমতা, জাতি, বর্ণ, শ্রেণীবিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান সুযোগ, পাট শিল্পের জাতীয়করণ, কায়েমি স্বার্থের বর্জন এবং কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকারের ঘোষণা। প্রাদেশিক লীগের এক নেতা জিন্নাহকে লিখেছিলেন, বেঙ্গল লীগ সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাবিরোধী আদর্শ গ্রহণ করেছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ও লীগ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে দু'টি দল পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের আগেই স্বাধীনতা দাবি করে। এর অর্থ

www.pathagar.com

ইউনিটারি ব্যবস্থার সরকার, সর্বভারতের জন্য এক শাসনতন্ত্র, এক জাতি। অন্যদিকে মুসলিম লীগের দাবি, নির্বাচনে মুসলিম ভোটাররা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিয়েছে। তাই আগে নীতিগতভাবে পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন ভারতে আসে। ১৬ মে ৩ স্তরবিশিষ্ট এবং গ্রুপসহ এক ব্যবস্থার কথা বলে, যা ছিল সার্বভৌম পাকিস্তান এবং কংগ্রেসের শক্তিশালী ও সংগঠিত কেন্দ্র– এই দু'য়ের এক সমন্বয়, যে ব্যবস্থায় কেন্দ্র তিনটি সাধারণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার রাজস্ব নিজেই তুলবে। মুসলিম লীগ কাউন্সিল কেবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করে। কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও এই প্রস্তাব মেনে নেয়। মওলানা আজাদের মতে, ১০ জুলাই জওয়াহেরলাল নেহরুর এক বক্তব্যে সমস্ত কিছু উলটপালট হয়ে যায়, জিন্নাহ কেবিনেট মিশন থেকে সরে যান। মাওলানা আজাদ জওয়াহেরলাল সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ ১৯৩৭ সালে তার ভুল ছিল যথেষ্ট, ১৯৪৬ সালের ভুলের জন্য আরো অনেক বেশি মাশুল দিতে হলো। ১৯৪৭ সালের জুন মাসের ৩ তারিখে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং বড়লাট যুক্তভাবে ঘোষণা করেন যে, ভারত ভাগ করে দুটি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ভারত ভাগের সঙ্গে বাংলাও ভাগ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হলো। ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি হিন্দু মহাসভা বাংলার বিভক্তি দাবি করে। ৪ ঠাএপ্রিল বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসও মহাসভার এই দাবির সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে বঙ্গবিভাগ দাবি করে। অমৃতবাজার পত্রিকার এক জনমত যাচাইয়ে দেখানো হয় যে, শতকরা ৯৮% বাঙালী হিন্দু বঙ্গ বিভাগ চায়। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাঙালী হিন্দু সদস্যরা দিল্লীতে একত্রিত হন এবং বাংলা বিভাগের প্রস্তাব নেন। ঐ মাসেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে কলকাতায় এক হিন্দু সমাবেশে বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত নেয়। শ্যামাপ্রসাদ বলেন যে, বাংলা ভাগ করলে পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। কলকাতা হাইকোর্টের হিন্দু ব্যারিস্টাররাও সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবিভাগ দাবি করে। তবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীই বঙ্গবিভাগের দাবির স্রষ্টা। ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ ছিল ইংরেজ শাসনাধীনে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে অসখ্যের উন্নতি ও অগ্রগতি এবং এর ধারাবাহিকতায় উদ্ভূত অবস্থা নিরসনের চেষ্টাকে প্রাগ্রসর সম্প্রদায়ের সহজভাবে গ্রহণ না করার ফল।

১৯৪৭ সালের দেশভাগ মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধের ফলশ্রুতি হিসেবে সাধারণভাবে গৃহীত মতবাদ। বাংলা বিভাগ সম্পর্কেও সাধারণ ধারণা হচ্ছে যে, মুসলমানরা স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী– এর ফলেই মুসলমানরা বাংলার বিভক্তি চেয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের বঙ্গবিভাগের আন্দোলন একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না। বরং এটি ছিল একটি সাজানো এবং সংঘটিত ব্যাপক প্রচারকার্যের ফল। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে সভাপতি এন চ্যাটার্জী বলেন, জাতীয়তাবাদীদের বিভাজন থেকে রক্ষা করতে হলে ও বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি বাঁচাতে হলে, ভারতের অধীনে বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি মাতৃভূমি প্রয়োজন। কংগ্রেসই ছিল বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। যদিও কংগ্রেসের এই নতুন ভূমিকায় অবাক হওয়ার কিছু নেই এ জন্য যে, চল্লিশের দশকে বামপন্থীদের এবং সুভাষ গ্রুপের সঙ্গে সংঘাতে কংগ্রেস নীতি সম্পূর্ণভাবে হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় নিবেদিত হয়েছিল। এছাড়া ৪০ দশকে নীতি এবং সদস্য গ্রহণের ব্যাপারে কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার মধ্যে ব্যবধান মুছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বঙ্গ বিভাগের আন্দোলনের ব্যাপারে কংগ্রেসই ছিল নেতৃত্বদানকারী সংগঠন।

এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এক সময়ের জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ভদ্রলোকেরা বাংলাকে ভাগ করার জন্য যে-কোন কৌশল অবলম্বন করতে পিছপা হননি। কলকাতার অবাঙালি ব্যবসায়ীরা

www.pathagar.com

এই আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোটিপতিদের হিসাব ছিল যে, বাংলা ভাগ করা হলেই নতুন প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারবে এবং সেই সরকার মাড়োয়ারিদের পকেটেই থাকবে। বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক এবং তাদের স্বার্থে কংগ্রেসের বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্তে কারণ ছিল বহুবিধ। বাঙালি ভদ্রলোকেরা ছিলেন প্রধানত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থার ফসল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে এ প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হলেও ক্ষমতার সমস্ত কেন্দ্রগুলো তাদের দখলেই ছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালের রোয়েদাদের ফলে পরিষদে তাদের সংখ্যালঘু করে দেয়া হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পর প্রদেশে তাদের ক্ষমতা ধরে রাখার সব আশাই বিলীন হয়ে যায়। উপরন্তু তাদের মনে চিরদিন মুসলমানদের অধীনে যাওয়ার এক ভীতিকর সম্ভাবনা দেখা দেয়। পুনা-চুক্তি তাদের আসনসংখ্যা আরো কমিয়ে দেয়। যে কাঠামোর ওপর ভদ্রলোকদের সুবিধাজনিত অবস্থান নির্ভর করেছিল, দৃশ্যত তাতে ধস নামতে শুরু করে। হিন্দু ভদ্রলোকেরা স্বরাজ চাইতেন, কিন্তু সম্পূর্ণ গণতন্ত্রায়ণ চাইতেন না, কারণ তারা জানতেন, এতে মুসলমানপ্রধান সরকার গঠিত হবে। রাজনীতিতে বাঙালি ভদ্রলোকদের অনুকূল অবস্থান হুমকির সম্মুখীন হওয়ার ফলে তাদের রাজনীতি অন্তর্মুখী ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে প্রদেশে তাদের ক্ষমতার অনিশ্চয়তার ফলে বাঙালি ভদ্রলোকেরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার আশ্রয় নেন। ১৯৪৭ সালের বঙ্গ বিভাগের দায়-দায়িত্ব হিন্দু ভদ্রলোকদের এবং কংগ্রেসের ওপরই বর্তায়। ড. জয়া চ্যাটার্জী তার বেঙ্গল ডিভাইডেড বইয়ে বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে শেষ বিশ্লেষণটি দিয়েছেন এভাবে ঃ ভারতের অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের বিভাগ হিন্দু জনসংখ্যার এক বিরাট এবং শক্তিশালী অংশের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ফলেই ঘটিয়েছে। যখন সিদ্ধান্তের সময় এসেছিল তখন হিন্দু ভদ্রলোকেরা মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হওয়ার চেয়ে বাংলাকে ভাগ করাই শ্রেয় বলে মনে করলো। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের ক্ষমতা জোরদার করার মূল্য হিসেবে শুধু দেশভাগেই রাজি হলেন না, বরং বাংলা কংগ্রেস প্রদেশ ভাগ করার পক্ষে সাম্প্রদায়িক যুক্তি দ্বারা কার্যকর প্রচার চালালেন।

১৯৪৭ সালের ২৬ এপ্রিল জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন, বাংলা একত্রিত থাকলে তিনি আনন্দিত হবেন, এমন কি যদি পাকিস্তানের বাইরেও সেটা থাকে। কিন্তু বাংলা যুক্ত রাখার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় ১৯৪৭ সালে ২০ জুন পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিতিনিধিদের যুক্ত সভায় ১২৬-৯০ ভোটে প্রদেশকে একত্র রাখার সিদ্ধান্ত হয়। আবার পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের সভায় ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিরা ১০৬-১৫ ভোটে প্রদেশকে একত্র রাখার সিদ্ধান্ত নেন। আলাদাভাবে ১০৭-১৪ ভোটে পূর্ববঙ্গকে সিলেটের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৪-১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো বঙ্গবিভাগ সম্পন্ন হয়। ১৯৯৭ সাল এই বিভাজনের অর্ধশতাব্দী।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ঃ দুই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সংঘাত

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

১৬৯৮ সালে সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর এই তিনটি মাত্র গ্রামের জমিদারীর ইজারা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। মাত্র ৭৫ বছরের মধ্যে সেই ইংরেজদের শাসনাধীন 'বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী' এক বিশাল আয়তন লাভ করে। এ সময়ের মধ্যে মধ্যভারতের একাংশ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং পুবে চট্টগ্রামের সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৭৭৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সনদ ২০ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সময়ই প্রথমবারের মতো চারজন কাউন্সিলরসহ একটি গভর্নর জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন ভারত-সাম্রাজ্য বিষয়ক প্রথম গভর্নর জেনারেল। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক সনদ শেষ বারেরমতো ১৮১৩ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য নবায়ন করা হয়। প্রশাসনিক চার্টার নবায়নের এই মুহূর্তে একটি ডেপুটি গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮০৩ সাল নাগাদ আধুনিক উত্তর প্রদেশের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা ইংরেজদের দখলে চলে যায়। তখন এ প্রদেশের নাম করা হয় 'উত্তর পশ্চিম প্রদেশ'। ১৮১০ সালের মধ্যে দিল্লী ও শিখ-সীমান্ত পর্যন্ত ইংরেজ-দখলের ব্যাপ্তি ঘটে। ১৮১৬ সালে নেপাল ও ছোট নাগপুর এবং ১৮১৭ সালে মধ্য-ভারতের মারাঠা অধিকৃত এলাকা ইংরেজরা গ্রাস করে। বেঙ্গলের অধীনে এই নবগঠিত এলাকা সাগর ও নর্মদা অঞ্চলরূপে চিহ্নিত হয়। ১৮২৪ সালে আসাম, কাছার, জয়ন্তিয়া ও মনিপুর এবং বিশাল বর্মী এলাকা ইংরেজরা দখল করে। প্রশাসনিকভাবে এই বিশাল ভূখণ্ডের পুরোটা ছিল বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর অধীন। ১৮৩৩ সালের সনদ অনুযায়ী আগ্রাকে রাজধানী করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর অধীনে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী স্থাপন করা হয়। বাংলা এ সময় মুগল বাদশাহী আমলের সাবেক বাংলা-

www.pathagar.com

বিহার-উড়িষ্যা সুবাহসমূহের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৩৯-৪০ সাল নাগাদ পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। ইংরেজ রাজত্ব ফুলে ফেঁপে ওঠার সাথে সাথে নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা ও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার মুকাবিলার জন্য ১৮৫৩ সালে স্থায়ীভাবে একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর অধীন করা হয়। এই দুই প্রশাসনিক প্রধানেরই দফতর ছিল কলকাতায়। ১৮৬২ সালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় রাজধানী কলকাতায় একটি মনোনীত ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠন করা হয়। এ বছরই কলকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী'র আয়তন ছিল ২ লাখ ৪৬ হাজার ৭৮৬ বর্গমাইল। পুব থেকে পশ্চিমে চিহ্নিত সীমানার দূরত্ব ৮০০ মাইল।

(এম কে ইউ মোল্লা ঃ দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম, পৃঃ ১৫)

ইংরেজ প্রশাসনে তখন এক বেসামাল অবস্থা বিরাজ করছিল। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার ৬টি জেলা, বিহারের অংশ ও উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষে কয়েক লাখ মানুষ মারা যায়। দুর্ভিক্ষের জন্য দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোকে দায়ী করা হচ্ছিল। এ সময় থেকে মাদ্রাজ ও বোম্বের মতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী এলাকার জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ গভর্নর-এর প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এ প্রস্তাবের সমর্থকরা ইংল্যান্ডে বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, ব্রিটিশ-ভারতের গভর্নর জেনারেল-এর অফিস কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও কূটনীতি বিষয়ক কাজের অস্বাভাবিক চাপের দরুন গভর্নর জেনারেলের পক্ষে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেয়া সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ গভর্নর নিয়োগ অপরিহার্য। এর পর ১৮৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৮৭০-৭১ সালের মধ্যে আসামের কিছু ঘটনা ইংরেজ শাসকদের বিব্রত করে তোলে। ১৮৬৭-৬৮ সালে নাগা উপজাতির লোকেরা আসামের শিবসাগর জেলায় কয়েক দফা হামলা চালায়। ১৮৭০-৭১ সালে তারা সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কাছার ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হামলা ও লুটপাট করে। আসামের চা বাগানগুলোতে উপর্যুপরি তাদের হামলা চলতে থাকে। এসব ঘটনার কারণে ১৮৭৪ সালে সিলেটসহ আসামকে আলাদা প্রদেশরূপে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে আলাদা করে একজন চীফ কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই নতুন প্রদেশের আয়তন ছিল ৪১ হাজার ৭৯৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪১ লাখ। এর ফলে বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর আওতায় থাকলো অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশ। এর আয়তন ছিল ২ লাখ ৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ। ১৮৯৮ সাল নাগাদ লুসাই হিলস এলাকা বেঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অধীনে দেয়া হয়। তারপরও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় বিরাট বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল।

১৮৯৬ সালের ২৫ নভেম্বর আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ভারত সচিবের কাছে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি আসামের সাথে ঢাকা, মোমেনশাহী ও চট্টগ্রাম এলাকা সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, তার প্রস্তাব গৃহীত হলে আসামের জন্য একটি পৃথক সিভিল সার্ভিস গঠন ছাড়াও প্রস্তাবিত সম্প্রসারিত প্রদেশটি দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে। সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশের আয়তন হবে ৮০ হাজার ৯৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা থাকবে এক কোটি ৫৫ লাখ ৮০ হাজার।

(এম কে ইউ মোল্লা ঃ দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম)।

www.pathagar.com

আসাম প্রদেশের এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে আরো আগে থেকেই আলোচনা চলছিল বলে মনে হয়। চট্টগ্রামকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা প্রশ্নে কলকাতার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৮৯২ সালের ৯ এপ্রিল এবং 'ঢাকা গেজেট'-এ ১৮ এপ্রিল মন্তব্য করা হয় যে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আর কোন এলাকা পৃথক করার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়। তখনো অন্য কোন এলাকার বিষয় আলোচিত হয়নি। 'ভারত সভা'র সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৮৯৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারের কাছে একটি প্রতিবাদলিপি দেন। সবশেষে আসামের চীফ কমিশনারের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব কলকাতার বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আসামের ভূমি-ব্যবস্থার কারণেই কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারের কাছে আসাম প্রদেশের সম্প্রসারণ গ্রহণযোগ্য ছিল না।

১৮৯৬ সালের দিকে আসামের চীফ কমিশনারের দায়িত্ব পেলেন স্যার হেনরী জন স্টেড কটন। তিনি ছিলেন কলকাতার বর্ণহিন্দু স্বার্থের কট্টর সমর্থক এবং তাদের বিত্তশালী ও মধ্যশ্রেণীর প্রিয় মানুষ। কটন ১৯০২ সাল পর্যন্ত একনাগাড়ে প্রায় ছয় বছর দায়িত্বে থাকাকালে আসাম প্রদেশের সম্প্রসারণের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, স্যার কটন অবসর নিয়ে কলকাতাতে বসবাস করার সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯০৪ সালে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের সমর্থনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি জোর গলায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেছেন, হিন্দুদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সমর্থন করেছেন এবং বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়ার পর উচ্ছ্বসিত আনন্দও প্রকাশ করেছেন। ত্রিশ বছরের বেশি এদেশে থাকার পর স্বদেশে ফিরে লন্ডনের উদারনৈতিক দলের টিকিটে এমপি হয়ে কটন বিলাতের পার্লামেন্টে কংগ্রেসের প্রতিটি কাজ নির্বিচারে সমর্থন করেছেন। তার বিবেচনায় কংগ্রেস ছিল একমাত্র সঙ্গত জাতীয় প্রতিষ্ঠান, আর মুসলিম লীগ একটি 'সাম্প্রদায়িক' দল।

ভারতীয় রাজনীতিতে এ সময় ছিল এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকাল। এ যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নিলেন জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫)। তার সম্পর্কে পারসিভাল স্পিয়ার 'এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বইতে লিখেছেন ঃ 'ভিক্টোরিয়ান সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যায়ের চিন্তাধারার স্পর্শে উজ্জীবিত রোমান্টিকধর্মী আভিজাত্যমন্ডিত হয়ে তিনি একজন জুনিয়র সরকারী কর্মচারী থেকে উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চল্লিশ বছর বয়সে এই দায়িত্ব লাভ করেন।.... তিনি ভবিষ্যতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় ভারতে তার কার্যক্রমে সাফল্যের ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু ওয়েলেসলি ও ডালহৌসির মতো ভারত তাঁকেও প্রতারিত করলো এবং এখানেই তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পরিসমাপ্তি হতে চলেছিল।'

লর্ড কার্জন দুই দফায় মোট পাঁচ বছরকাল ভাইসরয় ছিলেন। প্রথমে ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। কার্জন ভারতীয় ইতিহাসের সবচে' বিতর্কিত ভাইসরয় হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী (বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরী), প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজ স্বার্থে আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য 'ডুরান্ড লাইন' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অব্যবস্থা তদন্তের লক্ষ্যে কার্জনের নির্দেশে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন জারি হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে

www.pathagar.com

কলকাতার বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবী মহল বিক্ষুব্ধ হয়। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই প্রশাসনিক কাজের সুবিধা ও অনুন্নত এলাকার সমৃদ্ধি সাধনের যুক্তিকে বিশাল আয়তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে পূর্ব বঙ্গ ভাগ করে আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ চিন্তার উদ্‌গাতা ছিলেন না। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র সম্পাদক ল্যোভট ফ্রেসার 'ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এন্ড আফটার' গ্রন্থে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার হিসেবে স্যার এন্ড্রু ফ্রেসার সম্বলপুর জেলার আদালতের ভাষা উড়িয়ার পরিবর্তে হিন্দী করার অনুমতি চেয়ে গভর্নর জেনারেল কার্জনের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে প্রসঙ্গত তিনি প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্য প্রদেশের সাথে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু ভারত সরকারের তৎকালীন কৃষি সচিব ব্যামফিল্ড ফুলার ও স্বরাষ্ট্র সচিব জে পি হেওয়েট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করার সরাসরি বিরোধিতা করেন। ইতোমধ্যে বেরার অঞ্চল ইংরেজ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে সব ক'টি ইংরেজ শাসিত প্রদেশের সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজনে এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এন্ড্রু ফ্রেসার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী বিভক্ত করার পক্ষে যুক্তি দেখান। ১৯০৫ সালে ইংরেজ শাসিত মাদ্রাজ প্রদেশে ছিল ৬১টি পৌরসভা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে পৌরসভা ছিল ১৫৮টি। এ সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী কলকাতার লোকসংখ্যা ১১ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতাসহ ১৫৮টি পৌরসভার সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর লেঃ গভর্নরের একক হাতে। ১৯০৩ সালে ইংরেজ শাসিত তিনটি বড় প্রদেশের মধ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর লোকসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মাদ্রাজে সাড়ে ৪২ মিলিয়ন, ইউপিতে সাড়ে ৪৮ মিলিয়ন এবং বেঙ্গলে ৭৮ মিলিয়ন। এই অবস্থায় ১৯০২ সালের ২৪ মে লর্ড কার্জন লন্ডনে ভারত সচিব লর্ড হ্যামিল্টনের কাছে প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ভাগ করার যুক্তি দেখিয়ে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তির প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য এটি অসম্ভবরূপে একটি বৃহৎ প্রদেশ। এই চিঠির জের ধরে ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব হার্বার্ট রিসলে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বের প্রাদেশিক সরকারগুলোর কাছে পাঠানো চিঠিতে ইংরেজ শাসিত প্রদেশগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রসঙ্গ ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখ করেন। এই চিঠিতে বঙ্গভঙ্গের রূপরেখাও উপস্থাপন করা হয়। তিনি লিখেছেন ঃ অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, বেঙ্গলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রায় সারা বছর সফর করলেও নিজের এলাকার একাংশের বেশি পরিদর্শনে সক্ষম হবেন। পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যেও তার পক্ষে চট্টগ্রাম, ঢাকা, কটক, রছাচি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান একবারের বেশি সফর করা অসম্ভব। চিঠিতে বলা হয় ঃ

(ক) মাদ্রাজের উড়িয়াভাষী এলাকা বাংলার সাথে যুক্ত করা হবে; (খ) ছোট নাগপুরের বিরাট অংশ বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং (গ) চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরাকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর লোকসংখ্যা ৭৮ মিলিয়ন থেকে ৬০ মিলিয়নে হ্রাস পাবে এবং বেঙ্গলের ২৪,৮৮৪ বর্গমাইল এলাকা আসাম প্রদেশের আওতাভুক্ত হবে। উপরন্তু প্রায় ৩১ মিলিয়ন জনসংখ্যাসম্বলিত সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশ চট্টগ্রামের মতো একটি বন্দরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার

www.pathagar.com

করতে পারবে এবং আসামের প্রশাসনের জন্য একটা পৃথক সার্ভিস চালু করাও সম্ভব হবে। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেন। তিনি ১৯০৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা এবং ২০ ফেব্রুয়ারি মোমেনশাহী সফর করেন। উন্নততর প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই সফরের আগে তিনি তার স্ত্রীকে এক চিঠিতে বলেন, পূর্ববঙ্গ আলাদা করার বিরুদ্ধে পুরোদমে হৈ চৈ চলছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন যুক্তি দেখানো হয়নি।

লর্ড কার্জনকে ঢাকায় বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ তাঁর সম্মানে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে রাজপথ সজ্জিত করেন। নওয়াব বাড়িতেই কার্জনের মেহমানদারী করা হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে সম্বর্ধনা দানকালে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি, ঢাকাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি, প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির পক্ষ থেকে একটি এবং জমিদারদের পক্ষ থেকে একটি–মোট চারটি মানপত্র দেয়া হয়। প্রতিটি মানপত্রেই বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। নওয়াব সলিমুল্লাহ লর্ড কার্জনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর প্রকাশ্যে বঙ্গ বিভাগের প্রতি সমর্থন জানান। চট্টগ্রাম, মোমেনশাহী ও ঢাকা সফর করে কার্জন আরো দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন যে, পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।

বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা বিলাতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পর ১৯০৫ সালের জুন মাসে ভারত সচিব সেটি অনুমোদন করেন। বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব প্রচার করা হয় ১৯০৫ সালের ৫ জুলাই। ১লা সেপ্টেম্বর নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারী ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। লর্ড কার্জন নতুন প্রদেশের নাম দিয়েছিলেন 'উত্তর-পূর্ব প্রদেশ'। সেভাবেই তা অনুমোদিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ১১ অক্টোবর ভারত সচিব নতুন প্রদেশের নাম 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' রাখার পরামর্শ দিয়ে তারবার্তা পাঠান। অবশেষে প্রবল উত্তাপ আর উত্তেজনার মধ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' জন্ম লাভ করে। নতুন প্রদেশের প্রথম গভর্নর হলেন আসামের চীফ কমিশনার ব্যামফিল্ড ফুলার (১৮৫৪–১৯৩৫)।

প্রায় পৌনে দু'শ' বছরের ব্যবধানে ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করলো। চট্টগ্রাম হলো প্রধান বন্দর নগরী। নতুন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা ও রাজস্ব-বোর্ড থাকবে। কিন্তু হাইকোর্টের এলাকা থাকলো অপরিবর্তিত। অবিভক্ত বাংলার ১৪টি জেলা ও ২টি দেশীয় রাজ্য নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেগুলো হলো ঃ

১. চট্টগ্রাম, ২. নোয়াখালি, ৩. বাকেরগঞ্জ, ৪. ফরিদপুর, ৫. ত্রিপুরা ৬. ঢাকা, ৭. মোমেনশাহী, ৮. পাবনা, ৯. বগুড়া, ১০. রাজশাহী, ১১. মালদহ, ১২. দিনাজপুর, ১৩. রংপুর, ১৪ জলপাইগুড়ি, ১৫. কুচবিহার ও ১৬ পার্বত্য ত্রিপুরা।

মালদহ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের সীমানা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়, যার ফলে কোন হিন্দীভাষী এলাকা নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। চা ও পাট ছাড়াও বন ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই নতুন প্রদেশের আয়তন হলো ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমান এক কোটি ৮০ লাখ, আর হিন্দু এক কোটি ২০ লাখ। বাকীরা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে থাকলো তার পুব দিকের বিভাগসমূহ, ছোটনাগপুরের পাঁচটি হিন্দী রাজ্য ছাড়া বাকি অংশ এবং সম্বলপুর ও ৫টি

www.pathagar.com

উড়িয়া রাজ্য। বঙ্গ বিভাগের পরও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। তার মধ্যে ৪ কোটি ২০ লাখ হিন্দু, ৬০ লাখ মুসলমান।

ঢাকা ও কলকাতা ঃ বিপরীত স্রোতের যাত্রী

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকালীন অধ্যায়রূপে বঙ্গভঙ্গ ভারতীয় রাজনীতিতে সৃষ্টি করে এক বড় ধরনের অভিঘাত। বঙ্গভঙ্গ ইংরেজ আমলের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ও সর্বাধিক বিতর্কিত ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কলকাতার বর্ণহিন্দুরা দেড়শ' বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাদের ভাগ্য-বিধাতাদের 'বয়কট' করার কর্মসূচী গ্রহণ করে। তারা সবখানে সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে দেয়। সে আগুনে পুড়ে ছাই হয় গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের রাজনৈতিক ভবিষ্যত। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনা প্রবাহের অভিঘাতে নিদারুণ মর্মযাতনা নিয়ে অকালে ইন্তেকাল করেন ঢাকার সন্তান নওয়াব সলিমুল্লাহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর উদ্যোগে মুসলিম লীগ নামে উপমহাদেশের মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুসলমানদের এই স্বতন্ত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা অর্জনের সংগ্রামে পরিচালিত করে। বঙ্গভঙ্গের তিক্ত ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিতে কলকাতার বাঙালী বর্ণহিন্দুদের একাধিপত্য খর্ব করার জন্য ১৫৪ বছর পর বৃটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়। কলকাতা তার পুরনো মর্যাদা আর কখনো ফিরে পায়নি।

ইংরেজ শাসকরা তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিশাল 'বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী' ভাগ করেছিল। এটিকে তারা দেখেছিল একটি বলিষ্ঠ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তরূপে। পূর্ব বাঙলার ভাগ্য-বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগকে দেখেছিল তাদের 'ভাগ্যোদয়ের প্রথম প্রভাত-রূপে'। অন্যদিকে ইংরেজদের সম্পূরক শক্তিরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা এ ঘটনাকে মূল্যায়ন করেছে তাদের দেড়শ' বছরে গড়ে তোলা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর একটি কঠিন আঘাতরূপে। তাদের ভাষায় এ ঘটনা ছিল 'এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়'। বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যশ্রেণী ছিল আনন্দিত এবং এ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামরত। আর কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল ঃ

'গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালী আর কখনো এত বড় দুর্দিনের শিকার হয়নি'।

বঙ্গভঙ্গকে বর্ণহিন্দুরা চিহ্নিত করেছে 'বংগমাতার অঙ্গচ্ছেদ'রূপে। তারা বলেছে ঃ একটি প্রাচীন প্রদেশ যে সব আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির পুরনো বন্ধনে যুক্ত ছিল, বঙ্গ প্রদেশ দ্বিখন্ডিত করে সেগুলো ছিন্ন-ভিন্ন করা হয়েছে। এটাই ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ। অথচ দূর অতীতে কিংবা নিকট-অতীতে পরিবর্তনশীল সীমানার অধীনে বাংলা নামে কোন দেশ ছিল না। দূর-অতীতে এই অঞ্চল অঙ্গ, বঙ্গ, পুন্ড্র, কলিঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি নামে বহু খন্ডে বিভক্ত ছিল। বাংলার মুসলিম সুলতানী আমলেই প্রথমবার শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে 'বাংগালাহ'

www.pathagar.com

নামে একটি বিস্তীর্ণ এলাকাকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সত্তার অধীনে সংস্থাপিত করা হয়েছিল। সেই সীমানা বঙ্গভঙ্গকালীন বাংলার অনুরূপ ছিল না। এরপরেও বারবার রাজ্যের বহিঃসীমানা এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিভাগসমূহে নিরন্তর পরিবর্তন এসেছে। সুলতানী আমলের তিনটি ইকলিম বা প্রদেশ ছিল সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও লাখনৌতি। শেরশাহ তাঁর প্রশাসনিক বিবেচনায় এই তিন প্রদেশকে ১৯টি 'সরকার' ও ৬৮২টি পরগনায় ভাগ করেন। এরপর মুরশিদ কুলী খাঁ ১৭২২ সালে শেরশাহের আমলের বিভাগসমূহ পরিবর্তন করে তাঁর শাসনাধীন এলাকাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগনায় পুণর্বিন্যাস করেন। সুবাহদারী আমলে প্রায়শ বাংলা ও বিহারের জন্য সরাসরি দিল্লী থেকে পৃথক সুবাহদার নিযুক্ত হতেন। বাংলা প্রদেশ একাধিক নায়েব-নাযিমের অধীনে ন্যস্ত ছিল। তাদের ওপর ছিলেন সুবাহদার। নবাবী আমলে শতবর্ষব্যাপী ঢাকা ছিল সুবাহ বাংলার রাজধানী। সাবাহদারগণ প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো তাদের শাসন পরিচালনা করেছেন। তাদের আমলে একটি স্বাধীন রাজধানীর মেজাজ নিয়েই ঢাকা নগরী বেড়ে উঠেছিল। এরপর মুরশিদ কুলী খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী মুরশিদাবাদে স্থানান্তর করেন। সে সময় এবং তার দীর্ঘ দিন পরও কলকাতা ছিল ধানক্ষেত, কলাবাগান আর জঙ্গল অধ্যুষিত গোবিন্দপুর-কলকাতা-সুতানুটি গ্রাম-সমষ্টি মাত্র। একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার যে আকার বা গঠন বিন্যাস, তা ছিল একেবারে সাম্প্রতিক বিষয়। বৃটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে কায়েম হওয়ার অনেক পরে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল। অর্থাৎ যে বংগ-মাতার অংগচ্ছেদের যন্ত্রণায় কলকাতার বর্ণহিন্দুরা বিশ শতকের গোড়ার দিকে ছটফট করেছিল, সেই বাংলার বয়স তখন ছিল একশ' বছরেরও কম।

কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের বিরোধিতার ছয় কারণ

'বংগ মাতা'র অখণ্ডতার প্রশ্ন তুলে কলকাতার বর্ণহিন্দুরা গরিষ্ঠ হিন্দু জনতাকে ধর্মীয়ভাবে উন্মত্ত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আসল কারণ ছিল ভিন্নরূপ। সরকারী নথিপত্র, পত্র-পত্রিকার সমসাময়িক বিবরণ এবং বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের আলোকে বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতার ছয়টি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

এক. ইংরেজদের নতুন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট বর্ণহিন্দু ভূমি-বিচ্ছিন্ন, অনুপস্থিত নব্য জমিদারগোষ্ঠী প্রজা-শোষণের নানারূপ কৌশলের মাধ্যমে অর্জিত উদ্বৃত অর্থে কলকাতায় যে বিলাসী জীবন কাটাচ্ছিলেন, বঙ্গভঙ্গের মধ্যে তারা নানাবিধ স্বার্থহানির বিপদ দেখতে পেলেন। ফলে খরচ বাড়বে; দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-প্রজারা মুসলমান এবং জমিদাররা হিন্দু হওয়ায় নতুন প্রাদেশিক ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করে সেই মুসলিম প্রজারা জমিদারদের জুলুমের প্রতিবাদ ও খাজনা কমানোর আন্দোলন শুরু করতে পারে; তৃতীয়ত, আসামের ভূমি-ব্যবস্থা বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে আলাদা এবং প্রতি ত্রিশ বছর পর রাজস্বের নতুনভাবে নির্ধারণ করা হতো। এই নতুন ব্যবস্থা বাংলার জমিদারদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না।

দুই. পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের জন্য চট্টগ্রাম ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা হবে বলে অনেক ব্যবসা চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীরা এটিকে তাদের ব্যবসায়িক কায়েমী স্বার্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিবেচনা করে।

www.pathagar.com

তিন. কলকাতার বর্ণহিন্দু আইনজীবীদের ভয় ছিল, ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তাদের জীবিকার ক্ষেত্র সংকুচিত হবে এবং তাদের বহু মক্কেল হাতছাড়া হয়ে যাবে।

চার. কলকাতার সংবাদপত্রের মালিকরা ভয় পাচ্ছিলেন যে, নতুন প্রদেশ স্থাপিত হবার কারণে বিকাশমান ঢাকাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তদের নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হবে। ফলে মুসলিম জন-অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় কলকাতার পত্র-পত্রিকার বিরাট বাজার নষ্ট হবে।

পাঁচ. কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু রাজনীতিকরা শংকিত ছিলেন যে, নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশের ভাগ্য স্থানান্তরিত হলে বর্ণহিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।

ছয়. হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক তৎকালীন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছিল, সে কারণে তারা মনে করেছিল যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ফলে দেড়শ' বছরের বঞ্চনার শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির কাছে এটা ছিল একেবারেই অসহ্য।

'ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠাতা, কলকাতার শীর্ষস্থানীয় বর্ণহিন্দু নেতা, কংগ্রেসপন্থী রাজনীতিবিদ ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিষয়টি রাখ-ঢাক ছাড়াই প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ

"For it was openly and officially givenout that Eastern Bengal & Assam was to be a Mohamedan Province: and that credal distinctions were to be recognised as the basis of the new policy to be adopted in the Province."

(A Nation in Making. London. P—187-88)

কলকাতার প্রতিক্রিয়া ঃ 'দেড়শ বছরের বৃহত্তম জাতীয় বিপর্যয়'

কলকাতা নগরীকে ঘিরে ইংরেজ প্রসাদ-পুষ্ট বর্ণহিন্দুদের ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থতাড়িত যে মনস্তাত্ত্বিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তাদের বঙ্গভঙ্গবিরোধী মারমুখি মনোভঙ্গি ছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল। রেভারেন্ড জেমস লঙ তাঁর 'পিপলস ইন টু সোশ্যাল লাইফ অব ক্যালকাটা' বইতে লিখেছেন ঃ

"কলকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সাথে বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাস-ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ; জলাভূমি, জঙ্গল ও গ্রাম থেকে কিভাবে কলকাতা ধীরে ধীরে আধুনিক শহর ও মহানগরে পরিণত হয়েছে, সে কাহিনী লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে সযত্নে রক্ষিত প্রায় এক লক্ষ সরকারী নথিপত্রের মধ্যে সবিস্তারে লেখা রয়েছে।"

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের প্রতিক্রিয়াকে তাদের বিশেষ মানসিক অবস্থানের প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করতে হবে। আর এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য কলকাতা নগরীর ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি নযর ফিরাতে হবে। ১৭৭৪ সাল থেকে দেড়শ' বছর ধরে

www.pathagar.com

কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুরা শোষণ-সাফল্যের একেকটি স্তর উতরিয়ে উঠে গেছে একেবারে শীর্ষ–চূড়ায়। তাদের সেই উত্থান-আরোহণের কার্যকারণরূপে পূর্ব বাংলার গরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক–প্রজাসাধারণ পতনের একটি পর একটি ধাপ বেয়ে নেমে গেছে অধঃপাতের অতল অন্ধকারে। একদিকে বর্ণহিন্দুদের উত্থান, অন্যদিকে মুসলমানদের পতন–এসব কিছুরই মধ্যবিন্দুতে কলকাতা। বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যকারণ কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালী বর্ণহিন্দুদের দ্রুত বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিতেই তাই তালাশ করতে হবে।

ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকরী করার আগেই কলকাতার জমিদার বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের গবেষক সুমিত সরকার ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল (১৯০৩-১৯০৮)' নামক বইতে ভারত সরকার স্বরাষ্ট্র সচিব রিসলের ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারীর একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয় ঃ

"বিক্রমপুরের'বাবুগণ এই ভেবে সন্ত্রস্ত হবেন যে, অধঃতন সরকারী চাকুরীতে তাদের এতদিনকার আধিপত্য বুঝি বিলুপ্ত হলো, প্রস্তাবিত ভাগরেখার দু'পাড়েই যেসব জমিদারের ভূসম্পত্তি আছে তাদের দুই সেট করে প্রতিনিধি ও উকিল নিয়োগ করতে হবে, ভাগ্যকুলের রায়ের-কলিকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে যাদের কাঁচা পাট ও চালের বিরাট ব্যবসা- ভীত হয়েছে এজন্য যে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প বাণিজ্য পথ খোলা হবে; কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীদের ভয়, শেষ পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার অনেকটা হ্রাস পাবে; চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশে (পূর্ব বঙগ ও আসাম) অবস্থান করতে হলে পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদগণ ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন; আর কংগ্রেস রাজনীতিতে কলিকাতা এবং বাংলার (বর্ণহিন্দুদের) ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চয়ই এক চরম সুপরিকল্পিত আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।"

১৯০৫ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের জন্য সবচে' বেশী আতংকগ্রস্ত হয়েছিল কলকাতায় বসবাসকারী পূর্ব বংগীয় বর্ণহিন্দু জমিদারগোষ্ঠী। এরা অন্য সকল ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অনুগত ছিল। কিন্তু নিজেদের বড় রকমের স্বার্থহানির আশংকায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ঝুঁকি নিয়েছে। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন ঃ

"বিচিত্র উপাদান এবং নানাবিধ বৈসয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে গতিসঞ্চার করে।..... জমিদার শ্রেণী-যাদের পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রদেশেই জমিদারী ছিল–এই ভাবনায় চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তাঁরা এ পর্যন্ত যেভাবে লাভবান হয়ে আসছিলেন বাঙলা বিভাগের ফলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির প্রবল আশংকা! কারণ, আসামে সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনর্বিন্যাস করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছির। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ব বাংলা সংযুক্ত হলে পূর্ব বাংলার জমিদারদের রাজস্ব খাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত। তার উপর বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চাকুরীর সম্ভাবনা ও পরিধি সংকুচিত হবে, এইরূপ বাস্তব আশংকায়ও অনেকেই বিচলিত ছিলেন। এ আশংকা অমূলক ছিল না। কারণ আইন ব্যবসায়, সরকারী চাকুরী, শিক্ষাক্ষেত্রে ইত্যাদি ইতিমধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল।..... সুতরাং বেকারীর ভয় বাস্তব।" (রবীন্দ্রনাথ-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃ ১২১-১২৩, উচ্চারণ কলকাতা, ১৯৮২)

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের ফলে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক বি বি মিশ্রিতার 'দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস' বইতে লিখেছেন ঃ

..... এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও সংকুচিত হয়ে গেল; বিশেষত তখন বিধান সভাগুলোর সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ভীত চক্ষে দেখলো, উভয় বাংলার বিধান সভায় তারা একেবারেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে–পূর্ব বাংলায় অসমীয়া ও মুসলমানদের দ্বারা এবং পশ্চিম বাংলায় বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা–এ জন্য তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠলো।

বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হওয়ার পর বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য শিক্ষিত শ্রেণী ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাদের কার্যক্রমে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বললেন ঃ

গোপনে এই বঙ্গভঙ্গ চিন্তার সূত্রপাত, গোপনে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে আর গোপনেই এর চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে।'

কংগ্রেসের এককালের সভাপতি মোমেনশাহীর আনন্দমোহন বসু বঙ্গভঙ্গ বানচালের প্রকাশ্য শপথ ঘোষণা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ৬ জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে 'একটি গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়'রূপে চিহ্নিত করা হয়। 'হিতবাদী পত্রিকা' লিখলো ঃ 'গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতি এই রকম দুর্দিনের সম্মুখীন হয়নি। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। এসব সভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (আধুনিক ভারত, প্রথম খন্ড)

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ও আমাদের জাতিসত্তা

আহমদ আবদুল কাদের

বঙ্গভঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বৃটিশ উপনিবেশিক সরকার প্রধানত প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে এর উদ্যোগ নিলেও তদানীন্তন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে এর তাৎপর্য ছিলো সুদূরপ্রসারী। বঙ্গভঙ্গ ও তদসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যে চেতনা ও স্বকীয়তা বোধের জাগরণ ঘটে তা এদেশের জাতিসত্তা গঠন ও বিকাশে ভিত হিসেবে কাজ করেছে। তাই আমাদের স্বকীয় স্বতন্ত্র জাতির স্বরূপ ও এর বিকাশের ধারা অনুধাবনে বঙ্গ ভঙ্গের ঐতিহাসিক ও ভাবাদর্শিক গুরুত্ব অপরিসীম।

শোষণের কবলে পূর্ব বাংলা

বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা শোষণের কবলে পতিত হয়। এ শোষণ ছিল দ্বিমাত্রিক। উপনিবেশিক শোষণ আর কোলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গ তথা রাঢ়ভূমি কর্তৃক আঞ্চলিক শোষণ। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক রাজধানী মুর্শিদাবাদ স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা ছিল সুবে বাংলার রাজধানী। এর আগে বাংলার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পরও ঢাকা ছিল নাযেবে-নাজিমের রাজধানী তথা পূর্ব বাংলার রাজধানী। বস্তুত দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঢাকা ছিল বাংলাদেশের শাসন ও রাজনীতির কেন্দ্র। ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল-যা সুদূর ইউরোপকে পর্যন্ত আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করেছিল। বৃটিশ শাসনের সূচনার সাথে সাথেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। কোলকাতা হয় রাজধানী। ইংরেজ শাসনের অধীনে "পূর্ব বাংলা" কোলকাতার হিন্টারল্যান্ডে (পশ্চাদভূমি) পরিণত হয়। পূর্ব বাংলা ছিল কাঁচামাল ও খাদ্যের যোগানদাতা। উর্বর ভূমি পূর্ব বাংলার সম্পদ নিয়েই গড়ে উঠে কোলকাতার সমৃদ্ধি। মুসলিম-প্রধান এ অঞ্চলটির উন্নয়ন উপেক্ষিত হয়।

www.pathagar.com

ব্যাহত হয় এ অঞ্চলের ভাষা-সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ। কোলকাতা কেন্দ্রিক আঞ্চলিক শাসন ও আধিপত্য পূর্ব বাংলার জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। এ অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনে ঢাকা কেন্দ্রিক একটি প্রদেশ গঠন ছিল সে সময়কার পরিস্থিতিতে জনগণের প্রাণের দাবী।

বঙ্গভঙ্গ ও নতুন প্রদেশ গঠন

প্রশাসনিক কারণে সরকারী মহলে ঢাকা কেন্দ্রিক একটি প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। অন্যদিকে, সে সময় পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দও নতুন প্রদেশ গঠনের জোরালো দাবী উত্থাপন করেন। তদানীন্তন ঢাকার মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সংঘ' ১৯০৪ সালের ২৫ জানুয়ারী আসাম, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগগুলো নিয়ে (দার্জিলিং, জলপাই গুঁড়ি ও কুচবিহার বাদে) একটি নতুন প্রদেশ দাবী করে। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বড়লাট লর্ড কার্জন বিষয়টি সরেজমিনে তদন্তের জন্যে পূর্ব বাংলায় পরিদর্শনে এলে পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা নবাব সলিমুল্লাহ এতদঞ্চলের জনগণের পক্ষ থেকে তার নিকট নতুন প্রদেশ গঠনের জোরালো দাবী উত্থাপন করেন। পূর্ব বাংলার জনগণের দাবী ও প্রশাসনিক সুবিধা বিবেচনা করে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। ঢাকা হয় এর রাজধানী। নবগঠিত প্রদেশটি ছিলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পূর্ব বাংলার নবজাগরণ

নতুন প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দ্বার উন্মোচন হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে এতদঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আবার ঢাকার পুনর্জন্ম ঘটে। চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের পাঁচ বছরে পূর্ব বাংলার শিক্ষার হার ৩৫% ভাগ বৃদ্ধি পায়। চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত বিশেষ করে মুসলিম যুবকদের প্রতি যে বৈষম্য ও উপেক্ষানীতি চলছিল তার পরিবর্তনের সূচনা হয়। চাকরির ক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব বাংলার রাজস্ব আয় কোলকাতায় স্থানান্তরের পরিবর্তে পূর্ব বাংলায় ব্যয় হতে শুরু করে। নতুন প্রাদেশিক প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও উন্নয়ন ঘটে। সর্বোপরি বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার জনমনে স্বতন্ত্র স্বকীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। তাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে। নবাব সলিমুল্লাহর ভাষায়, "বঙ্গ ভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে চেতনা সঞ্চার হয়েছে। ... বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন হতে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে। এ জাগরণ শুধু মনোজগতেই ঘটে নাই বরং রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতেও শুরু করে।" বঙ্গভঙ্গের সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর পরই নবাব সলিমুল্লাহ ও এ কে ফজলুল হকসহ পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ নবঘোষিত প্রদেশের উন্নতির জন্যে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাদেরই উদ্যোগে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর যে দিন নতুন প্রদেশ কার্যকরী হয়েছিল সেদিনই 'প্রাদেশিক মুসলিম সংঘ' নামে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানের (Provincial Mohamedan Union) মূল উদ্দেশ্যই ছিল নতুন প্রদেশের মুসলমানদের সংহতি বিধান ও জনগণের কল্যাণ সাধন।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ শুধু পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরই জাগরণ ঘটায়নি বরং সর্বভারতীয় মুসলিম জাগরণেও বঙ্গভঙ্গ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে যখন ভারতীয় কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ তুমূল আন্দোলন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে তখন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সর্বভারতীয় মুসলমানদের সমর্থন লাভ এবং সমগ্র ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ ও উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বঙ্গভঙ্গের এক বছরের ব্যবধানে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ঢাকায় ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' ভারতের মুসলমানদের আযাদী ও স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দান করে।

বঙ্গভঙ্গ একদিকে যেমন পূর্ব বাংলার জনজীবনের জাগরণ সৃষ্টি করে, অন্যদিকে ভারতীয় কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী সমাজ-এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ফলে মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়।

যদি বঙ্গভঙ্গ রদ না হতো তাহলে উপনিবেশিক যুগেই পূর্ব বাংলা ভারতের সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হতো। ঢাকা হতো অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী। চট্টগ্রাম বন্দর হতো অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ হতো দ্রুত– কলকাতার উপর নির্ভরশীলতার প্রয়োজন হতো না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার নেতৃত্বের প্রভাব হতো আরো বলিষ্ঠ ও কার্যকর। পূর্ব বাংলা হতো ভারতীয় মুসলিম নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অগ্রণী। মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি ঘটতো। পূর্ব বাংলার সংস্পর্শে আসাম অঞ্চলেরও উন্নতি ত্বরান্বিত হতো। সর্বোপরি আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ হতো দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ। '৪৭ সালে 'কীটদুষ্ট' পূর্ব বাংলার বদলে আমরা লাভ করতাম আরো বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ পূর্ব বাংলা। আসাম অঞ্চলও হতে পারতো আমাদের জাতিসত্তার অংশ। ফলে, ভূ-রাজনৈতিক সমস্যামুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সৃষ্টি হতো। এত সব সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গেলো কোলকাতা কেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক শক্তির ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের ফলে।

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মূল কারণ

কংগ্রেসসহ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধি সমাজ নতুন প্রদেশ গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে এবং তুমূল আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার নানা কারণ দেখালেও মূল কারণ ছিলো ঃ নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, প্রধানত মুসলিম জাতি অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার উন্নতির পথ সুগম হবে– এটা তারা মেনে নিতে পারছিল না। তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, বঙ্গভঙ্গের ফলে তারা আর পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলার হিন্টার ল্যান্ডরূপে ব্যবহার করতে পারবে না।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কোলকাতার টাউন হলে এর বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতি কাশিমবাজারের জমিদার মহারাজা মহেন্দ্র নন্দী তার বক্তৃতায় বলেন যে ঃ

> "নতুন প্রদেশে মুসলমানদের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে। বাঙালী হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্টে পরিণত হইবে। আমাদের নিজদের দেশে আগন্তুকের মত থাকিতে হইবে। আমাদের জাতির ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে কি হইবে তা চিন্তা করিয়া আতংকিত হইতেছি।" মহারাজা জাতি বলতে যে হিন্দু জাতিই বুঝিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। আর এক খ্যাতনামা নেতা

www.pathagar.com

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গের তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, "বাংলাদেশকে বিভক্ত করে হিন্দুদের অপমান ও অপদস্থ করা হইয়াছে।"

কোলকাতার হিন্দুরা ১৬ অক্টোবর (নতুন প্রদেশ গঠনের দিন)-কে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে। ১৯০৬ সালের ৭ আগস্ট থেকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকে তীব্র করার জন্য সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শুরু করা হয়। হিন্দুরা রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। হিন্দু সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও জোরদার করা হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে "হিন্দু-জাতীয়তাবাদ" (হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা)-কে সুসংহত করার জন্য হিন্দু নেতা শিবাজীকে জাতীয় বীরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন করা হয়। দেশের সর্বত্র শিবাজীর জন্মবার্ষিকী মহাধুম-ধামের সহিত পালন করা হয়। কংগ্রেস নেতারা মুসলিম সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রামের প্রশংসা করেন এবং তাকে হিন্দু জাতীয় বীর ও তার সংগ্রামকে জাতীয় সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেন।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, নিছক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি নতুন প্রদেশ গঠন ও মুসলমানদের উন্নতির সম্ভাবনাকে সহ্য না করতে পেরেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা যে "অখণ্ড বাংলার" প্রেমে পড়ে নয় বরং পূর্ব বাংলার প্রতি অবজ্ঞার ও এর উন্নয়নের যে কোন সম্ভাবনাকে ঠেকানোর জন্যই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছে--তার বড় প্রমাণ হচ্ছে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করা। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কারণে পূর্ব বাংলার জনগণের ক্ষোভ কিছুটা প্রশমনের লক্ষ্যে যখন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয় তখনও হিন্দু নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা প্রবলভাবে এর বিরোধিতা শুরু করেন। তাদের যুক্তি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে না কি বাঙালী জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে! তারা আরো বলেন যে, পূর্ব বাংলার 'কৃষক' জনগণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কোন উপকার করবে না। কথাগুলোর উদ্দেশ্য পরিষ্কার। পূর্ব বাংলার জনগণ উচ্চ শিক্ষার সহজ সুযোগ লাভ করুক-কোলকাতার হিন্দু নেতারা, বুদ্ধিজীবীরা তা চাইতেন না।

আরো মজার ব্যাপার হলো, কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী সমাজসহ পশ্চিম বঙ্গ একদা "বঙ্গ মাতা"র অখণ্ডতার প্রেমের দোহাই দিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করে 'প্রথম বঙ্গভঙ্গ' রদ করেছিল তারাই আবার ১৯৪৭ সালে "বঙ্গ মাতাকে" দ্বিখণ্ডিত করে "দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের" ব্যবস্থা করে নিজেদেরকে পূর্ব বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতীয় জাতীয়তায় লীন করে দিয়েছিল।

কাজেই এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ১৯০৫ সালে যেমন "প্রথম বঙ্গভঙ্গের" বিরোধিতা করেছিল পূর্ব বাংলার জাগরণ ও মুসলিম নেতৃত্বকে প্রতিহত করার জন্য, তেমনি একই কারণেই তারা ১৯৪৭ সালে 'দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের' ব্যবস্থা করেছিল।

আমাদের জাতিসত্তার ভিত নির্মাণ

আমাদের জাতিসত্তার তিনটি মৌল উপাদান রয়েছে– ধর্ম, ভূগোল ও ভাষা।

মুসলিমবোধ, বাঙালীবোধ ও বাংলাদেশীবোধ– এ তিনের সমন্বয়েই আমাদের জাতিসত্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ। আর এ তিনটি উপাদানের বিকাশের ধারায় ১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রাথমিক ভিত হিসেবে কাজ করেছে।

১৯০৫-এর প্রথম বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ঢাকা কেন্দ্রিক একটি রাজনৈতিক-আঞ্চলিক ইউনিট সৃষ্টি হয়। সেটিই নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের কারণে তদানীন্তন

www.pathagar.com

'পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। ১৯৭১ সালে সে 'ভৌগোলিক' কাঠামোই স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়। কাজেই ভৌগোলিক দিক থেকে আমাদের জাতিসত্তার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি প্রদেশ গঠিত হয়। সে প্রদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে এতদঞ্চলে মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বের সাথে মুসলিম চেতনাবোধ সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কোলকাতা কেন্দ্রিক বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মূল কারণও ছিল 'পূর্ব বাংলার' মুসলিম রূপের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ। অনেক ঘটনাপ্রবাহের ধারায় ১৯৪৭ সালে সেই মুসলিম পরিচয়ের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সেদিনকার পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। আর ১৯৭১ সালে সেই একই পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই এটি স্পষ্ট যে, আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভিত্তি হচ্ছে মুসলিম পরিচয়বোধ– যার উন্মেষ ঘটেছিল ১৯০৫ সালে "বঙ্গভঙ্গের" মধ্য দিয়ে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক যে প্রদেশটি গঠিত হয়, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল মূল বঙ্গ। "রাঢ়ভূমি তথা পশ্চিম বঙ্গ"ই বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন প্রদেশের বাইরে থাকে। মূল বাঙালী জাতির অধিকাংশই নবগঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলা তথা মূল বাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি লালন ও বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হয়। কোলকাতা কেন্দ্রিক 'রাঢ় ভূমির' ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলা চর্চার পরিবর্তে পূর্ব বাংলা তথা মূল বঙ্গের বাংলা চর্চার পরিবেশ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়। মূল বাঙালী জাতির বাস যে পূর্ব বাংলায়, সে বাংলার ভাষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন মানে মূল বাঙালী জাতি ও তার ভাষার উন্নয়ন। বঙ্গভঙ্গ সে সুযোগটিই সৃষ্টি করেছিল। উপনিবেশিক রাজধানী কোলকাতাকেন্দ্রিক রাঢ়ভূমির লোকেরা বা তাদের সাংস্কৃতিক অনুসারীরা তা চাইতো না বলেই তারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে সেই রাঢ়ভূমির সংস্কৃতির ধারকরাই দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে মূল বঙ্গ ও বাংলা ভাষার প্রধান স্রোত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে 'বাঙালী' ও বাংলা ভাষার পরিচয়কে গৌণ করে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তা ও হিন্দী বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে মূল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে পূর্ব বাংলা এগিয়ে যেতে থাকে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যদিয়ে তা-ই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কাজেই, পূর্ব বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত প্রকৃত বাঙালীবোধও ছিলো ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত।

বস্তুত আমাদের জাতিসত্তার তিনটি উপাদানের সব ক'টির সমন্বিত উন্মেষ ঘটে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে। ১৯৪৭ সালেই তা আরো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে এবং '৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে তা-ই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আমাদের রাজনৈতিক জাতিসত্তা বিকাশের প্রথম সোপান, আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রথম স্ফূরণ, আমাদের স্বকীয়তা উপলব্ধির প্রাথমিক মাইলফলক, আমাদের স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য-অস্তিত্ব নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্নের সূচনা। এক কথায়, ১৯৭১-এ যে জাতি, যে স্বাধীনতার আমরা উত্তরাধিকারী- ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গই হচ্ছে তার প্রাথমিক ভিত।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ ঃ ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া

মুন্‌শী আবদুল মান্‌নান

১৮৯৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর লর্ড কার্জন ভারতের ভাইসরয় পদে অধিষ্ঠিত হন। দু'দফায় মোট ৫ বছর তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম দফায় ১৮৯৮ থেকে ১৯০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। দ্বিতীয় দফায় ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে তিনি ভাইসরয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। এ সময় তিনি বেশ কিছু সংস্কারমূলক কাজ করেন। কিছু গঠনমূলক পদক্ষেপও তার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি, প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ, কৃষি বিভাগ ও শিল্পবাণিজ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। যৌথ ঋণদান সমিতি গঠন, পাঞ্জাব ভূমি হস্তান্তর আইন, লবণ কর ও আয় হ্রাস, ডুরান লাইন প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আইন, প্রাচীন কীর্তিরক্ষা আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস ইত্যাদিও তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লর্ড কার্জনের শাসনকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বঙ্গভঙ্গ। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গ বিভক্ত হয় এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' নামে নতুন একটি প্রদেশের জন্ম হয়। লর্ড কার্জন তার অন্যান্য কীর্তি ও কর্মের জন্যে যতটা না আলোচিত–সমালোচিত- তার চেয়ে অনেক বেশি আলোচিত- সমালোচিত এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে।

পটভূমি

বঙ্গভঙ্গ উপমহাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী একটি ঘটনা। কিন্তু এটা নিতান্তই কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ফল ছিল না। ব্রিটিশ শাসিত বঙ্গ বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রেসিডেন্সিতে আর ছিল আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা। বিশাল আয়তনের এই প্রদেশ শাসনের নানামুখী অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দেয়ায় শাসকদের মনে একে দু'ভাগে ভাগ করার চিন্তা আসে। ১৮৫৩ সালে স্যার চার্লস গ্রান্ট প্রথম বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি

www.pathagar.com

বিভক্ত করার প্রস্তাব দেন। এ বছর স্থায়ীভাবে একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৫৪ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির শাসনভার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীন করা হয়। এতে সমস্যার বিশেষ কোনো সুরাহা হয় না। ১৮৬৬ সাল নাগাদ অবস্থা খুবই বেসামাল হয়ে পড়ে। এ বছর এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর বঙ্গে কয়েক লাখ লোক প্রাণ হারায়। এ জন্যে প্রধানত প্রশাসনিক দুর্বলতাকে দায়ী করা হয়। এ ব্যাপারে একটি কমিটি নিয়োগ করেন স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোট। কমিটি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভাগ করার সুপারিশ করে। প্রায় একই সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উইলিয়াম গ্রে অনুরূপ সুপারিশ প্রদান করেন। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি যে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পক্ষেও সুষ্ঠুভাবে শাসন করা সম্ভব নয়, এই প্রদেশের জন্যে একজন গভর্নর প্রয়োজন- এটাও শাসক শ্রেণী উপলব্ধি করেন। ভারত সচিব স্যার জন লরেন্স কলকাতাকে পৃথক করে আলাদা প্রেসিডেন্সির মর্যাদা দেয়ার সুপারিশ করেন। গভর্নর জেনারেল এর জবাবে আসাম ও কাছাড়ের মত বিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোকে পৃথক করে একজন চীফ কমিশনারের অধীনে তা ন্যস্ত করে সমস্যার সমাধান করা যায় বলে অভিমত রাখেন। এ সময়ে আসামে সংঘটিত কিছু ঘটনা শাসকদের বিচলিত করে তোলে। ১৮৬৭ খেলে ১৮৭১ সালের মধ্যে নাগা উপজাতির লোকেরা শিবসাগর, সিলেট, কাছাড়, ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি এলাকায় হামলা ও লুটপাট করে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর জর্জ ক্যাম্বেল এ সময় আবারও প্রশাসনিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াসহ আসামকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করে একজন চীফ কমিশনারের ওপর তার প্রশাসনিক কর্তৃত্বভার অর্পণ করা হয়। এ সময় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল আড়াই লাখ বর্গমাইলের কাছাকাছি এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি। এই বিভাজনের পরও সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। তাই ১৮৯৬ সালে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ভারত সচিবের কাছে লেখা এক চিঠিতে আসামের সঙ্গে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামকে যুক্ত করার প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাব কার্যকর হয়নি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণে। যা হোক, এরপরে ১৮৯৮ সালে লুসাই পাহাড় এলাকা বেঙ্গল থেকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। এতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন কমে দাঁড়ায় ১ লাখ ৮৯ হাজার বর্গমাইলে। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক সুবিধার স্বার্থে একে ভাগ করার সুপারিশ পাঠান ভারত সচিব লর্ড হ্যামিলটনের কাছে। সেখানে তিনি পূর্ববর্তীদের মতো একই কথা বলেন যে, এতবড় প্রদেশ একজনের পক্ষে শাসন করা অসম্ভব। এর সূত্র ধরে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব ১৯০৩ সালে বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশের সরকারগুলোর কাছে একটি চিঠি দেন। ঐ চিঠিতে তিনি প্রদেশগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রসঙ্গ ছাড়াও বঙ্গ বিভাগের একটি রূপরেখা পেশ করেন। এই রূপরেখায় মাদ্রাজের উড়িষ্যাভাষী এলাকা বঙ্গের সঙ্গে, ছোট নাগপুরের একটা বিরাট অংশ বঙ্গ থেকে মধ্য প্রদেশের সঙ্গে এবং বঙ্গের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও পার্বত্য ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলা হয়।

ঠিক এই পর্যায়ে এসে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের পক্ষে জনমত গঠনের জন্যে ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গ সফর করেন এবং চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় জনসমাবেশে ভাষণদান করেন। তিনি তার ঐসব ভাষণে আরও কিছু এলাকা প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। এতে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, একটি আইন পরিষদ এবং আলাদা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ স্থাপনের উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবিত নতুন প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকায়, একথাও বলা হয়। পরে লর্ড কার্জন পরিকল্পনাটি আরও পর্যালোচনা করেন এবং এর একটি নতুন রূপরেখা প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্যে ভারত সচিবের কাছে পাঠান। ভারত সচিব তাতে অনুমোদন

www.pathagar.com

দান করেন ১৯০৫ সালের জুনে। বঙ্গ বিভাগের অনুমোদিত প্রস্তাব প্রচার করা হয় জুলাইয়ে। লর্ড কার্জন তার প্রস্তাবে নতুন প্রদেশের নাম দিয়েছিলেন 'উত্তর-পূর্ব প্রদেশ'। এ নামে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলেও ১১ অক্টোবর ভারত সচিব এক তারবার্তায় নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' রাখার পরামর্শ দেন। এ নামেই ১৬ অক্টোবর নতুন প্রদেশ আত্মপ্রকাশ করে। আসামের চীফ কমিশনার পাসফুল্ড ফুলারকে নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর করা হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকাকে। চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দর নগরী করা হয়। নতুন প্রদেশের জন্যে আলাদা ব্যবস্থাপক সভা ও রাজস্ব বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তবে হাইকোর্টের ব্যাপারটি অপরিবর্তিত থাকে। চীফ কমিশনারের অধীন আসাম এবং বঙ্গের ১৪টি জেলা ও দু'টি দেশীয় রাজ্য নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। নতুন প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত তৎকালীন বঙ্গের এলাকাগুলো হলো- চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, ঢাকা, মোমেনশাহী, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও পার্বত্য ত্রিপুরা।

নতুন প্রদেশ গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দীভাষা এলাকা বাদ রাখা হয়। দার্জিলিং ছাড়া চা শিল্প এলাকা ও পাট উৎপাদন এলাকাসহ খনিজ ও বনজ সম্পদ এলাকা নতুন প্রদেশভুক্ত হয়। এর মোট আয়তন দাঁড়ায় ১ লাখ ৬ হাজার ৫৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমান ১ কোটি ৮০ লাখ, হিন্দু ১ কোটি ২০ লাখ এবং বাকীরা বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ও অন্যান্য।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ১. প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এলাকা পুনর্বিন্যাস ও বঙ্গ বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। ২. তারা দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা ও প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে নতুন প্রদেশের রূপরেখা প্রস্তুত করেছিল। ৩. নতুন প্রদেশটি যাতে সবদিক দিয়ে টেকসই হয়, সে ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি ছিল। নতুন আকারের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ও নতুন প্রদেশের মধ্যে এলাকা বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, দীর্ঘদিনের বিবেচনা-পুনর্বিবেচনার ফল ছিল বঙ্গবিভাগ। এটা অপ্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক কোনো পদক্ষেপ ছিল না।

কারণসমূহ

১. বঙ্গবিভাগের প্রধান এই কারণ যে, প্রশাসনিক সে ব্যাপারে দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। বঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি আয়তনে এত বড় ছিল যে, এক ব্যক্তি বা একক প্রশাসনের পক্ষে এর প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা ছিল অসম্ভব। এই প্রেক্ষাপটেই এই বিশাল প্রদেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং ১৯০৫ সালে এই বিভাগ সম্পন্ন করা হয়। চীফ কমিশনারের অধীনস্থ আসামসহ বঙ্গের ১৪টি জেলা ও ২টি দেশীয় রাজ্য নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। অন্যদিকে বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বিহার ও উড়িষ্যাকে যুক্ত করে গঠিত হয় অপর প্রদেশ।

২. বঙ্গ বিভাগের পেছনে রাজনৈতিক কারণও যুক্ত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। তাদের মতে, পূর্ব বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করে মধ্যবিত্ত মুসলমানদের জন্য চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু কিছু সুবিধা দেয়া ছিল এর লক্ষ্য। ১৯০৪ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি লর্ড কার্জন ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বক্তৃতা দানকালে বলেন, 'বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের এমন এক ধরনের ঐক্য প্রদান করবে যা পুরাতন মুসলমান ভাইসরয় ও রাজাদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তারা লাভ করেনি'।

www.pathagar.com

১৯০৫ সালে বঙ্গ সরকারকে লিখিত এক পত্রে ভারত সরকার এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, বঙ্গভঙ্গের যে পরিকল্পনা তারা করছে তাতে ঢাকা 'একটি প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা পাবে, যেখানে মুসলমান স্বার্থ শক্তিশালীভাবে প্রতিনিধিত্ব পাবে, এমন কি প্রাধান্য থাকবে।'

এই দু'টি বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, পূর্ব বঙ্গের মুসলমানদের কিছু সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার প্রদানের সদিচ্ছাও শাসকদের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার পেছনে ছিল। অবশ্য এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ গঠিত হলে অনিবার্যভাবে এ অঞ্চলের মানুষ আগের তুলনায় বাড়তি কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবে- এটাই স্বাভাবিক। এখানে বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে, তারও কারণ অনুধাবন করা যায়। পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, পূর্ববঙ্গসহ গোটা বঙ্গের মুসলমানেরা ব্রিটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। বঙ্গের মুসলমানরা সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত একটানা ১শ' বছর সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। সিপাহী বিপ্লবোত্তরকালে সংগ্রামের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। সশস্ত্র লড়াইয়ের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ অনুসৃত হয়। এই পর্যায়ে বঙ্গের মুসলমানরা সুবিচার সাম্য ও ন্যায্য অধিকার দাবি করতে থাকে। মুসলমানদের এই নমনীয় মনোভাব শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সহায়তা করে। তারাও মুসলমানদের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে এবং দাবি-দাওয়া ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিছুটা হলেও এগিয়ে আসে। এই প্রেক্ষাপটেই লর্ড কার্জনের বক্তব্য কিংবা ভারত সরকারের চিঠিতে বর্ণিত উক্তিটি বিচার্য।

বলা বাহুল্য, ঐ বক্তব্য ও চিঠিতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কথা উল্লেখ করা হলেও একথা কোথাও বলা হয়নি যে, পূর্ববঙ্গ কিংবা নতুন প্রদেশভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানরা নতুন প্রদেশে সৃষ্ট সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হবে। ব্রিটিশ শাসনে পূর্ববঙ্গের মতো আসামও ছিল অবহেলিত ও পশ্চাদপদ। [illegible]সংখ্যার দিক দিয়ে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের মিলিত সংখ্যার চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৫০ লাখ বেশি। পূর্ববঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দুর সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। তারাও ছিল মুসলমানদের মতোই শোষিত, বঞ্চিত, দারিদ্র্য পীড়িত এবং অবহেলিত। সে সময় বঙ্গ ও আসামে নমঃশূদ্রদের সংখ্যা ছিল ২০ লাখ। পূর্ববঙ্গের হিন্দু কৃষককুলের মধ্যে এরা ছিল ৯০ শতাংশ। এরাসহ নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। কাজেই, একথা বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনায় শুধু মুসলমান নয়, পূর্ববঙ্গের বেশির ভাগ মানুষের সুদিনের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। শুধু সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী নয়, পূর্ববঙ্গের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও বিকাশের সম্ভাবনায় মুসলমান জমিদার এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও এই বিভাগ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কাজেই একথা ঢালাওভাবে বলা হয়তো ঠিক নয় যে, কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কিছু সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বঙ্গভঙ্গের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিল। বরং একথা বলাই সঙ্গত যে, পূর্ববঙ্গের অবহেলিত ও পশ্চাদপদ জনমণ্ডলীর কিছু সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি আনুগত্য প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য এর পেছনে ছিল। এটা শাসকদের প্রশাসনিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল বলেই মনে হয়। বাঙালী মধ্য শ্রেণীর সম্প্রসারণ ও ক্ষমতাকে খর্ব করা বঙ্গভঙ্গের অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল বলে বলা হয়ে থাকে। এর স্বপক্ষে লর্ড কার্জনের ১৯০৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত একটি বক্তব্যকে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থিত করা হয়। কার্জন বলেন,

www.pathagar.com

'বাঙালীরা যারা নিজেদেরকে একটি জাতি হিসেবে চিন্তা করতে ভালবাসে এবং যারা এমন এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে যেখানে ইংরেজদের বিতাড়িত করে একজন বাঙালী বাবু কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে অধিষ্ঠিত হবে। তারা অবশ্যই সেই ধরনের ভাঙনের বিরুদ্ধে তিক্ত মনোভাব পোষণ করে যা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে বাধাস্বরূপ। এখন তাদের চিৎকারের কাছে নতি স্বীকার করার মতো দুর্বল হয়ে পড়লে আমরা আর বাঙ্গলাকে বিভক্ত অথবা ছোট করতে সক্ষম হব না এবং তার দ্বারা আপনারা ভারতের পূর্বদিকে এমন একটা শক্তিকে জমাটবদ্ধ ও কঠিন করবেন যে শক্তি ইতোমধ্যেই অপ্রতিরোধ্য হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার উৎস হিসাবে বিরাজ করবে।'

লর্ড কার্জন এখানে যে বাঙালী জাতির কথা বলেছেন তারা যে, বাবু বা হিন্দু বাঙালী জাতি- তাতে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাঙালী বর্ণহিন্দুর যে জাতীয়তাবাদী জাগরণ ঘটে, এই 'জাতি' সেই জাগরণের ফল। উল্লেখ্য যে, এই জাতি চেতনা মূলত ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী এবং উচ্চবিত্তের বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই জাগ্রত হয়েছিল। শাসকদের বিশেষ আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এই মধ্য ও উচ্চশ্রেণী গড়ে উঠেছিল। রাজ্যহারা, ক্ষমতা বঞ্চিত, আর্থিক ও সামাজিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে নিরাপোষ মুসলমানদের মোকাবিলায় এই দু'শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। শাসকদের সীমাহীন বিদ্বেষ ছিল মুসলমানদের প্রতি। এই দু'শ্রেণীরও অনুরূপ বিদ্বেষ ছিল। এই নব্য বাঙালীরা মুসলমানদের বাঙালী বলে স্বীকার করতে চাইতো না। বাঙালী মুসলমানেরা তাদের চোখে নিতান্তই ছিল মুসলমান। তারা কেবল মুসলমানদের বাঙালিত্বই অস্বীকার করতো না, এদেশের ওপর তাদের জন্মগত অধিকারকেও অস্বীকার করতো। তারা বলতো, মুসলমানরা বহিরাগত। তারা কেবল হিন্দুদেরকে এদেশের ভূমিপুত্র বলে অভিহিত করতো। এই উগ্র বর্ণহিন্দুরা সর্বক্ষেত্রে শাসকদের আনুকূল্য পেত। কারণ, উভয়েরই একমাত্র প্রতিপক্ষ ছিল মুসলমানরা। এদের এই একাট্টা ও গলাগলিভাবে কিছুটা চিড় ধরে যখন মুসলমানদের মধ্যও একটি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে এবং মুসলমান জমিদার ও বিত্তশালীরা (যাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না) মুসলিম জাগরণে নিজেদের নিয়োজিত করে এবং নাগরিক হিসেবে শাসকশ্রেণীর কাছে মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া পেশ করতে থাকে। শাসকশ্রেণীও লক্ষ্য করে, মুসলমানরা আর আগের মতো নিরাপোষ অবস্থানে নেই। এতে তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং মুসলমানদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা দানের কিছু কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হতে থাকে। তীব্র মুসলিম বিদ্বেষী বর্ণহিন্দু বাঙালীরা এর ফলে শাসকশ্রেণীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। শাসকদের সঙ্গে এদের মধুচন্দ্রিমার দিন এ ভাবেই কমে আসে।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত লর্ড কার্জনের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটা বিরাট সত্য বেরিয়ে এসেছে। তার কথা থেকে বোঝা যায়, গোটা বঙ্গের ওপর একচ্ছত্র হিন্দু (যা মূলত বর্ণহিন্দু) আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষী ছিল নব্য বাঙালীরা। এতে বিশেষভাবে মুসলমান ও অ-বর্ণহিন্দুদের আর একটি নাগপাশে বন্দী হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এটা অন্যদিক দিয়ে শাসকদের জন্যেও বিরাট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বঙ্গ বিভক্ত হলে এই নবোত্থিত শক্তি খর্ব হবে এবং বঙ্গের একটি অংশ এদের থাবার বাইরে চলে যাবে, এ রকম ধারণা তাই অমূলক নয়। শাসকদের এই স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মুসলমানদের কিছু কল্যাণ করার সদিচ্ছা এখানে একাকার হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। তাই একথা নির্বিচারে বলা ঠিক নয় যে, 'বাঙালী জাতির' বিভক্তির মাধ্যমে এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা জানিয়ে দিয়ে বঙ্গে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী

www.pathagar.com

করার জন্যেই বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি ব্রিটিশ শাসন রক্ষা বা স্বার্থ উদ্ধারের কার্যকর উপায় ছিল। একথা অস্বীকার না করেও বলা যায়, বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রে এটাই বড় কারণ ছিল না। নব্য বাঙালীদের আগ্রাসী মনোভাব থেকে বঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর বৃহদংশকে রক্ষা করার একটা মনোবৃত্তিও হয়তো এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। আগেই বলা হয়েছে, নব্য বাঙালী জাতির মধ্যে মুসলমানদের কোনো স্থান ছিল না। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির কথা যদি আগে তবে বলতে হবে। এ জন্য শাসকরা যতটা দায়ী তার থেকে অনেক বেশি দায়ী ছিল। নব্য বাঙালীরা। এরা কতটা মুসলিম বিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে তাদের ব্যাপক ভিত্তিক অংশগ্রহণে ও তৎপরতায়।

লর্ড কার্জনের কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উন্নতি-অগ্রগতির বিষয়টি বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় বিবেচনা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকরা তাদের শাসনকে মুসলমানদের কাছে মুসলিম শাসনের সমতুল্য করতে চেয়েছিল। একে ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখা উচিত। অথচ দেখা হয়ে থাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে। এর ভেতর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিষ্কার করা হয় যা ঠিক নয়।

৪. প্রশাসনিক কারণই বঙ্গভঙ্গের প্রধান কারণ ছিল। 'নিঃসন্দেহে একথাও বলা যায় যে, এর সঙ্গে রাজনৈতিক কারণ যেমন ছিল তেমনি ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, যোগাযোগ, বিচার, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণও। কেননা, এগুলো প্রশাসন- নিরপেক্ষ নয়। একের সঙ্গে অন্যান্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ওতপ্রোত।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অবহেলিত ও পশ্চাদপদ এলাকাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দু'টি এলাকা একটি আলাদা প্রশাসনিক এখতিয়ারে আনা হলে এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে প্রশাসনের অধিক মনোযোগী হওয়া সম্ভব হবে। এ রকম ধারণা ও লক্ষ্য থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক। সুষ্ঠু প্রশাসন এবং সর্বত্র শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে প্রশাসনকে জনগণের অধিকতর নিকটবর্তী করার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শাসকশ্রেণীর এটা মনে করাই সঙ্গত যে, নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন দূরবর্তী এলাকায় আইন-শৃঙ্খলার অবনতিশীল পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে। পাট এবং চা ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রধান অর্থকরী ফসল। অথচ এর সুফল থেকে বঞ্চিত ছিল এই দু'অঞ্চলের লোক। পাট ও চা রফতানির আয় এবং দু'অঞ্চলের রাজস্বে সমৃদ্ধ হয়েছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। নতুন প্রদেশে এই আয়-রাজস্ব ব্যয়িত হলে এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে নবদিগন্তই উন্মোচিত হবে না, সরকারের আয়-উপার্জনও বৃদ্ধি পাবে-একথাও শাসকদের ভাবনার বাইরে থাকার কথা নয়। কলকাতা বন্দরই ছিল তখন আমদানি-রফতানির প্রধান বন্দর। যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়নে নজর দেয়া হয়নি। নতুন প্রদেশে প্রধান বন্দর হবে চট্টগ্রাম এবং তার স্বাভাবিক উন্নয়নও ঘটবে। এতে শাসকরা বিশেষভাবে লাভবান হবে। এটা তাদের না বোঝার কিছু ছিল না। প্রশাসনিক অর্থনৈতিক, ও অন্যান্য কারণে শিক্ষা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, বিচার, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদিরও স্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটবে। এসবের মধ্য দিয়েই সম্ভব হবে একটি উন্নততর শাসন এ অঞ্চলের জন্যে উপহার দেয়া। মুসলমান শাসকদের সমতুল্য শাসন উপহার দেয়া যে জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নয়নের মাধ্যমেই সম্ভব- সে কথা শাসকদের অজানা ছিল না।

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া ঃ এক

দু'চারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া পূর্ববঙ্গের সর্বস্তরের মুসলমান বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও তাদের সঙ্গে শামিল হয়। তারা বঙ্গবিভাগকে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন-অগ্রগতির আলোকবর্তিকা হিসেবে বিবেচনা করে। শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলা অবসানের উপায় হিসেবে গণ্য করে। উল্লেখযোগ্য যে সব কারণে বঙ্গভঙ্গ তাদের কাছে স্বাগত ও অভিনন্দিত হয় সেগুলো হলো-

১. একদা মুসলমানরাই এ অঞ্চলের শাসক ছিল। নতুন প্রদেশ গঠন পুনরায় তাদের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তারা এতে অনুপ্রাণিত হয়। দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ প্রশাসনে তাদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। শাসন ও সমাজ নিয়ন্ত্রণে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিও সংহত হবে বলে তারা মনে করে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ বাড়বে এবং এক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন ধারণা সঙ্গত কারণেই তাদের মনে জাগ্রত হয়।

২. সকল অধিবাসীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। সবচেয়ে বড় কথা, দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে। পাট ও চা চাষ বাড়বে। এ অঞ্চলে পাট শিল্প এবং আরও চা শিল্প গড়ে উঠবে, কর্মসংস্থান বাড়বে। প্রদেশের আয় প্রদেশে ব্যয়িত হলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত ঘটবে। চট্টগ্রাম বন্দর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হবে। আমদানি-রফতানি সহজতর হবে। বন্দরকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নতুন প্রবাহ। সেখানে কর্মসংস্থানও বাড়বে। এছাড়া প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। কৃষি যেহেতু এ প্রদেশে প্রধান জীবিকা, সুতরাং জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষির উন্নয়ন সাধনেও শাসক শ্রেণী মনোযোগী হবে।

৩. অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে অনিবার্যভাবে রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে কি বিপর্যয়কর অবস্থা তখন ছিল একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। ঢাকা থেকে কলকাতার দূরত্ব ২৬৪ মাইল। এ দূরত্ব অতিক্রম করতে তখন ট্রেনে লাগতো ২৪ ঘন্টা। কলকাতা থেকে বিকেলের ডাকে একটি চিঠি লিখলে বেনারস পৌঁছুত পরদিন ৯.১৫ মিনিটে। এলাহাবাদ পৌঁছুত পরদিন ৯.১৫ মিনিটে। এলাহাবাদ পৌঁছত পরদিন দুপুর ১২টায়। এই চিঠিই চট্টগ্রাম পৌঁছত এরও পরদিন ভোর ৬.১৫ মিনিটে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন ছিল, এথেকেই আন্দাজ করা যায়।

৪. যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে প্রশাসনিক সুবিধাদি দ্রুত পাওয়া যাবে এবং আইন, শৃঙ্খলার উন্নয়ন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সহজ হবে।

৫. নতুন প্রদেশে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, শিক্ষার সুযোগ বাড়বে। এতে এতদিন শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষ আরও শিক্ষিত হয়ে ওঠার সুবিধা পাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গের শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় এবং তার দ্রুত সুফল পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, '১৯০৬ সাল থেকে এ প্রদেশ বেশ অগ্রসর হয়। সে বছর পূর্ববঙ্গ ও আসামে কলেজ ছাত্রসংখ্যা ছিল এক হাজার ছয়শ' আটানব্বই জন এবং কলেজ শিক্ষায় ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল এক লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশ' আটান্ন টাকা। বর্তমানে একই সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'হাজার

www.pathagar.com

পাঁচশ' ষাট এবং ব্যয় হয়েছে তিন লাখ তিরাশি হাজার ছয়শ' উনিশ টাকা।' শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়।

৬. অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পূর্ববঙ্গে ও আসামে জনস্বাস্থ্য ছিল মারাত্মকভাবে অবহেলিত। এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, নতুন প্রদেশে এদিকে নজর দেয়া হবে। হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় গড়ে উঠবে এবং সাধারণ মানুষ সহজে চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতে পারবে। অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠবে।

৭. বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনায় নতুন হাইকোর্ট স্থাপনের বিষয়টি অনুল্লেখিত থাকলেও একথা অনুমান অসাধ্য নয় যে, ঢাকায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হতো, যত বিলম্বই হোক। ঢাকায় হাইকোর্ট হবে এবং এ অঞ্চলের নিম্ন কোর্টগুলো এর আওতায় আসবে। ফলে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং বিচার প্রাপ্তি আরও সহজ হবে।

এসব কারণ গভীরভাবে বিবেচনা করলে এটা স্পষ্টত অনুধাবন করা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের পেছনে শাসকদের উদ্দেশ্য যা-ই থাক, পূর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণের জন্যে এটা ছিল তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের দ্বারোদঘাটনকারী বিপুল সম্ভাবনাময় একটি ঘটনা। এই ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস জাগরণে বিরাট ভূমিকা রাখে। বঙ্গভঙ্গের অন্যতম প্রধান সমর্থক নবাব সলিমুল্লাহর ভাষায় ঃ

'বিভক্তি আমাদেরকে জাগরিত করেছে এবং আমাদের দৃষ্টি কাজকর্ম ও সংগ্রামের দিকে নিবদ্ধ করেছে।'

যেদিন বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর হয়, সেদিন মুন্সীগঞ্জের এক জনসমাবেশে নবাব সলিমুল্লাহ এই মন্তব্য করেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন, পরবর্তীতে তাদের বেশিরভাগই এর সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিক্রিয়া-দুই

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদানের আগে এবং পরে এর বিরুদ্ধে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত বর্ণ হিন্দু মধ্য শ্রেণী এবং বিত্তশালীরা (যাদের অধিকাংশের জমিদারী ছিল পূর্ববঙ্গে) সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করে এবং সর্বপ্রচার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। মূলত এরা তারাই, তথাকথিত হিন্দু জাতীয়তাবাদী জাগরণের মাধ্যমে যাদের উদ্ভব ঘটেছিল। একথা আগেই বলা হয়েছে, এরা ছিল ঘোর মুসলিম বিদ্বেষী এবং আগ্রাসী মনোভাবসম্পন্ন। যেসব কারণে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করা হয় সেগুলো হলো ঃ

১. কলকাতা কেন্দ্রিক তথাকথিত নব্য বাঙালীদের গোটা বঙ্গে শাসন ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অভিলাষ এতে ব্যাহত হবে। পূর্ববঙ্গ তাদের আওতার বাইরে চলে যাবে। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতা সংহত হবে। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতি হবে এবং তারা সকল ক্ষেত্রে তাদের সমপর্যায়ে চলে যাবে। তারা এই মর্মে প্রচার শুরু করে যে, বঙ্গ হলো বঙ্গমাতা, তার বিভক্তি তার অঙ্গচ্ছেদের-ই তুল্য। বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে বঙ্গভঙ্গবিরোধী মনোভাব জাগ্রত করার জন্যে এরা বঙ্গকে কালী মাতার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করে। বঙ্গভঙ্গ রোধ করা গেলে কালী মাতার মর্যাদা রক্ষা হবে, এ রকম একটা আবেগ হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

২. বাংলা ভাষাভাষীরা বিভক্ত হবে। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে গোটা বঙ্গে হিন্দু জনগোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হওয়ার সুবাদে সর্বক্ষেত্রে তাদের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল বিভক্তির ফলে তা খর্ব হবে এবং তাদের অবস্থান হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। পূর্ববঙ্গ ও আসামে বৈরি মুসলমানদের আধিপত্য কায়েম হবে। আসামীদের অবস্থানও দৃঢ় হবে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বাঙালী হিন্দুদের স্বার্থ বিহারী ও উড়িষ্যাদের দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে।

৩. তৎকালীন কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অর্থনীতির পশ্চাদভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ। পাট ও চা-কেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং পূর্ববঙ্গের রাজস্ব আয়ের ওপর কলকাতা সমৃদ্ধ হয়েছিল। পূর্ববঙ্গ ও আসামে পাট ও চা এলাকা পড়ায় কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গে পাট ও চা শিল্প বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে- এটা ছিল অবধারিত। পূর্ববঙ্গের পাট, আসামের চা এবং রাজস্ব আয় কলকাতায় যা পশ্চিম বঙ্গে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে সেখানকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও রমরমা অবস্থা চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হবে।

৪. আমদানি-রফতানির কাজে কলকাতা বন্দরই ছিল সবেধন নীলমনি। নতুন প্রদেশে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি হলে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে। এর ফলে কলকাতা বন্দর-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম কিছুটা হলেও মুখ থুবড়ে পড়বে এবং কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে।

৫. কলকাতা ছিল প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র। গোটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি শাসিত হতো কলকাতা থেকে। সবকিছু কলকাতামুখী। পূর্ববঙ্গও আসাম প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করা হয় প্রাচীন রাজধানী নগরী ঢাকায় ও সঙ্গত কারণেই এতে ঢাকায় নতুন প্রদেশের প্রশাসনসহ সকল প্রকার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার দ্রুত উন্নতি ঘটবে। নতুন প্রদেশ হবে ঢাকামুখী। এর ফলে কলকাতার এতদিনের মর্যাদা ও গুরুত্ব খর্ব হবে। কলকাতার বিপরীতে গড়ে উঠবে ঢাকা এবং অতঃপর শুরু হবে দুই নগরীর প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় সুদূর ভবিষ্যতে কলকাতার হার হওয়ার আশঙ্কা ছিল প্রবল এবং যেহেতু ঢাকার উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটবে মূলত একটি মুসলিম নগরী হিসেবে। সুতরাং ব্রিটিশ কোম্পানি শাসক ও তাদের অনুগ্রহ ভাজনদের দ্বারা গড়ে ওঠা কলকাতার প্রাধান্য হারানোর আশঙ্কা হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের পক্ষে মেনে নেয়া ছিল অসম্ভব।

৬. নতুন প্রদেশে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে, শিক্ষার সুযোগ বাড়বে এবং নতুন উদ্যামে এর অধিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসবে। এর ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসামে শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম অবহেলিত জনগোষ্ঠী দ্রুত শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এরাই এই প্রদেশে সরকার চাকরি-বাকরির সুযোগ পাবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাবে এবং আইন ব্যবসা ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হবে। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যশ্রেণী ও বিত্তশালীদের সন্তান-সন্ততিদের এসব ক্ষেত্রে এতদিন যে অগ্রাধিকার ও আধিপত্য ছিল তা খর্ব হবে।

৭. কলকাতায় ছিল হাইকোর্ট। এর অধিকাংশ আইনজীবী ছিলেন হিন্দু। তারা সেখানেই স্ব-পেশায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট হলে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা ব্যাহত হবে। পূর্ববঙ্গ ও আসাম থেকে যে, সব মামলা কলকাতায় যেতো তা বন্ধ হবে এবং তার স্থলে ঐসব মামলা যাবে ঢাকা। ফলে তাদের পেশায় মন্দা দেখা দেবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই পেশায় তাদের প্রতিযোগীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। ঢাকায় তারা আসতে রাজি ছিল না এবং এলেও ভবিষ্যতে সুবিধা না করতে পারার আশঙ্কা ছিল।

www.pathagar.com

৮. অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো কলকাতা থেকে। এদের মালিক ছিলেন ব্যতিক্রম বাদে সবাই হিন্দু। তথাকথিত হিন্দু জাগরণে এসব সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। নতুন প্রদেশ হওয়ায় এদের সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা কমে যাবে। ব্যবসা ও লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে-এ আশঙ্কা অনুধাবন করে সংবাদপত্রের মালিকরা। দ্বিতীয়ত ঢাকাকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র প্রকাশের একটি নবধারার সূত্রপাত হবে। এসব সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়েও তাদের মধ্যে শঙ্কা-সংশয় ছিল।

৯. বাংলা সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। অগ্রসর সম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুদেরই ছিল এই সাহিত্যে একাধিপত্য। বাংল ভাষাভাষীদের মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বাংলা সাহিত্যে তাদের জীবনচিত্র ও আশা-প্রত্যাশার কোনো স্থান ছিল না। সংবাদপত্রের মতো বাংলা সাহিত্যেও মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সে সময় মুলমানেরাও বাংলা সাহিত্যে একটি নবধারা সৃষ্টিতে তৎপর। এরও কেন্দ্র ছিল কলকাতা। নতুন প্রদেশ হলে বাংলা সাহিত্যের আর একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে ঢাকা এবং মুসলমানদের সৃষ্ট নবধারা এখান থেকে বিকাশ লাভের সুযোগ পাবে-এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। এতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কলকাতার আধিপত্য হ্রাস পাবে এবং সেখানকার লেখক ও বই ব্যবসায়ীদের বই ব্যবসা সঙ্কুচিত হবে। আরও বড় কথা, এই সুযোগী নবধারার বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের জীবন চিত্র ও আশা-প্রত্যাশাই স্থান লাভ করবে না। মুসলিম জাতীয়তাবাদও এর ফলে নতুন গতিবেগ লাভ করবে। বঙ্গে বর্ণহিন্দু স্বার্থ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে এটা হবে একটা বড় বাধা।

১০. পূর্ববঙ্গের জমিদারদের বড় অংশই ছিলো হিন্দু। অর্থে শুধু নয়, শিক্ষা-দীক্ষার দিক দিয়েও এরা ছিল অগ্রসর। এদের প্রায় সকলেরই স্থায়ী ঠিকানা ছিল কলকাতায়। সেখানে অনেকের ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল। কালেভদ্রে তারা জমিদারী এলাকায় ভ্রমণ করতো। প্রধানত নায়েক-গোমস্তারাই জমিদারী পরিচালনা করতো। আয়-রোজগার বেশির ভাগই চলে যেতো কলকাতায়। তারা সেখানে অত্যন্ত বিলাসী জীবনযাপন করতো। এই বিলাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল নানা অনাচার। নতুন প্রদেশ হওয়ায় তাদের এই সুখ ও ভোগের জীবনে আশঙ্কার কালো ছায়া দেখা দেয়। এক প্রদেশে জমিদারী পরিচালনা করা ভবিষ্যতে কঠিন হয়ে উঠতে পারে, এ শঙ্কা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। জমিদারী এলাকায় কিংবা নতুন প্রদেশের রাজধানীতে আসতে তারা রাজি ছিল না। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে জমিদারী নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে কিংবা জমিদারী হারানোর মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে-এরূপ ভীতিও তাদের মধ্যে দেখা দেয়।

১১. বড় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারী ছিল হিন্দুরা। গোটা বঙ্গে এদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কেন্দ্র ছিল কলকাতা। নতুন প্রদেশ সৃষ্টির কারণে এই ব্যবসা-বাণিজ্য আলাদা হয়ে যাবে, তারা বঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে- এ রকম ধারণা মোটেই অমূলক ছিল না। ব্যবসা কেন্দ্র কলকাতা থেকে ঢাকা বা চট্টগ্রামে আনতে তাদের ঘোর অনীহা ছিল।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন

কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদী-মহল, যাদের মধ্যে, রাজনীতিক, চাকরিজীবী, শিক্ষক ও শিক্ষিত শ্রেণী, উকিল, মোক্তার, সংবাদপত্র মালিক ও সাংবাদিক, সাহিত্যিক, জমিদার, ব্যবসায়ী ছিল-সবাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এবং এই বিভাগ রহিত করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। তারা এমনিতেই ছিল বিভিন্নভাবে সংগঠিত, তাদের অর্থবিত্তের অভাব ছিল না, সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা ছিল এবং প্রচার-প্রচারণার উপায়-উপকরণও তাদের হাতেই ছিল। বঙ্গভঙ্গের পক্ষের শক্তির এর প্রায় কোনোটাই ছিল না। ফলে, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা জনসমক্ষে প্রকাশিত (১৯০৩) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শুরু হয়। বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ও ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। সংবাদপত্রে লিখে, জনসভা করে, কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে ও প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এসব প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই বঙ্গভঙ্গের চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়। বঙ্গভঙ্গ যে-সব শ্রেণীকে সরাসরি আঘাত করে, তারা প্রায় সবাই ছিলো কংগ্রেসের নেতা, সদস্য বা সমর্থক। ফলে, অচিরেই বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন কংগ্রেসের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। গোটা বঙ্গেই কংগ্রেসের শক্তিশালী সংগঠন ছিল। কংগ্রেসের সকল পর্যায়ের শাখা সংগঠন থেকেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা কার্যকর হওয়ার আগেই স্বদেশী আন্দোলনের নামে বিদেশী পণ্য বর্জন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসহযোগিতা প্রদর্শনের কর্মসূচী নেয়া হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল, শাসক শ্রেণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে বঙ্গ বিভাগ কার্যকর করা থেকে তারা বিরত থাকে। এছাড়া চলমান আন্দোলনকে একটি ধর্মীয় আন্দোলনে রূপ দেয়ার মাধ্যমে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের প্রয়াসও চালানো হয়।

১৯০৫ সালের জুলাই থেকে মৌখিক প্রতিবাদের বদলে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিরোধ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। সরকারী কর্মচারীদের চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়ার কথা বলা হয়, বলা হয় বিলেতী দ্রব্য বর্জন করতে। স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার এবং জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করে। এই আন্দোলনের যারা উদ্যোক্তা ছিলেন, তাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের সমর্থন করেন কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যরা। পরে গোটা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

এই স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুদের ধর্মীয় আন্দোলনে রূপ নেয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতে, স্বদেশীবাদ একটি ধর্মীয় আন্দোলনের চেতনা জাগরিত করে। এটা হিন্দুদের ধর্মের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯০৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মহালয়া দিবসে পূজার আগে হাজার হাজার হিন্দু কলকাতার কালী মন্দিরে সমবেত হয়। দেবী কালীকে মাতৃভূমির অবতার হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং পুরোহিত স্বদেশী শপথ পরিচালনা করেন। শুধু তা-ই নয়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধীরা 'বন্দে মাতরমকে' তাদের জাতীয় স্লোগান ও জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করে। এই স্লোগান ও সঙ্গীতটি নেওয়া হয় বঙ্কিম চন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' উপন্যাস থেকে। ১৭৭০ দশকের বাংলার মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে আনন্দমঠ রচিত। উপন্যাসটি তীব্র মুসলিম বিদ্বেষে পূর্ণ। গোটা বঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই স্লোগান ও সঙ্গীতকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বর্ণহিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদী মহল বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা বা বিভক্তি রোধ করতে গিয়ে তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই আন্দোলনের কর্মসূচীতে বিলেতী পণ্য বর্জন এবং দেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের কথা থাকায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়দের কাছেই এটি গ্রহণীয় ও সমর্থনযোগ্য হওয়ার কথা। শুরুতে সে লক্ষণ দেখাও গিয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনকে হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে রূপান্তরিত করায় হিন্দু বাদে আর সকল এ থেকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। স্বদেশীদের কাছে স্বদেশ মানে হিন্দুর স্বদেশ। এটা অন্যান্যের পক্ষে বিশেষত মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। যেহেতু

www.pathagar.com

স্বদেশী আন্দোলন কংগ্রেসেরই আন্দোলন, সে কারণে কংগ্রেসকেও আস্থায় নেয়া মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন শুরুতে সংবাদপত্রে লেখালেখি, প্রচারপত্র বিতরণ এবং জনসভার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও অচিরেই তা 'মিশনারী তৎপরতায়' পর্যবসিত হয়। স্বেচ্ছাসেবীদের দল গঠিত হয়। এরা গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে উদ্ভাবিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রচার-প্রচারণায় নিয়োজিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিলেতী পণ্য বর্জন বা বিক্রি বন্ধে জোর-জবরদস্তিরও আশ্রয় নেয়া হয়। শুধু তাই নয় যেহেতু এই আন্দোলনের সঙ্গে মুসলিম বিদ্বেষ বা মুসলিম বিরোধিতাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং কোনো কোনো এলাকায় হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনাও দেখা দেয়। হিন্দুদের মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। কংগ্রেস এই আন্দোলনের চালিকাশক্তি হওয়ায় কংগ্রেসের চরিত্রও সাম্প্রদায়িক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বা স্বদেশী আন্দোলনে যত সভা-সমাবেশ হয় তার সবই হয় কংগ্রেসের আয়োজনে ও কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কলকাতা ও ফরিদপুরে কেবল জনসভাই হয় প্রায় ৭শ'র মতো। অন্য এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অন্তত ৩ হাজার সভা হয়।

হিন্দুর স্বদেশ ও স্বধর্মীয় এ আন্দোলন বঙ্গের বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং এতে বর্ণহিন্দুদের প্রতি তাদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায় এবং একই সঙ্গে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের মনে জাগ্রত হয়। পরবর্তীতে তা আরও বৃদ্ধি পায় ও সুদৃঢ় হয়।

যা হোক, এই স্বদেশী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আন্দোলন সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা কার্যকর করে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বঙ্গে বর্ণহিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের মধ্যে যারা উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ও চরম পন্থার অনুসারী ছিল তারা তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপুষ্ট সন্ত্রাসী আন্দোলনের জন্ম দেয়। নিয়মতান্ত্রিক পথে বা মধ্যপন্থী অনুসারে বঙ্গভঙ্গ রদ করা যে সম্ভব হবে না- এটা অনুধাবন করে তার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯০৭ সালে সন্ত্রাসবাদের অন্যতম প্রবক্তা বারীন ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষ সন্ত্রাসবাদী তথাকথিত বিপ্লবকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেন। সন্ত্রাসবাদী সমিতিগুলো কালী দেবীকে বিপ্লবের দেবী হিসেবে গ্রহণ করে। কালী মূর্তির সামনে সন্ন্যাসীবাদে উদ্দীপ্ত নতুন সদস্যদের শপথ নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্ধারণ করা হয় ব্রিটিশ ও মুসলিম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। এছাড়া ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করাও এদের কার্যক্রমের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতিগুলোতে মুসলমানদের কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। আরও স্মরণীয় যে, উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন সন্ত্রাসবাদের আদিগুরু। ফলে, হিন্দু ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদই ছিল এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মূল কথা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বদেশী আন্দোলন ছিল কংগ্রেসেরই আন্দোলন। তার বিকল্প বা সম্পূরক আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও ছিল মূলত কংগ্রেসী আন্দোলন। আর কংগ্রেস ছিল গোটা ভারতব্যাপী একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। ফলে, বঙ্গের এই উগ্র বর্ণহিন্দুবাদী স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গোটা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

ফলাফল

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর 'দিল্লী দরবার' নামে খ্যাত এক সমাবেশে স্বয়ং ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ এক ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রহিত করেন। এই ঘোষণায় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরসহ আর একবার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক বিন্যাস সাধন করা হয়। সম্রাট তার ঘোষণায় বলেন ঃ

'আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের জনগণের নিকট ঘোষণা করছি যে, মন্ত্রী বর্গের সুপারিশ অনুযায়ী এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের পরামর্শমত আমরা ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরের এবং তৎসঙ্গে এই স্থানান্তরের ফলশ্রুতি হিসেবে যত শীঘ্র সম্ভব বাংলা প্রেসিডেন্সির জন্য একটি সপরিষদ গভর্নরের পদ সৃষ্টি, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার সন্নিহিত এলাকাসমূহের জন্য একটি সপরিষদ লেঃ গভর্নরের পদ সৃষ্টি এবং আসামের জন্য একটি চীফ কমিশনারের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব সীমানা পুনর্বিন্যাস ও প্রশাসনিক পরিবর্তন আমাদের প্রিয় জনগণের আরও ব্যাপক উন্নতির সূচনা করবে।'

এই হলো বঙ্গভঙ্গের পরিণতি কিংবা পরিণতি ফল। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ও তার ভারতীয় প্রশাসন উচ্চবর্ণের উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠী সৃষ্ট আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে। এই ঘোষণা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের বিজয় ঘোষণা করে। যেহেতু আন্দোলন বর্ণহিন্দুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই পরিচালনা করে। সুতরাং এটি কংগ্রেসেরও একটা বিরাট রাজনৈতিক বিজয় হিসেবে প্রতিভাত হয়। 'বঙ্গভঙ্গ রদ' অন্যার্থে হিন্দুর সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর আপোস রফার ফল। পরাজয় হয় তাদের, যারা বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে যারা তাদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিল, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়েছিল, পূর্ববঙ্গের সেই মুসলমান ও অ-বর্ণহিন্দুরা হয়েছিল হতাশ, নিরাশ এবং বিক্ষুব্ধ। একটা বিশাল সম্ভাবনার অপমৃত্যু এবং পুনরায় সাবেক ভাগ্যবরণের বাস্তবতা তাদের হতাশ ও নিরাশ করেছিল। বিক্ষুব্ধতার কারণও এই। তারা একাধারে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল শাসকগোষ্ঠীর প্রতি এবং বর্ণহিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের প্রতি এবং অবশ্যই কংগ্রেসের প্রতিও। শাসকদের আচরণ ও কার্যকলাপকে তথা বঙ্গভঙ্গ রদকে তারা বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর হিসেবে গণ্য করেছিল। আর বর্ণহিন্দুচক্র এবং তাদের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস যে বঙ্গের মুসলিম অ-বর্ণহিন্দু ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, কল্যাণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিপক্ষ শক্তি- এই ধারণাও তাদের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েছিল।

বস্তুত এই ধারণা ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে, কংগ্রেস তার নেতৃত্বে। এ অবস্থায় বঙ্গসহ ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থের কথা তুলে ধরার জন্য যেমন একটি আলাদা সংগঠন তাদের গড়ে তোলা দরকার, তেমনি কংগ্রেসের মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক তৎপরতা মোকাবিলার জন্যও সংগঠন দরকার। সংগঠনের অভাবে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কোন শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারার ব্যর্থতা তাদের এই সংগঠন গড়ে তুলতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বঙ্গভঙ্গে পটভূমিতে ও অন্যান্য কারণে ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার ও দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং যথারীতি স্মারকলিপি প্রস্তুত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন ভারতের বিভিন্ন এলাকার ৩৫ জন নেতা। এরা ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলার ভাইসরয় ভবনে গিয়ে এই

www.pathagar.com

স্মারকলিপিসহ লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতিহাসে এটা 'সিমলা ডেপুটেশন' নামে পরিচিত। স্মারকলিপিতে তারা যে দাবী-দাওয়া পেশ করেন তার মধ্যে সামরিক, বেসামরিক ও হাইকোর্টে মুসলমানদের যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োগ, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ও সিনেটে মুসলমানদের নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের নিশ্চয়তা, প্রাদেশিক ও ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলমানদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

স্মরণযোগ্য, এই স্মারকলিপি পর্যালোচনার জন্য ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে মুসলিম নেতৃবৃন্দ লক্ষ্ণৌতে এক সভায় মিলিত হন। সেই সভায় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের পরবর্তী বার্ষিক সভায় একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করা হবে। সিমলা ডেপুটেশনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ সিমলাতেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স শেষে প্রস্তাবিত দলের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর রূপরেখা প্রণীত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক, ঢাকায় অনুষ্ঠিত মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স শেষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ৩০ ডিসেম্বর এক সভায় মিলিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নবাব ভিকারুল মূলক। তিনি সভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তার বক্তব্যের সারকথা ছিল ঃ মুসলমান জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর সঙ্গত কারণেই যারা ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ, শাসনক্ষমতা তাদের হাতেই চলে যাবে। সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা কি হবে, সেটা চিন্তার বিষয়। ঐ অবস্থায় মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি, সম্মান, ধর্ম-সব কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। ব্রিটিশ যেখানে বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিবেশীদের দ্বারা মুসলমানরা অসহায় হয়ে পড়েছে, সেখানে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে, সহজেই অনুমেয়। যে জাতি শত শত বছর পর মুসলমানদের ওপর সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিশোধ নিতে চায়। তাদের ওপর মুসলমানদের শাসনভার তুলে দিলে যে অবস্থা হবে তা ভাবা যায় না।

তার বক্তব্য তিনি মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠনের আওতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। অতঃপর ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শেষে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাব এবং হাকিম আজমল খানের সমর্থনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।

নিম্নবর্ণিত ৩টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই নতুন রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে ঃ

(১) ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের ভাব উজ্জীবিত করা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝি হলে তা দূর করা।

(২) ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণ ও সংহত করা আর তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

(৩) মুসলমানদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি যাতে কোন বিদ্বেষভাব ও উত্তেজনা দেখা না দেয়, তার ব্যবস্থা করা এবং দেখা দিলে প্রশমিত করা।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের এই শতকের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নতুন অধ্যায় সংযোজিত করে। এই নতুন রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই

www.pathagar.com

সংগঠনের মধ্য দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল ধারায় প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, এই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত মুসলিম জনমণ্ডলীর দীর্ঘ ৪ দশকেরও বেশি সময়ের আন্দোলনের ফল হিসেবে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র-স্বাধীন আবাসভূমির প্রতিষ্ঠা ঘটে। বাকী অংশ নিয়ে গঠিত হয় স্বাধীন- ভারত। ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষে এই দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক কোম্পানী ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে কংগ্রেস পুরোপুরি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রথম আন্দোলনেই 'ঐতিহাসিক' সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এই আন্দোলন চালাতে গিয়ে তার যে চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে সেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ কংগ্রেস নেতৃত্বে বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য প্রায় নিরংকুশভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এদের ভারতব্যাপী কায়েমী স্বার্থসংরক্ষণের হাতিয়ারে পরিণত হয় কংগ্রেস। কংগ্রেস হয়ে যায় ভারতীয় বর্ণহিন্দুর জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

দ্বিতীয়ত এটা নিতান্তই একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠনে পর্যবসিত হয়। এর পতাকা, স্লোগান, সঙ্গীত, উৎসব প্রভৃতি নির্ধারিত হয় চরম সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কংগ্রেস হিন্দুর সংগঠন এবং কেবল হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণই এর লক্ষ্য-এটা সুস্পষ্ট করা হয়। ভারতবর্ষে হিন্দুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

তৃতীয়ত এই সংগঠনের কার্যক্রম ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে অস্বীকার করা হয়।

চতুর্থত কংগ্রেসের নীতি-আদর্শ, কার্যক্রম ইত্যাদি মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকে বিশেষভাবে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তবে লক্ষ্য করার ব্যাপার এই যে, মুসলিম লীগ কেবলমাত্র মুসলমানদের সংগঠন হলেও, তা কংগ্রেসের মত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিল না। এ ক্ষেত্রে তারা ছিল উদার, উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলমানদের অন্যান্য জাতি-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলা এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং কোন কারণে মুসলমানরা কারো প্রতি বিদ্বেষ বিদ্বিষ্ট হলে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠলে তা দূর বা প্রশমিত করা ছিল এর অন্যতম মৌল লক্ষ্য।

বলা নিষ্প্রয়োজন, কংগ্রেস যদি বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িক, জাতি-বর্ণ বিদ্বেষী, বিশেষত মুসলিম বৈরী এবং আধিপত্যকামী সংগঠনে পরিণত না হতো, যদি সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষের অধিকার রক্ষায় ব্রতী হতো, তাদের পূর্ণ মানবিক, গণতান্ত্রিক, সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দিত এবং তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা, সদাচার ও সুনীতি প্রদর্শন করতো তবে হয়তো মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়তো না এবং ভারতের পরবর্তী ইতিহাসও অন্য রকম হতো।

পঞ্চমত প্রথম রাজনৈতিক বিজয়ে কংগ্রেসের ব্রিটিশ বিরোধিতায় কিছুটা ভাটার টান পড়লেও এর নেতৃবৃন্দ এটা বিশেষভাবে অনুধাবন করেন যে, কংগ্রেসের নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের অর্থাৎ ভারতে হিন্দুর রাজ প্রতিষ্ঠার এখনই সময়। ব্রিটিশের বিকল্প শক্তি যে কংগ্রেস, সেটা ব্রিটিশের নতি স্বীকারেই প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই ভারতে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্রিটিশ শক্তিকে সরাতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য কারণে ব্রিটিশ শক্তি তখন বেশ দুর্বল। এছাড়া

www.pathagar.com

তারা যে ভারত থেকে তাদের শাসন পর্যায়ক্রমে তুলে নিতে চায়, সেটাও স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেয়ার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণীয়।

স্বায়ত্তশাসিত বা স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসই ক্ষমতাসীন হবে। এ রকম একটা প্রত্যাশা নিয়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধিতা যত নমনীয়ভাবেই হোক বহাল রাখে। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যও বেশ কিছু উদ্যোগ-পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' 'খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন' (১৯২০–২৩) এবং 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) ইত্যাদির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এসব উদ্যোগ-প্রয়াস কংগ্রেসের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে মারাত্মক বিপর্যয়ও নেমে আসে। এই সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার আশা-প্রত্যাশার ওপর প্রচণ্ড আর একটি আঘাত আপতিত হয় নেহেরু রিপোর্ট (১৯২৯) প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ঐ রিপোর্টের পর এটা আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার দিতে কংগ্রেস বা বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ আদৌ রাজি নয়।

এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার হতে বাধ্য হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে এর রূপরেখা বর্ণিত হয়। এর পরও মুসলিম লীগ বা মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভারতের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কংগ্রেস ক্রিপস মিশন প্লান' (১৯৪৬) বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানালে বা অনীহা দেখালে স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ চূড়ান্ত করে ফেলেন।

দেখা যাচ্ছে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করে। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং একে কেন্দ্র করে মুসলমানদের জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা পায়। সঙ্গত কারণেই ১৯৪৭ সালে যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে এবং দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে, তখন ভারতে কংগ্রেস এবং পাকিস্তানে মুসলিম লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। এভাবেই ভারতের দুই বৃহত্তম সম্প্রদায়ের দুই রাজনীতি দুই দেশ ও দুই ভবিষ্যতের জন্ম দেয়। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সালে সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন- সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালে চিহ্নিত ভৌগোলিক সীমানা বা মানচিত্রই বাংলাদেশের সীমানা বা মানচিত্র হিসেবে স্বীকৃত।

www.pathagar.com

বঙ্গ ভঙ্গ, দ্বিজাতিতত্ত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা

মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

১৯০৫ সালের বংগভংগের ঘটনা ইতিহাসের একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বংগভংগ কার্যকর হবার পর তা তৎকালীন বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে যা আজও এ জনপদের জনমানসে জীবন্ত শিখা হয়ে জ্বলছে।

বৃটিশ শাসকবর্গ তথা লর্ড কার্জন দৃশ্যত প্রশাসনিক সুবিধার্থে বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেও তার ব্যঞ্জনা বাংলার অবহেলিত ও নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে হিন্দু সম্প্রদায় বংগভংগকে 'এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়' হিসেবে গণ্য করে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলো বংগভংগকে 'বাঙ্গালী জাতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র', 'মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব' 'বৃটিশদের Divide and Rule Policy' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করলেও তা ছিল স্ববিরোধী এবং রাজনৈতিক কুটচালপ্রসূত। এ বিভক্তি একই জনপদের দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তার কারণ অনুধাবনের জন্য তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা চিত্র তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় হিন্দুদের মধ্যে ধনী বনিক সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটেছিল, তারা লাভ করেছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের নেতৃত্ব। সরকারী চাকরি ও জমিদারী। বৃটিশদের আনুকূল্য ও আশীর্বাদে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়, ফলে তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এবং কোলকাতা শহর কেন্দ্রিক কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দু শোষক গোষ্ঠীর। "এই বহুমুখী দানব বৃটিশ রাজেরই সৃষ্টি। তাদের স্বার্থ রক্ষা না করে বৃটিশ সরকারের কোন উপায়ও ছিল না। বহু বর্ণ হিন্দুর জমিদারী ছিল পূর্ব বঙ্গে, কিন্তু তাদের বাসস্থান ছিল কোলকাতা। হিন্দু লেখক, গ্রন্থকার বা সাংবাদিক যারা আদিতে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কোলকাতা এসেছিলেন, তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। এদের অনেকেরই নির্ভর করতে হত সেখানকার পৈত্রিক সম্পত্তির উপর। কোলকাতা

www.pathagar.com

হাইকোর্টের আইনজীবীদের নির্ভর করতে হত পূর্ব বঙ্গের মক্কেলের উপর। সরকারী অফিস-আদালতের কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল পূর্ব বঙ্গের লোক। এছাড়াও উভয় বাংলাতেই বাঙ্গালী হিন্দুরা ছিল সংখ্যা লঘিষ্ঠ। এমনকি, পশ্চিম বাংলায়ও বাংগালী হিন্দুদের সংখ্যা বিহারী ও উড়িয়াদের তুলনায় ছিল অনেক কম। কাজেই তারা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়ে ব্রিটিশ পরিকল্পনা (বংগভংগ) বানচাল করার জন্য বদ্ধপরিকর হল।" এমতাবস্থায় বাঙ্গালী জাতি, বাংলা বিশেত জমিদার ও বুদ্ধিজীবীরা মুসলমানদের উপর তাদের এতদিনকার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব হারাবে এবং আগের মত শোষণ ও নিষ্পেষণ করা যাবে না- এ আশংকায় তারা শংকিত হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে বাংলার মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বংগভংগের ফলে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের এক সম্ভাবনায় আশান্বিত হয়ে উঠে। লর্ড কার্জন বংভংগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন, এ বিভক্তি দ্বারা পূর্বাঞ্চলের নিপীড়িত জনসাধারণের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি সরকার অধিকতর মনোযোগী হতে পারবে এবং তারা ক্রমশ পশ্চিমাঞ্চলের অধিক ভাগ্যবান ও উন্নত ভাইদের সমতুল্য হতে পারবে। এতে ভবিষ্যতে বাংলা একটি সমৃদ্ধ প্রদেশের পরিণত হতে পারবে। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বংগভংগের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জোর প্রবক্তা হয়ে যান। তিনি বলেন,

"Time world show that there had been no senerance in the seuse understood by those who opposed the cuation of the new province; no division of the Bengali speaking people, hindus or Muslims, no weakening, but on the contray, a greater development of the sister proveinces; better government better education in both; better means of intercommunication; and generally a great accession of strength to the Bengali race.

বস্তুতপক্ষে নবাব সলিমুল্লাহ ও লর্ড কার্জনের বক্তব্যই যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রথমত, ঢাকাকে পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী করার পর ঢাকার গুরুত্ব অপরিসীম বেড়ে যায়। ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্বাঞ্চলের জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আবর্তিত হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামকে বিকল্প রাজধানী ঘোষণার ফলে সমুদ্র বন্দরের কর্মকাণ্ড বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং তা এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়। নতুন প্রদেশের প্রথম বছরেই এ বন্দরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চারগুণ বেশি বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, রাজধানী ঢাকা ও বাণিজ্য কেন্দ্র চট্টগ্রামের সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নৌ ও রেলপথ সংযোগে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হয়।

চতুর্থত, নতুন প্রাদেশিক আইন সভা গঠিত হয়। ফলে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ভূমি মালিকরা পরিষদে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

পঞ্চমতঃ স্বতন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার ফলে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার ব্যাপারে জনগণ প্রশাসনকে পূর্বের চেয়ে কাছে দেখতে পায়। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব বঙ্গের জন্য আলাদা পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠত, নতুন প্রদেশে লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯০৬-১৯০৭ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র সংখ্যা ৬.৮% ভাগ এবং পাঁচ বছরে ৩৫.১% বৃদ্ধি পায়।

সপ্তমত, চাকরিতে শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ ঘটে।

অষ্টমত, পূর্ব বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, নতুন পূর্ব বাংলা প্রদেশ গঠন পূর্বাঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে উন্নতি-অগ্রগতির এক নয়া দিগন্তের সূচনা করে। বংগভংগের ঘটনাটি একদিকে মুসলমানদের ভবিষ্যত সুখ–স্বপ্নে উদ্বেলিত করে তোলে, অপরদিকে কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দুদের প্রতিহিংসা ও উন্নাসিকতা দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান রেখাকে আরো সম্প্রসারিত করে যা পরবর্তীতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট স্বাধীন পৃথক আবাসভূমির ভিত্তিমূলে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। নবাব সলিমুল্লাহ এক ভাষণে বলেন,

> "বংগভংগ আমাদেরকে নিষ্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে। পূর্ব বাংলার জনগণের বিশেষ করে মুসলমান জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক হিন্দুগণ কোনদিনই সানন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা প্রদেশ তাদের মধ্যে দারুণ ঈর্ষার উদ্রেক করে।"

হিন্দুদের অন্যতম নেতা কাশিম বাজারের মহারাজা মহেন্দ্র চন্দ্র নন্দী বলেই ফেললেন,

> "নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগুরু আর বাংগালী হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। ফলে স্বদেশেই আমরা হব প্রবাসী।"

উল্লেখ্য যে, মহারাজা মুসলমানদের বাংগালী বলেই স্বীকার করেননি। খ্যাতিমান নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বললেন, "বাংলাদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদেরকে অপমান ও অপদস্থ করা হয়েছে।" ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বংগভংগ কার্যকর হবার দিন কংগ্রেস শোকদিবস পালন করে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন রাখীবন্ধন উৎসবের প্রচলন করেন। কোলকাতায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মিলন ক্ষেত্র হিসেবে মিলন-মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। রবি ঠাকুর "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি বংগভংগের প্রতিবাদে রচনা করেন।

প্রকৃতপক্ষে বংগভংগবিরোধী আন্দোলন মুসলমানবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল কোলকাতা এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বিপিণ পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মহারাজা মহেন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ। কমরেড মুজাফফর আহমদের মতে, আন্দোলনকারীরা বঙ্কিম চন্দ্রের তীব্র মুসলিম বিদ্বেষী পুস্তক "আনন্দমঠ" থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতো। এ সময় হিন্দুরা বঙ্কিম চন্দ্রের "বন্দে মাতরম" গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে চালু করে। অথচ একেশ্বরবাদী কোন মুসলমানের পক্ষে 'বন্দে মাতরম'-এর মন্ত্র উচ্চারণ আদৌ সম্ভব ছিল না। অবাংগালী কংগ্রেসের মারাঠী নেতা বালগংগাধর তিলক হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য শিবাজীকে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য এ সময় উদ্যোগী হন। কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে তার স্বকীয়তা হারিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অন্যতম শরীকে পরিণত হয়। কংগ্রেসই "বন্দে মাতরম"কে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব পাস করে।

সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী যখন বৃটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধছিল, তখন বংগভংগের

www.pathagar.com

ফলশ্রুতিতে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আদলে আরো দু'টি ধারার সূত্রপাত হয় যা বৃটিশ শাসকদের জন্য উদ্বেগের কারণ হিসেবে দেখা দেয়। বৃটিশ শাসন অবসানের ক্ষেত্রে এ দুটো আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা পালন করলেও এর নেতৃত্বে যারা ছিল তারা প্রথম পাওনা হিসেবে বংগভংগ রদ প্রত্যাশা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ রাজ হিন্দুদের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে এবং ১৯১১ সালে বংগ বিভক্তিকে বাতিল করে। বংগভংগ রদের সিদ্ধান্তে হিন্দুরা অত্যন্ত উল্লসিত হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ভীষণ মর্মাহত হয়। মুসলমানদের ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। বিস্ময়কর যে, অনেক বাংগালী হিন্দু নেতা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে। তারা এর দ্বারা বাংগালী জাতিকে বিভক্ত করা এবং এ থেকে বাংলার কৃষক মুসলমানরা উপকৃত হতে পারবে কি-না সে বিষয়ে আশংকা ব্যক্ত করেন।

ভারত বর্ষের হিন্দু-মুসলিমের রাজনৈতিক মিত্রতা সম্ভব নয়- এ ধারণার উপর ভিত্তি করে ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বংগভংগের বিরুদ্ধে হিন্দুরা তীব্র বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে। কংগ্রেসের মত সেক্যুলার পার্টিও সেদিন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯১১ সালে বংগভংগ রদের ঘোষণা বাংলার দুটো সম্প্রদায়কে দুটো পথে ধাবিত করে যা আর কোনদিন এক মোহনায় মিলিত হয়নি। ঐ স্বতন্ত্র ধারায়ই সৃষ্টি হয় ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সীমান্ত।

www.pathagar.com

বঙ্গ-ভঙ্গ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঃ

মোহাম্মদ আবদুর রব

দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বের মানচিত্রে আজ যে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গর্বভরে স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে, সে দেশটির অভ্যুদয়ের অথবা স্বাধীন অস্তিত্বের একটি সুস্পষ্ট সূত্রপাত বা ইঙ্গিত সূচিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অবশ্য একথা সুস্পষ্টভাবে বলা বাঞ্ছনীয় যে, ঐ ঐতিহাসিক বিভক্তি প্রক্রিয়ার মূলে নিহিত ছিল ঐ সময়ের ঔপনিবেশিক শক্তি বৃটিশের একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। বৃটিশ প্রশাসনের আমখারা তাদের ভারতীয় উপনিবেশের বৃহত্তম প্রদেশে বাংলা যা ঐ সময়ে বিহার ও উড়িষ্যাকেও ধারণ করেছিল (আয়তন ১,৭৯০০০ বগমাইল, জনসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি) তার সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনের উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলটির ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে বঙ্গ-ভঙ্গের তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে। বৃটিশের ঐ সিদ্ধান্তটি গ্রহণে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র, অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ মুসলমানদের কোনই ভূমিকা ছিলনা। (Partition of Bengal, A. R. Mallik). তথাপি বঙ্গ-ভঙ্গের পর এর অন্তর্নিহিত সুফল ও কল্যাণকর দিকটি অনুধাবন করে পূর্ব বাংলার আপামর মুসলমান জনগণ সরকারের ঐ উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, জমিদার-প্রজা নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালী মুসলমান বঙ্গ-ভঙ্গকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয় এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়। অবশ্য বাংলার হাতেগোনা গুটিকয় কংগ্রেসকর্মী (বেতনভুক) যেমন কুমিল্লার আবদুর রসূল, নোয়াখালির লিয়াকত হোসেন ও মাদারীপুরের দিলওয়ার আহমদ কংগ্রেসের নির্দেশে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু-বাঙ্গালীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সাংস্কৃতিক রূপান্তর, আব্দুল মওদূদ)। আর এই বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করেই বাংলা তথা সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু-সম্প্রদায় তীব্র বিরোধিতার সংগ্রামে ফেটে পড়ে এবং ক্রমে হিন্দু এবং বিশেষ করে হিন্দু বাঙ্গালীদের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ভারতের বাঙ্গালী সমাজকে 'হিন্দু-মুসলমান -এ' সুস্পষ্ট সাম্প্রদায়িক ধারার বিভক্ত

www.pathagar.com

করে দেয়। বাঙ্গালী-হিন্দুরা তাদের 'বঙ্গ-ভঙ্গ রহিতকরণ আন্দোলন'-কে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলেন। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস নেতা শ্রী বিপিণ চন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি, শ্রী বারিন্দ্র কুমার ঘোষ। এ আন্দোলনকে ক্রমে এঁরা সর্বভারতীয় রূপদান করেন এবং এতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকসহ আরো অনেক অগ্রণী নেতা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এমন কি অনেকটা উদারপন্থী বলে খ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এতে জড়িয়ে পড়েন এবং তিনি হিন্দু-পুনর্জাগরণবাদী তিলক আহূত "শিবাজী-পূজা-র ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতের মুসলমান শাসন অবসানকারী কট্টর হিন্দু রাজা শিবাজীকে নিয়ে তাঁর বীরত্বব্যঞ্জক গাথা "শিবাজী বিজয়" কাব্য রচনা করেন। এ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতীতে হিন্দুর বীরত্ব বর্ণনা করে ভারতবর্ষব্যাপী "এক দর্শ রাজ" স্থাপনের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষিত ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গ-ভঙ্গ রদের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গ ভঙ্গের কারণে কলিকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গের সুবিধাভোগী এ সম্প্রদায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার বিপুল কৃষি সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমির সুবিধায় ও পাট, চা, চামড়া এবং অন্যান্য কাঁচা মালের ভিত্তিতে কলিকাতায় গড়ে ওঠেছিল ভারতের সমৃদ্ধতম শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র। তা'ছাড়া এ একই কারণে পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতায় আরো নানা অবকাঠামো, (যেমন, স্কুল-কলেজ হাসপাতাল উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা) প্রশাসনিক কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে ওঠে। অর্থ, শিক্ষা-দীক্ষা ও সমৃদ্ধিতে ভারতের বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়, যারা "বাবু" বলে খ্যাতি লাভ করে, বৃটিশ-ভারতে বিশেষ অগ্রগতিসম্পন্ন ও সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে স্থান লাভ করে। পক্ষান্তরে তীব্র বৃটিশবিরোধী স্বাধীনচেতা বাঙ্গালী মুসলমানগণ যারা পূর্ব বাংলায় ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা প্রশাসনের অমনোযোগ জমিদার ও বেনিয়াদের শোষণ-নিষ্পেষণে ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে। সৈয়দ-নিসার আলী তিতুমীর, হাজী শরিয়ত উল্লাহ্, ফকির মজনুশাহ্, সিলেটের শহীদ সৈয়দ হাদী ও সৈয়দ মাহদীসহ অসংখ্য বাঙ্গালী মুজাহিদ বৃটিশ শাসন ও হিন্দু জমিদারদের শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৮৫৭-এর আযাদীর সংগ্রামেও বাংলার বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের মুসলমান বাঙ্গালীরা মরণপণ ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ভারতে বৃটিশ দখলদারিত্বে ভিত কাঁপিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে, ঐ সময় বাঙ্গালী হিন্দুসহ সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুরা পরম আনুগত্যসহ উপ-মহাদেশে বৃটিশ শাষণ পাকাপোক্ত করতে সচেষ্ট ছিল এবং এ আনুগত্য ও প্রভুভক্তির পুরস্কার হিসেবে বাংলাসহ প্রায় সমগ্র ভারতে হিন্দু প্রজারা বৃটিশ প্রশাসনের সুনজরে থাকে এবং চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত বলে গণ্য হতে থাকে। অন্যদিকে মুসলমানগণ তাদের বিদ্রোহ আনুগত্যহীনতা ও স্বাধীনচেতা মনোভাবের শাস্তি হিসেবে আনুকূল্যের সকল ক্ষেত্রেই মার খেতে থাকে এবং ক্রমে বৃটিশ ভারতে দরিদ্রতম পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় (British policy and the Muslims in Bengal A. R. Mallik) আর এ'সব সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণেই পূর্ব-বাংলার মুসলমানগণ বৃটিশের বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্তে খুবই উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয় এবং বিশেষ স্বার্থহানির কারণে পশ্চিম-বঙ্গের সুবিধাভোগী প্রাগ্রসর হিন্দুসহ সমস্ত বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তাদের এ' বিক্ষোভ এক সময়ে নিতান্ত হীন সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ত ৎকালীন নেতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্ ও বরিশালের শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কলিকাতার পত্র-পত্রিকা ও বাঙ্গালী হিন্দু নেতাদের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে। নবাব সলিমুল্লাহ্‌কে "বৃটিশের দালাল" আখ্যায়িত করা হয় এবং তাঁর ওপর প্রকাশ দিবালোকে আক্রমণ চালিয়ে হত্যার উদ্যোগ নেয়া হয়। বৃটিশের এ বঙ্গ-ভঙ্গকে প্রথমতঃ হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ "জাতীয় ঐক্য বিনষ্টের উদ্যোগ' হিসেবে বলতে শুর করলেও একটু পরে তারাই এ উদ্যোগকে "বৃটিশের মুসলিম তোষণনীতি", "ভারতবর্ষে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনা', কিংবা-"বঙ্গ

www.pathagar.com

মাতার অঙ্গহানি" ইত্যাদি বলে অভিহিত করতে থাকে। মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর আমাদের মুক্তিসংগ্রাম" বইয়ে বঙ্গে–ভঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করে বলেন,

"বঙ্গ-ভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গ-ভঙ্গকে আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় মনে করেন। যে ১৬ অক্টোবর নতুন বাংলার (পূর্ব বাংলা ও আসাম) সূচনা হয়, সেদিন কোলকাতার হিন্দুগণ জাতীয় শোকদিবস পালন করেন। ঐদিন তারা কালো ব্যাজ পরিধান করেন, মাথায় ভস্ম মাখেন, পানাহার পরিত্যাগ করে নানারূপ বিক্ষোভ ধ্বনি সহকারে মিছিল করে গঙ্গাস্নান করেন এবং অপরাহ্নে এক জনসভায় মিলিত হয়ে তাঁরা বঙ্গভঙ্গ রদের শপথ গ্রহণ করেন।" গঙ্গাস্নান, ছাই ভস্ম মাখা পানাহর ত্যাগ পণ হচ্ছে হিন্দুদের ধর্মীয় কৃত্যাদি। আর এ'ভাবে বাঙ্গালী হিন্দুগণ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসম্বলিত আন্দোলনকে ক্রমে একটি নিতান্ত সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে পরিবর্তিত করে তোলে। বাংলার মুসলমানগণ এ আন্দোলনে মোটেই অংশগ্রহণ করেনি বরং তারা বৃটিশের এ উদ্যোগটির মধ্যকার অন্তর্নিহিত কল্যাণধর্মী (মুসলমানদের) দিকসমূহ সম্পর্কে ততক্ষণে অবহিত হতে পেরেছিল। অবিভক্ত বাংলার এক সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালী মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা নবাব সলিমুল্লাহ ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের উদ্যোগে বঙ্গ-ভঙ্গ হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে ১৯০৬ সনে সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন আহূত হয় এবং এ' সম্মেলনেই ভারতের পশ্চাদপদ উৎপীড়িত মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকার মাটিতেই প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। আর এ' মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই সারা ভারত বর্ষের মুসলিম জনগণ একযোগ হয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসস্থল হিসেবে পাকিস্তান কায়েম করে ১৯৪৭ সালে। যৌক্তিক কারণেই বলা যায়, ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু মানসে যে ঈষা, ক্রোধ, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার জন্ম নিয়ে ছিল এবং ১৯১২ সনে ঐ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে আশাহত মুসলমানদের মধ্যে যে বেদনা, দুঃখ ও হতাশা দেখা দিয়েছিল তার ফলেই ভারত বর্ষে হিন্দু-মুসলমান যে সম্পূর্ণ দু'টি আলাদা জাতি অর্থাৎ দ্বি-জাতিতত্ত্বের (Two Nation Theory) জন্ম নেয় এবং এ' তত্ত্বের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র নেতৃত্বে এবং শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, নবাব লিয়াকত আলী খান, সোহ্রাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মাওলানা আকরাম খান প্রমুখের সক্রিয় তৎপরতায় বাস্তবায়িত হয় স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্বপ্ন। আর এ' স্বপ্নের আর এক অধ্যায়ে আমরা লাভ করি ১৯৭১ সালে। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা-যা'র সূত্রপাত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গের মাধ্যমে। অবশ্য, এ' চূড়ান্ত স্বপ্ন রূপায়ণ পর্বে আমাদের হারাতে হয়েছে আসাম, মালদাহ, ত্রিপুরা এবং সিলেট জেলার আমাদের ন্যায্য পাওনা। আরো প্রায় এক হাজার বগমাইল ভূমিসম্বলিত সাড়ে তিনটি থানা (যেমন ঃ করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুর রাতাবাড়ী হিন্দুদের চাপের মুখে পড়ে ঔপনিবেশিক শাসক বৃটিশেরা যে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে তা' হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালীদের মনে যে বিভেদ ঘৃণার জন্ম দেয় তা'র বিবরণ পাওয়া যায়। উপমহাদেশের অন্যতম পন্ডিত কথাশিল্পী বাঙ্গালী লেখক শ্রী নীরদ সি, চৌধুরীর লেখা আত্ম-জৈবনিক গ্রন্থ" "The Auto Biography of an Unknown Indian" -এর পাতায় (পৃঃ ২২৭-২৩০) তিনি লিখেছেন, 'বঙ্গভঙ্গ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিনষ্ট করে দেয় এবং বন্ধুত্বের পরিবর্তে আমাদের মনে তাদের জন্যে (মুসলমানদের) ঘৃণার উদ্রেক করে। রাস্তা-ঘাটে, স্কুলে-বাজারে সর্বত্র এ' ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট হয়। স্কুলে হিন্দু ছেলেরা মুসলমানদের কাছে বসতে ঘৃণা প্রকাশ করে এই বলে যে, -তাদের (মুসলমান বালকদের) মুখ থেকে পিঁয়াজের গন্ধ বেরুচ্ছে।" তিনি আরোও বলেন,

www.pathagar.com

"আমরা লেখাপড়া শিখবার আগেই আমাদেরকে বলা হতো এক কালে মুসলমানরা এ' দেশ শাসন করেছে এবং আমাদের উপর (হিন্দুদের) অত্যাচার করেছে। এক হাতে কোরআন এবং অন্য হাতে তরবারী নিয়ে এদেশে তারা ইসলাম চালু করেছে। মুসলমান শাসকগণ আমাদের নারী হরণ করেছে, মন্দির ধ্বংস করেছে, আমাদের ধর্মীয় স্থানসমূহ অপবিত্র করেছে। অতএব শুধুমাত্র বঙ্গ-ভঙ্গই মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেনি। এ'ছিল বহু পূর্ব থেকেই। বঙ্গভঙ্গ তা বর্ধিত করেছে মাত্র।"

সাহিত্যিক শ্রী নিরদ সি. চৌধুরীর এ' বক্তব্যের সত্যতা বাংলা সাহিত্যের হিন্দু মুসলিম কবি, সাহিত্যিক প্রবন্ধক এবং গবেষকদের লেখা অবশ্য লেখার মাঝে বিশদ রূপে ছড়িয়ে রয়েছে। বঙ্গিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে নিয়ে আধুনিক কালের পল্লী কবি জসীমউদ্‌দীন এমনকি বর্তমানের কবি সুনীল প্রমুখের সাহিত্য কর্মের মাঝেও হিন্দু মুসলমানের ঐ চিরন্তন ঘৃণা বিদ্বেষের সাক্ষাৎ পাই। বঙ্গিমচন্দ্রের বিখ্যাত আনন্দ মঠে এর ছত্রে ছত্রে তাঁর চরম মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাবের সাক্ষাৎ পাই। বাংলার পল্লী কবি জসীম উদ্দিন যিনি একজন অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক লেখক হিসেবে পরিচিত তার লেখা "জীবন কথা" নামক আত্মজীবনিমূলক গ্রন্থে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের চরম মুসলিম বিদ্বেষী সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ পাই। তিনি লিখেছেন যে, ভদ্র হিন্দু বাবুরা গরীব মুসলমানদের "মুচি-মুছলমান" বলে নিতান্ত অছ্যুৎ এবং ঘৃণিত বলে অবজ্ঞা করতো। আর অতি সাম্প্রতিককালের ভারতের নানা স্থানে শত শত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলিম হত্যা নির্যাতন মসজিদ ভাঙ্গা (বাবরী মসজিদ ধ্বংশ সহ) ইত্যাদি তৎপরতা এখনো ভারতীয় হিন্দুদের চরম মুসলিম বিদ্বেষী চেতনার কথা প্রকাশ করে চলেছে।

ভারতের স্বনামধন্য সাংবাদিক, কংগ্রেস নেতা এবং "Illustrated Weekly of India"-র এক সময়ের সম্পাদক M. G. Akbar এর বিখ্যাত গ্রন্থ Riots after Riots" বোম্বের গবেষক লেখক আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার, দিল্লীর স্বনামধন্য সাংবাদিক "The Muslin India" -র সম্পাদক জনতা পার্টির নেতা মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন-এর অসংখ্য গ্রন্থ প্রবন্ধ ও রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে তথাকথিত গণতন্ত্রী ধর্মনিরপেক্ষবাদী ভারতের মুসলমানদের চরম অধঃপতিত করুণ দুঃখ-কষ্ট আর নির্যাতন ভোগের বিবরণে পাকিস্তান সৃষ্টির অনিবার্য কারণ ও "দ্বিজাতিতত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ" ফুটে উঠেছে। ভারতের আর এক ভিন্নধর্মী লেখক, চরম উদারপন্থী সাংবাদিক শিখ বুদ্ধিজীবী খুশবন্ত সিং। হিন্দু সৈন্য কর্তৃক (ভারতীয় সরকারী বাহিনী) শিখদের শ্রেষ্ঠতম তীর্থস্থান অমৃতসর স্বর্ণ-মন্দির ধ্বংসের পর (Operation Blue star) স্বদেশে বলেন, "ভারতে আসলে শুধু "Two Nation Iheory"- ই নয় বরং একজাতির ধ্বজাধারী ভারতে মূলতঃ "Multi Nation Iheory" বা" বহু জাতিতত্ত্ব"-ই কার্যকর রয়েছে"(Khuswanth Sing Illustrated Weekly of India 1984) বঙ্গ-ভঙ্গ বাস্তবায়ন (১৯০৫) বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) এবং বঙ্গ-ভঙ্গ স্থগিত (১৯১২) পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত বাংলা যা ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিমরা যে মূলতঃ দু'টি আদর্শভিত্তিক ভিন্ন জাতিসত্তা এ অপ্রিয় সত্যটি প্রমাণিত হয় এবং ঐ ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের ধারায় ভারতের পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে পশ্চাদপদ, গরীব কিন্তু সম্পদ-সম্ভাবনা ও ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জুড়ে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো এক অতীব সম্ভাবনা সমৃদ্ধ রাষ্ট্রসত্তা-যা' ১৯৪৭ সনে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখায় আবির্ভূত হয় এবং এরই চূড়ান্ত রূপ বাস্তবায়িত হয় ১৯৭১ সনে দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল বঙ্গোপসাগরের উত্তর শিয়রে স্বাধীন সত্তার বিকশিত সার্বভৌম বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শত ত্যাগ, কুরবানী, সংগ্রাম, দুঃখ-বেদনা আর অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশের মুসলমানগণ লাভ করলাম যে পরমকাম্য স্বাধীন মাতৃভূমি শত ষড়যন্ত্র, কুটিল চক্রান্ত, ঘৃণ্য স্বার্থপরতা আর হীন আধিপত্যবাদী শক্তির গভীর কুটচালে আজ বিপন্ন আমাদের নেই জন্মভূমির স্বাধীন অস্তিত্ব।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ, বাংলাদেশ ও অনাগত ভবিষ্যত

তারেক ফজল

উপমহাদেশের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদেরকে অনিবার্য হিসেবে বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস পড়তে হয়। ইতিহাস অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান– যে দৃষ্টিকোণ থেকেই পড়া হোক, বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস পাঠককে নতুন উপলব্ধি প্রদান করে। তবে বলা উচিৎ, বঙ্গভঙ্গের সমগ্র ইতিহাসে রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে দু'বার। ১৯০৫ সালে একবার, ১৯৪৭ সালে অন্যবার। যদিও বঙ্গভঙ্গ ঘটেছে আরো দু'বার। ১৮৭৪ সালে বঙ্গের (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী) ১০টি জেলা আলাদা করে 'আসাম' নামে নতুন একটি প্রশাসনিক এলাকা তৈরি করা হয় একজন চীফ কমিশনারের অধীনে। আধুনিক বঙ্গকে দ্বিতীয়বার ভাগ করা হয় ঐ একই বছরে, সিলেট জেলাকে আসামের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে (১৯৪৭ সালে এই আসাম এক গণভোটের প্রক্রিয়ায় 'বঙ্গে'র সাথে যুক্ত হয়)। ১১টি বড় জেলা 'বাদ' দেয়ার পরও বঙ্গ থেকে যায় 'বৃটিশ ভারতের বৃহত্তম প্রদেশ। ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইলের এ প্রদেশের জনসংখ্যা ছিলো ৭ কোটি ৮০ লক্ষ, যেখানে মাদ্রাজে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ও উত্তর প্রদেশে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের বাস। বঙ্গের পৌরসভার সংখ্যাই ছিলো ১৫৮টি, যেখানে মাদ্রাজের পৌরসভার সংখ্যা ৬১টি। মূলতঃ 'শাসন-প্রশাসনের' কথা মাথায় রেখেই বঙ্গকে তৃতীয় বারের মতো ভঙ্গের প্রস্তাব করেন তৎকালীন বড় লাট জর্জ নাথানিয়েল কার্জন ১৯০৩ সালে। বৃটিশ সরকারের অনুমোদন, নামকরণ ও প্রাথমিক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কাটিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তৃতীয় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। নাম হয় 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' প্রদেশ।

বঙ্গের প্রথম দুই 'ভঙ্গের' বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কথা ইতিহাসে যুক্ত হয়নি। কিন্তু তৃতীয় ভঙ্গের বিষয়টি প্রাথমিক প্রস্তাবনা থেকেই প্রতিবাদ-বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়। ১৯০৩ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'

www.pathagar.com

গান লিখে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ছোট-বড়-বিশাল প্রায় ২ হাজার সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যার অনেকগুলোয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবরকে রবী ঠাকুর 'রাখী বন্ধন' দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান জানান। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়া পর্যন্ত ১৬ অক্টোবরে রাখী বন্ধন দিবস পালিত হতে থাকে। এ দিবস এক উৎসবের রূপ নেয়। এসব নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আশীর্বাদপুষ্ট 'অনুশীলন সমিতি', 'যুগান্তর' ও আরো কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম। এদের টার্গেট ছিলো বৃটিশ প্রশাসক শ্রেণী ও সমুদয় মুসলিম স্বার্থ। এই সন্ত্রাসীদেরই একজন 'ক্ষুদিরাম' কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা করে গ্রেফতার হয় ও পরে তার ফাঁসী হয়। এই ক্ষুদিরামকে নিয়ে অসচেতন প্রত্যন্ত গ্রাম-বাংলায়, যাত্রাপালায় হৃদয়স্পর্শী গান গাওয়া হয় 'একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি'। অথচ এই ক্ষুদিরাম মূলতঃ মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণের অংশ হিসেবেই ইংরেজ ও মুসলিম হত্যায় অংশ নিয়েছিলো। পশ্চিম বঙ্গের গবেষক বিমলানন্দ শাসমল তার 'ভারত কি করে ভাগ হল' শীর্ষক বইতে এই সন্ত্রাসী আন্দোলনকে 'গভীরভাবে মুসলমান বিরোধী' বলে উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় বঙ্গভঙ্গবিরোধী দীর্ঘ ৮ বছরের (১৯০৩–১১) হিন্দু রাজনৈতিক-নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী হত্যাকাণ্ড ও সশস্ত্র ডাকাতি কার্যক্রমের পরিণতিতে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার থেকে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে এই বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেয়া হয়।

চতুর্থ বঙ্গভঙ্গ ঘটে ১৯৪৭ সালে, যখন বৃটিশ ভারত দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বঙ্গের পশ্চিম অশ ও আসাম ভারতে ও পূর্ব অংশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। বলা বাহুল্য, বঙ্গের এই চতুর্থ ভঙ্গ হিন্দু রাজনীতিক এবং নির্দিষ্ট করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে সম্পন্ন হয়। শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের মতো বাঙালী মুসলিম নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বঙ্গের উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হন।

তাহলে সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিককালে বঙ্গের প্রথম দুই 'ভঙ্গের' বিষয়ে 'হিন্দ নেতৃত্ব' উদাসীন থেকেছে, 'তৃতীয় ভঙ্গে'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলে তা 'রদ' করেছে এবং 'চতুর্থ ভঙ্গ' তাদের উদ্যোগ-আয়োজনেই সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের এই চার দফায় হিন্দু জনগণ ও নেতৃত্ব বিপরীতমুখী তিন ধরনের আচরণ কেনো করলো?

এ প্রশ্নের জবাব ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষকগণ খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু এই জবাব প্রচারিত হয়েছে খুবই অল্প মাত্রায়। তাই সমাজের সিংহভাগ মানুষই এ বিষয়ে সচেতন নন। আধুনিক বঙ্গের এই চারবার ভঙ্গের বিষয়ে হিন্দু জনগণ ও নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়ার পেছনে মূলতঃ দু'টি বিবেচনা সক্রিয় ছিলো। এক. রাজনৈতিক ও দুই. অর্থনৈতিক।

বঙ্গের প্রথম দুই ভঙ্গের বেলায় হিন্দুর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো স্বার্থহানির প্রসঙ্গ ছিলো না। তাই তারা উদাসীন থেকেছে। বঙ্গের তৃতীয় ভঙ্গের বেলায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক– উভয় বিবেচনায় হিন্দু জনগণ ও নেতৃত্বের স্বার্থহানির প্রসঙ্গ তারা উপলব্ধি করেছিলো। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থের বিবেচনা প্রায় সমগ্র হিন্দু মানসকে ভাবিত ও সক্রিয় করেছিলো। হিন্টার ল্যান্ড বা খামার বাড়ীর অবস্থানে থেকে পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগুরু জনগণ দ্বারা শিক্ষা, শিল্প, অফিস, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য-সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর তথা এলিট হিন্দু সংখ্যাগুরু পশ্চিম বঙ্গের জনগণ অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান ছিলো– সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো। অবিভক্ত

www.pathagar.com

বঙ্গে মুসলিম ভোটারের সংখ্যা কিছু বেশি হলেও তাদর অসচেতনতা ও সার্বিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার সুবাদে হিন্দু রাজনীতিকরা মুসলিম ভোটের একটি ভালো অংশ পেয়ে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো। প্রথমে প্রস্তাবিত ও পরে কার্যকর তৃতীয় বঙ্গভঙ্গের কারণে সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু জনগণ ও রাজনীতিকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছিলো। আমার এ বক্তব্যকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণাদিসমেত উপস্থাপনের জন্য ব্যাপক পরিমাণ গবেষণা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান উপস্থাপনায় আমি একটু পরবর্তী সময়ের কথা উপস্থাপন করতে চাই।

তৃতীয় বঙ্গভঙ্গ ও এর প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু জনগণ ও নেতৃত্বের আচরণে মুসলিম জনগণ ও নেতৃত্বের চোখ খুলে অংশতঃ। মোটামুটি শিক্ষিত মুসলিম জনগণ এতে সচেতন হয় ও ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আওতায় ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ তেমন কোনো বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়নি। এ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে বিজয়ী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কার্যত ভারতের শাসকে পরিণত হয়। শাসক কংগ্রেসের শাসন-শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনে ক্রমশঃ মুসলিম জনগণের চোখ উণ্মোচিত হয়। ফলে কংগ্রেসের এককালীন নেতা শেরে বাংলাও লিখতে বাধ্য হন 'Muslim Sufferings Under Congress Rule'।

শাসক কংগ্রেসের সামগ্রিক আচরণের ফলেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে শেরে বাংলার এতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' অনিবার্য হয় ও একদার 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। কংগ্রেসী শাসন-শোষণে হুঁশ ফিরে পাওয়া ভারতীয় মুসলিম ও শেরে বাংলার স্মরণীয় মুসলিম শিক্ষা বিস্তার আন্দোলনের ফলে ক্রমশঃ শিক্ষিত হয়ে ওঠা সচেতন বাঙ্গালী মুসলিম ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলিম জনগণের নেতৃত্বে অভিষিক্ত হয়। এই বাস্তবতাতেই যখন ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারতকে বিভক্ত করার প্রশ্ন আসে, তখন আর হিন্দু জনগণ ও নেতৃত্ব পূর্ব বঙ্গকে 'নিজেদের সাথে' রাখার গরজ বোধ করেনি। বরং ঐক্যবদ্ধ বঙ্গকে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে বিপদজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাই তারা তাদের ১৯০৫ সালের 'বঙ্গমাতা'কে ১৯৪৭ সালে অত্যন্ত নির্মমভাবে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এ দফায় 'বঙ্গ মাতার অঙ্গহানিতে'তে তাদের হৃদয়ে ব্যথা লাগেনি। বন্দে মাতরম বলে রাজপথ প্রকম্পিত করেনি। কারণ ততদিনে শিক্ষায়, শিল্পে, অফিস-আদালতে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক চিন্তায় পূর্ব বঙ্গের মুসলিম জনগণ মোটামুটি অগ্রসর ও সচেতন হয়েছে। বঙ্গ ঐক্যবদ্ধ থাকলে জনসংখ্যা ও ভোটের জোরে বঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুসলিমদের হাতে চলে যাবে। অন্ধ মানুষের মতো এই মুসলিম জনতাকে আর শোষণ-নিপীড়ন করা সম্ভব হবে না। তাই তারা বঙ্গকে ভাগ করতে বৃটিশদের বাধ্য করলো। এক্ষেত্রে পণ্ডিত ও লেডী কিলার নেহরু ব্যবহার করলেন তার এডুইনা লেডী মাউন্টব্যাটেন নামের অস্ত্রটি– এমন দাবী অনেক গবেষক করেছেন।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ অব্যাহত থাকলে সাধারণ হিসাবে পূর্ব বঙ্গের অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটতো। জীবন যাত্রা উন্নত হতো, শিক্ষা-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতো– এটা সাধারণভাবে ধারণা করা যায়।

কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য সামগ্রিক হিন্দু প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ পূর্ব বঙ্গের মুসলিম জনগণকে সচেতন করেছে। ১৯৩৭ থেকে কংগ্রেস শাসন-শোষণ সেই সচেতনতাকে পূর্ণতা দিয়েছে। কেউ কেউ দাবী করতে পারেন, বাঙ্গালী মুসলিমের এই স্বার্থ সচেতনতাবোধ ১৯৪৮-৫২-র ভাষা

www.pathagar.com

আন্দোলনে তাকে সাহসী অথবা প্রাণিত করেছে। এই বিশ্লেষণ এ জন্য গ্রাহ্য যে, একই বাংলা ভাষী হয়েও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীরা তাদের ভাষার স্বার্থে কোনো ভূমিকা নেবার সাহস দেখাতে পারেনি। আজ তাই পশ্চিম বঙ্গের বাংলা হিন্দীর আগ্রাসনে লুপ্ত প্রায়। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তত্ত্ব অথবা প্রকল্প এমন হতে পারে ঃ ১৯০৫–১১ সালের আঘাত ও ১৯৩৭ সাল পরবর্তী কংগ্রেসী শাসন-শোষণের আঘাতে সচেতন হয়ে ওঠা বাঙালী মুসলিম শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানকে শাসন করার অধিকার অর্জন করে। বাঙালী মুসলিমের সেই পাকিস্তান শাসনের অধিকার খর্ব করার ভূট্টো-ইয়াহিয়া-পাঞ্জাবী চক্রের ষড়যন্ত্রের জবাবে এই বাঙালী মুসলিম একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশী জাতিতে পরিণতহয়। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে মূল নেতৃত্ব শেখ মুজিবের। পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অধীনে শাসিত একটি জনগোষ্ঠী মাত্র। বিপরীতে পূর্ব বঙ্গের বাঙালী মুসলিমেরা এখন একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক জাতি। বাংলাদেশী জাতি। এ ক্ষেত্রে ১৯১১-র বঙ্গভঙ্গের ও ১৯৩৭ পরবর্তী কংগ্রেসী শাসন মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

পশ্চিম বঙ্গের যে হিন্দু জনগণ ১৯৪৭ পর্যন্ত পূর্ব বঙ্গের মুসলিম বাঙালীকে শোষণ ও শাসন করেছে, তারা এখন স্বাধীন বাংলাদেশী জাতিকে আবার তাদের সারিতে নামাবার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র করছে। এ জন্য জাল বিস্তার করছে নানাভাবে। বলছে 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা'। বলছে, ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত ভুল, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল এবং ১৯৪৭ সালে আরোপিত সীমানা তুলে দিতে হবে। এ দাবী তারা পাকিস্তানের বেলায় বলে না। প্রকাশ্যে তারা পাকিস্তানকে ভারতের সাথে আসতে অথবা পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবকে শিখ পাঞ্জাবের সাথে মিশতে বলে না। বলে কেবল স্বাধীন বাংলাদেশী জাতিকে। এর সরল অর্থ, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অধীনে শাসিত বাঙালী জনগোষ্ঠীর সাথে স্বাধীন বাংলাদেশী জাতি মিশে একাকার হয়ে তার অর্জিত 'জাতিত্বের রাজনৈতিক' মর্যাদাকে বিসর্জন দিতে বলা।

এ আবদার তারা করতে পারে। কিন্তু আমরা তাতে কান দিতে যাবো কেনো? বাঙালীত্বের যে প্রাচীন বন্ধন পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীদের সাথে আমাদের রয়েছে, তা অস্বীকার করার দরকার নেই। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশী জাতির একটি দায়িত্ব আছে। তা হলো, পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী জনগোষ্ঠীকে আমাদের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজনৈতিক জাতিতে উন্নীত করার জন্য তাদেরকে অব্যাহতভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য দুটো ভালো বিকল্প আছে। এক. তারা আমাদের বাংলাদেশী জাতিত্বের সাথে নিজেদেরকে লীণ করতে পারে। অথবা দুই. তারা নিজেরাই একটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাজনৈতিক জাতিতে উন্নীত হতে পারে। এতে একদিকে তারা স্বাধীন হবে। এটা তাদের মর্যাদার উত্তরণ। আর আমাদের জন্য সেটা মানসিক তৃপ্তির কারণ হবে। বাংলা ভাষী জনগণ দু'টি স্বাধীন জাতি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে বলে। আমার বিশ্বাস, অনাগত ভবিষ্যতে স্বাধীন বাংলাদেশী জাতির একটি অব্যাহত ও যৌথ দায়িত্ব হলো পশ্চিম বঙ্গের শোষিত-বঞ্চিত বাঙালী জনগোষ্ঠীকে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক জাতিতে উন্নীত করার সর্বমুখী প্রচেষ্টা চালানো।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ

মাসুদ মজুমদার

যে ভূখণ্ড নিয়ে আজকের বাংলাদেশ মূলত সেই জনপদই বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। চার শতকের গোড়া থেকে এগার শতকের শেষ নাগাদ পুন্ড্র, পাল ও সেন রাজাদের আমলেও এই ভূখণ্ডের নাম ছিল বঙ্গ। এখন যা পশ্চিম বঙ্গ– ভারতের প্রদেশ তার নাম ছিল অঙ্গ। অঙ্গ ছিল পাটলিপুত্রের এলাকাধীন। উড়িষ্যাসহ ঐ অংশকে উৎকলও বলা হতো। সেই পুরনো আমল থেকে মুসলিম শাসন পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর বাংলার রাজধানী ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র ছিল মহাস্থানগড়, সোমপুর বা পাহাড়পুর, ময়নামতী, রামপাল, বিক্রমপুর, গৌড়, নাখনৌতি, সোনারগাঁ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। অতীতে এ দেশের আকৃতি যা-ই থাকুক মুসলিম ও ইংরেজ আমলে বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ় ও উৎকল মিলে একটা যুক্ত 'দেশ' গড়ে উঠেছিল। এর ভেতর মুসলিম শাসনের ছয়শ' বছর। মুসলিম শাসনে স্বাধীনভাবে আড়াইশ' বছর মুসলমান, হিন্দু-বৌদ্ধ মিলে একটা রাষ্ট্রিক জাতি গড়ে উঠেছিল। ইতিহাসের এ সত্যের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম বাংলায় অতুলনীয় জাতিগত মিশ্রণের ভেতরও অভূতপূর্ব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার বৈশিষ্ট্য মন্ডিত স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে উঠেছিল। বঙ্গ ভঙ্গ সেই স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগিয়ে দিল। রাজনৈতিক ভিত্তি দিল। এ ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন ভূমিকা রাখল শাসক হিসেবে ইতিবাচক। আর হিন্দুরা দিল নেতিবাচকভাবে সবচেয়ে ইতিবাচক ফলাফল।

এ সত্য বুঝবার জন্য ইতিহাসের তত্ত্বীয় দিকটার খানিকটা নজর দেয়া প্রয়োজন–জাতি, জাতীয়তা ও জাতিসত্তার স্বরূপ অন্বেষণে ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক গবেষণা ধর্ম রয়েছে। এর উৎপত্তি-সৃষ্টির শুরু থেকে। এ ধারণা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। আবার রাষ্ট্র- সংশ্লিষ্টও নয়। ব্যক্তির মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে। ভূগোল পাল্টায়। মানচিত্রের আদল বদলে যায়। কিন্তু জাতি ও জাতিসত্তা বিকশিত হয়। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন হয়, কিন্তু জাতি বেঁচে থাকে।

www.pathagar.com

যতক্ষণ না একটি মানবীয় সভ্যতা ও জাতিগোষ্ঠী প্রাকৃতিক নিয়মে স্রষ্টার ইচ্ছায় ধ্বংস হয়ে না যায়।

আধুনিক ধারণায় 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জনপ্রিয়তার মানদণ্ডের বিচার করার আগেও জাতি-সমাজ-সভ্যতার সাথে স্বরূপে চিহ্নিত হয়েই সামনে এগিয়ে গেছে। এ ধারা এগুতে এগুতে আজকের প্রেক্ষাপটে এসে জাতীয় রাষ্ট্রের যুগ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। তার পরও কতিপয় জাতি যেমন একাধিক রাষ্ট্রে বসবাস করছে, তেমনি সীমানা চিহ্নিত করে একটি রাষ্ট্রের বাইরেও বহু জাতির বসবাস রয়েছে।

নগর রাষ্ট্রের আদি ধারণা ও জাতীয় রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণা এ কারণেই সকল ক্ষেত্রে এক নয়। রাজার রাষ্ট্র আর জাতীয় রাষ্ট্রের ভেতর এ কারণেই পার্থক্য সূচিত হয়েছে। প্রথমটি রাজার ইচ্ছে ও শক্তির ফসল। দ্বিতীয়টি সম্মতির ফলশ্রুতি। একটি প্রতিষ্ঠিত হয় জোরের বলে, অন্যটি যুক্তির উপর, সম্মতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই আজকের যুগে রাষ্ট্র ভেঙ্গে গেলে জাতি ভেঙ্গে যায় না। সীমানা টুকরো টুকরো হলেও জাতি ভেঙ্গে টুকরো হয় না।

জাতি গঠনে আজ আর একক কোন উপাদান চিহ্নিত হয় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যায়াকরণসিদ্ধ ধর্ম-ভাষা, ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ কিছু বিষয়ের সাযুজ্য নৈকট্যকে নিয়ামক ভাবা হয় না।

ইংরেজ জাতির ইতিহাস, আরব জাতির ইতিহাস, রুশ-চীন প্রভৃতি জাতির ইতিহাস দিয়ে প্রমাণ করা যাবে, আদি পর্বে যেসব জাতিগোষ্ঠীর ধারণা দিয়ে সেমিটিক আর্য দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর ধারণা দেয়া হয় তা হয়তো একটা সময়কে ধারণ করে, চিরায়ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। পৃথিবীর আদি সভ্যতাগুলো এখন আর অবশিষ্ট নেই। তেমনি এমন জাতিগোষ্ঠীও ছিল যাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই। ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা অস্বীকার না করে উপায় নেই। সবচেয়ে প্রামাণ্য ইতিহাস বলে কোন কথা আছে তা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, ইতিহাস গড়ে উঠে সময় পরম্পরায়, আর মানুষ সময়কে সবটুকু আয়ত্তে পায় না। আসমানী কিতাবগুলো ইতিহাসের বড় উপাদান। বিকৃতির অতল গহ্বর থেকে সব ক'টি ঐশীগ্রন্থ খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। অবিকৃত কোরান ইতিহাসের যে যোগসূত্র তুলে ধরে তার উপর নির্ভর করলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো সম্ভব। কোরান মানুষ সৃষ্টির ইতিহাস বলে, দুনিয়া সৃষ্টির ধারণা দেয়। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতন ও ধ্বংস হওয়ার বর্ণনা দেয়। একজন মানুষ থেকে কিভাবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত মানবগোষ্ঠী বিশ্ব পরিক্রমায় ঠাঁই পাবে, আর ভূ-মানচিত্রের বৈচিত্র্যময় পরিবর্তন সূচিত হবে- এর অখণ্ড ধারণা পাওয়া যায় একমাত্র কোরানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐশী ধারায় ইতিহাস বিশ্লেষিত হলে যুগ যন্ত্রণা কমে যাবে। জিজ্ঞাসার জবাবগুলো সামনে এসে দাঁড়াবে। মানব সৃষ্টির অখণ্ড ইতিহাসের ভেতর 'এককের মধ্যে বহু, বহুর ভেতর একক' কিভাবে সমন্বিত হয়– তার সহজ জবাব মিলে যাবে।

কোরাআনে জাতির ধারণা আছে। 'কওম' ধ্বংস হওয়ার কাহিনী আছে। কোরাআনে প্রধান উপজিব্য বিষয় মানুষ। কেন্দ্রীয় চরিত্র মানুষ। সৃষ্টির নিয়মকে বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় করার জন্যই বলা হয়েছে মানুষকে বিভিন্ন ভাষায়, আদলে-আকৃতিতে এবং অবস্থানে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর কারণ পরস্পরকে চেনা-জানা। আর সৃষ্টির রহস্যকে উপলব্ধি করে মানুষ যেন আনত মস্তকে নিজের অবস্থান বোঝাতে চেষ্টা করে।

একজন মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয় থাকতে পারে– থাকে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও জাতিগত ধারণা মানুষের জন্য। আমার মা নানার মেয়ে, বাবার স্ত্রী, খালা মামার বোন, চাচার ভাবী, এভাবে

www.pathagar.com

তিনি খালা, ফুফু, দাদী-নানী ও আমার মায়ের এ বহুমাত্রিক পরিচিতি আমার মাতৃত্বের দাবীকে উপেক্ষা করে না। অন্যান্য দাবীও আমার দাবীকে অস্বীকার করে না। সমন্বয়ের এ সুন্দর উপমা না বুঝবার কারণে এক সময় নাস্তিক নিজের অস্তিত্বের উপর বিগড়ে যায়। কিছু মানবতাবাদী সীমাহীন মাত্রায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। কিছু ধার্মিক সীমাবদ্ধ গন্ডির ভেতর আটকে যায়।

প্রসঙ্গে বলা ভাল, বর্ণ-গোত্র আছে এ বাস্তবতা মানলে মানুষ ছোট হয় না। ধর্ম আছে-এর আমল প্রাণ স্পর্শ করলে বিদ্বেষী হয় না। ভাষা আলাদা-ভাষার মূল উৎসে পৌঁছতে পারলে ভাষা বাঁধা হয় না। বর্ণ যখন বর্ণবাদে পৌঁছে যায় তখন হরিজন বলেও সান্ত্বনা আসে না। গোত্র যখন গোত্রপ্রীতির-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তখন মানুষ সত্তা ছোট হয়ে পড়ে। জাতির ধারণা জাতীয়তাবাদের আদলে আগ্রাসী হলে তা হায়নার লালা থেকেও বিষময় হয়ে যায়।

এসব সত্য বর্তমান বিশ্বের প্রায় পাঁচশ' কোটি মানুষের সামনে স্পষ্ট। এর অনেকগুলো অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্পর্শ করে সিদ্ধান্ত পর্যায় উন্নীত হয়েছে। তার পরও বিকৃতি আছে। অপব্যাখ্যা হয়। মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা বার বার জাগ্রত হয়। দাস বানাবার মানসিকতা জেগে উঠে। এক সময় মানুষ বিকাতো– এখন মানসিকতা বিকায়। এক সময় মানচিত্র দখল হতো, এখন বাজার দখল হয়, মগজ কেনা হয়।

প্রভুত্বকামী মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন এসেছে। রূপ পাল্টে গেছে। কিন্তু মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। এখনও সত্য– সত্যই আছে। মিথ্যা মিথ্যাই বিবেচিত হয়। এক সময় মুখে বলা মিথ্যার যে পরিণাম ছিল এখন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াতে বললেও একই পরিণাম বহন করবে।

আবার গোড়ার কথায় ফিরে গেলে বলা যাবে মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে নগর রাষ্ট্রের ধারণা আসে। নগর রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন কিভাবে হলো, সেই প্রশ্ন উঠাও স্বাভাবিক। অথচ নগর রাষ্ট্রের ধারণা ইতিহাসের আওতার মধ্যে। যারা ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে আগ্রহী– তারাই শুধু রাজার রাজ্য আর রাজ্যের রাজার ডোরে সীমাবদ্ধ থাকতে চান। অথচ জড়বাদী ব্যাখ্যার ভেতর সবটুকু ইতিহাস বিশ্লেষিত হয় না। জড়বাদী ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে– সময়ের ব্যাপ্তি। আর ঐশীবাদী ব্যাখ্যায় সময়জ্ঞান সৃষ্টি শুরুর গোড়া থেকে। তাই একজন মানুষের জীবনবোধকে ইতিহাসের গোড়া পর্যন্ত প্রলম্বিত করতে চাইলে ইতিহাসের ঐশী ব্যাখ্যার কোন বিকল্প নেই।

প্রসঙ্গটুকু এ জন্য টানা যে, এর ভেতর মানুষ ভাবতে শুরু করেছে- মানুষ ইতিহাসের সৃষ্টি-না ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি। একটি জাতি অপর জাতিকে ঘৃণা করে। বিদ্বেষপ্রসূত ভাবাবেগ দিয়ে প্রতিপক্ষকে বিচার করে। ফলাফল দাঁড়ায় ইতিহাস সত্যের কাছাকাছি গিয়ে হোঁচট খায়। আর বিভ্রান্তি এসে ভর করে প্রজন্মের ভেতর।

আজকের বাংলাদেশ ইতিহাসের অনিবার্য বিবর্তনের ধারায় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। ষষ্ঠ শতকের আগেকার কোন ইতিহাসের পাতায় এই নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। যোগসূত্রের অভাবে পূর্বের কোন ইতিহাস নিয়ে চর্চা করাও দুঃসাধ্য। অথচ সাড়ে পাঁচশ' বছরের মধ্যে এই জনপদে একটি জনগোষ্ঠী গড়ে উঠলো, যাদের পরিচিতি এক কথায় বাঙ্গালী মুসলমান। যা আজকের উত্তর বঙ্গ, সেটির নাম ছিল বরেন্দ্র। দক্ষিণের অংশ জুড়ে নাম ছিল সমতট। অবশিষ্ট অংশের নাম ছিল বঙ্গ। এ অঞ্চলের জনবসতির সঠিক ইতিহাস জানার জন্য খৃষ্ট-পূর্ব কোন অব্দে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই সুযোগ নেই। মক্কায় যখন রাসূল (সঃ)-এর সময়কাল তখন এখানকার একজন রাজার সন্ধান পাওয়া যায়। নাম যশোধ। তার এলাকা ছিল দক্ষিণ বঙ্গ। তার পরে

www.pathagar.com

শশাঙ্ক। হর্ষ বর্ধন নামে এক রাজার নাম-গোত্র মেলে উত্তর ভারতে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি গৌড়ের গোপাল রাজার ইতিহাস মেলে। গৌড় এখন মালদহ জেলায়। সেই বংশীয় শাসনের নাম ছিল পাল বংশ। ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন বৌদ্ধ। এ বংশের শাসনকাল ছিল দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের চেয়ে কিছু বেশি।

এই জনপদে সেনদের রাজত্ব শুরু হয় ১১০১ সাল থেকে। এই রাজত্বের শেষ ধরা হয় ১২০৩ সাল। রাজ্যের পরিধি ছিল গৌড় বঙ্গ। অতীতের বরেন্দ্র, সমতট এবং বঙ্গই আজকের বাংলাদেশ। এর ভেতর একটি অঞ্চল ছিল 'রাঢ়া'।

সুলতান হাজী ইলিয়াস শাহ প্রথম অঞ্চলগুলোকে এক করে নাম দেন 'সালতানাত-ই বাঙ্গালা।, ইলিয়াস শাহের সময়কাল ছিল ১৩৪২-১৩৫৮ সাল। ইলিয়াস শাহ নিজেকে সুলতানই-বাঙ্গালা নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। ধারণা করা হয়, এই সূত্রেই এই জনপদের প্রথম নাম বাঙ্গলা হয়। জনগোষ্ঠী পরিচিতি লাভ করে বাঙ্গালী হিসেবে। আলীবর্দীর আমলে তথা মুঘলরা এর নাম দিয়েছিল সুবে বাঙ্গালা বা বাংলা প্রদেশ। বৃটিশ আমলে যার নাম ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী।

১৯০৫ সালে এই বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে ভাগ করে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। এর আগে বার দু'য়েক ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে প্রথম চিহ্নিত সীমানায় আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছার অনুকূলে একটি ভূ-মানচিত্রের রেখা চিহ্নিত হয়। এর আগেই ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার মানুষের ভেতর চিন্তাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– কিন্তু ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে সেটা চিহ্নিত হতো শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে।

বঙ্গভঙ্গ এবং এর রদ ইতিহাসের ধারায় এতটা প্রভাব ফেলেছিল যে, এর মাধ্যমে অতীত জেগেছে। বর্তমান জাগৃতির পথ ধরে ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়েছে। ১৯৪০ সালে ভিন্ন আদলে লাহোর প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে তা রাজনৈতিকভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল তখন দেশ বিভাগ প্রশ্নে পূর্ব বাংলা আবার নীতি-নির্ধারকদের মগজ স্পর্শ করেছে।

১৯০৫ সালে যারা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনকে হিন্দু-আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী ধারায় পূজা মণ্ডব পর্যন্ত নিয়ে গেলো, তারাই আবার '৪৭ সালে মাত্র ৪২ বছরের মাথায় বঙ্গমাতার অঙ্গ ছেদন করে রাজনৈতিক বিলাস ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কাছে 'দেশ মাতাকে' বলির পাঠার মত বধ করে দিল। এক সময় যারা বঙ্গভঙ্গের রদ চাইল, তারাই আবার বধ করল। সেই চিহ্নিত মহলটি, তাদের দোসরগুলো আবার আমাদের স্বাধীনতার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস দেখাচ্ছে। আমাদের স্বাধীনতায় তাদের প্রচুর মায়াকান্না, তারাই সীমানা মুছে দিতে চায়, দু' বাংলাকে এক করার মায়াবী স্লোগান তুলে দিল্লীর কাছে সঁপে দিতে চায়।

সুবে বাংলার সেই ধারণায় বঙ্গভঙ্গ, '৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, '৪৭-এর দেশ ভাগ, বঙ্গ বিভক্তি, '৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এই ক্রম ধারায় ভূমানচিত্রের ভেতর খানিকটা অদল-বদল হয়েছে। কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রিক বাংলার যে উত্থান এবং জাগৃতি, সেটিই মুসলিম বাংলার পরিচয়কে স্বকীয়তা দিয়েছে। দ্বাদশ শতকের গোড়াতে যে জনপদে কোন তৌহিদবাদী মানুষের সন্ধান মিলে না, সেই জনপদ আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। বার কোটি মানুষের বাস।

www.pathagar.com

একদিকে বৌদ্ধ-সমাজতান্ত্রিক বার্মা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বঙ্গোপসাগর, তিন দিকে মূর্তি পূজক আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। এর ভেতর মাত্র পাঁচশ' চুয়ান্ন হাজার বর্গ মাইলের এক চিলতে ভূখণ্ড। এই ভূখন্ডে হামলা চালিয়েছে কর্নাটকের জুলুমবাজ সেনরা। মগদস্যু, হার্মাদরা, ঠগ মারাঠা বর্গিরা। আগ্রাসন চালিয়েছে আর্য-ব্রাহ্মণ কোলকাতাকেন্দ্রিক ভদ্রলোক, বাবু সংস্কৃতির ধারকবাহক জমিদাররা। ইংরেজ শাসক-শোষক এবং তাদের দেশীয় পৌষ্য তাবেদার– ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগীরা, পাঞ্জাবী বর্বররা।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমনের ইতিহাস মাত্র আটশ' বছরের। ইসলাম এখানকার মানুষের বিশ্বাস, আচরণ জীবনবোধ সর্বোপরি জাতিসত্তার স্বরূপকে নতুন আঙ্গিকে উচ্চকিত করেছে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দিয়েছে নতুন অবয়ব।

জল আর পানিতে তফাৎ নেই, মোনাজাত আর প্রার্থনার অর্থও এক। দাওয়াত নিমন্ত্রণ-এর মাঝেও অর্থের গরমিল নেই। ধূতি আর লুঙ্গির দূরত্ব একটা সেলাই করা অন্যটি সেলাইবিহীন– কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা নিজস্বতায় নির্ভর করে দাঁড়িয়েছি। এর একটি কোলকাতা কেন্দ্রিক, অন্যটি মুসলিম বাংলার গণমানুষের রাজনৈতিক কেন্দ্র ঢাকা কেন্দ্রিক।

কাউকে প্রতিপক্ষে দাঁড় না করিয়েও আমরা আজ আত্মতত্ত্বে বিবেককে জাগ্রত করে বুঝতে চেষ্টা করছি, আমাদের নিজস্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতা কোন্‌টি। আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপটা কি? শেকড় সন্ধানের এ তাগিদ আমাদেরকে বার বার প্রশ্নের মুখোমুখি করে। কেন হিন্দুবাদ আশ্রয়ী একটি সন্ত্রাসী আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু জমিদার-কোলকাতার বাবু এবং ভারতীয় কংগ্রেস ঢাকা কেন্দ্রিক বাঙালী মুসলমানদের খানিকটা সুবিধার অনুকূলে বঙ্গভঙ্গ মেনে নেয়নি। আবার সেই গোষ্ঠীটি কেন মাত্র ৪২ বছরের মাথায় বঙ্গকে ভাগ করে ভারতের সাথে জুড়ে দেয়ার প্রস্তাব পাস করল? ঢাকার উত্থানে-বঙ্গীয় মুসলমানদের জাগৃতিতে তাদের কেন এত ঈর্ষা এবং ভয়–?

রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমাদের দেশীয় মীরজাফরদের প্রতি তাদের এত মমত্ববোধ? আমাদের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, বাজার দখলসহ নানাভাবে আড়ষ্ঠ ও নতজানু করার জন্য তাদের পরিকল্পনা আর ষড়যন্ত্র কি শেষ হয়েছে? না-কি ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল নাগাদ নানামুখি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মত তারা আমাদের স্বকীয়তাবোধ এবং জাতিসত্তার গর্বিত অবস্থানে ঈর্ষান্বিত। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ঘোষিত সেই যুদ্ধ কি আবার অঘোষিতভাবে চলছে– এ জিজ্ঞাসা আমাদেরকে বার বার বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে টেনে নিয়ে যায়। সেদিনকার বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের স্বরূপ চিহ্নিত করতে আগ্রহী করে!

www.pathagar.com

নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌র ভাষণ

[১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-বিভাগ কার্যকর হয়। সেই উৎসব দিবসে নওয়াব বাহাদুরের সভাপতিত্বে ঢাকার নর্থব্রুক হলে মুসলমানদের এক মহান সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং 'প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি গঠিত' হয়। সভাপতির ভাষণে নওয়াব বাহাদুর বলেনঃ]

My first duty, gentlemen, is to thank you for the honour you have bestowed on me today in asking me to take the chair at this meeting and to preside over this large and representative gathering of our community. When I think of the large interest involved and the wide scope of usefulness which we expect this Association shall cover, I feel it in my mind to wish that your choice had fallen on a more able man than myself. Such as I am, however, my time and my labour, like my heart is at your disposal and it will be my pride as well as my most earnest desire to foster and encourage its objects and interests embraced in our scheme. It is, gentlemen, a good omen that our opening meeting should have fallen on the memorable day on which the new province of Eastern Bengal and Assam commences its existence. Let us take the omen to heart and let us determine now that our enthusiasm shall never slacken and that our efforts to improve the status and remove the many disabilities under which our community at present labour, shall be steadily and surely crowned with succes, Gentlemen, many Associations have ere thus sprung up, have lived a short life of enthusiasm, dragged on an existence in obscurity and finally died of sheer inanition. Let it no longer be a reproach to our community that apathy and want of energy wreck

www.pathagar.com

১৯৭০ পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলে ভয়াবহ জলোচ্ছাস।

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

১৯৭১

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পাকিস্তানীদের সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা অব্যাহত।

২৫ মার্চ রাত সাড়ে এগারটায় ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী নিরস্ত্র জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অপারেশন সার্চলাইটের নৃশংসতা।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে শেখ মুজিবের আত্মপমর্পন।

২৬ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা। সমগ্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান।

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

আত্মসমর্পণের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর অনুপস্থিতিতে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

গ্রন্থনা ঃ আলম মাসুদ

www.pathagar.com

১৯৫২

২১ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্র ভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত। পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ধর্মঘট আহবান। পুলিশের গুলীতে রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ অনেকে শহীদ হন।

এপ্রিল প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাকে সরকারী ভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত।

১৯৫৪ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ। মুসলিম লীগের পরাজয়।

১৯৫৬

মার্চ শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত।

১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে মন্ত্রী সভার রদবদল। আওয়ামী লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন।

১৯৫৮

২৭ অক্টোবর আইয়ুব খানের মার্শাল ল' জারী ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ।

১৯৬২ আইয়ুব খানের ঘোষিত শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন।

হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন।

১৯৬৩

৫ ডিসেম্বর বৈরুতের এক হোটেল কক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ইন্তেকাল।

আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন প্রশ্নে আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদের সঙ্গে শেখ মুজিবের মতানৈক্য।

১৯৬৫

৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ।

১৯৬৬ ৬ দফা দাবী উত্থাপন

দেশ রক্ষা আইনে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার কয়েকজন সহকর্মী গ্রেফতার।

পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন।

১৯৬৭

ডিসেম্বর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের।

১৯৬৮ আইয়ুব খানের শাসনের দশ বছর উন্নয়ন দশক পালন।

দেশব্যাপী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্ররূপ ধারণ।

৮ ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানীর হরতাল আহবান।

১৯৬৯ সংকট নিরসনে গোল টেবিল বৈঠক আহবান।

মাওলানা ভাসানীর এই বৈঠক বর্জন।

২৫ মার্চ, তীব্র গণআন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে।

www.pathagar.com

১৯৩৭

ফেব্রুয়ারী — সাধারণ নির্বাচনের ঐতিহাসিক ঘোষণা। মুসলমানদের বিপুল সাড়া।

১৯৩৯ — মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব ঘোষণা। 'কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুরাবস্থা' এ, কে, ফজলুল হকের পুস্তিকা প্রকাশ।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতায় বাংলায় মুসলিম লীগের শক্তিশালী অবস্থান।

১৯৪০

২৩ শে মার্চ — মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

১৯৪২ — ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু।

১৯৪৩

এপ্রিল — খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের মন্ত্রী সভা গঠন।

১৯৪৫

নভেম্বর — কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত। ৩০টি মুসলিম আসনে সব ক'টিতেই মুসলিম লীগ জয়ী।

১৯৪৬ — ভারতে কেবিনেট মিশন প্রেরণ। মিশনের কাছে পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ।

২৪শে জুন — পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার গঠন। এই সরকারের যোগ দিতে মুসলিম লীগের অস্বীকৃতি।

১৯৪৭

ফেব্রুয়ারী — পার্লামেন্টে বৃটিশ সরকার ভারত শাসন অধিকার হস্তান্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২২শে মার্চ — শেষ বড় লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কার্যভার গ্রহণ।

১৪ই আগস্ট — পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ।

১৫ই আগস্ট — ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

১৯৪৮

জানুয়ারী — রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন। সংগ্রাম পরিষদের দুটি দাবী ঃ ১। বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব বাংলার শিক্ষা ও অফিস, আদালতের বাহন। ২। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা দু'টি ঃ বাংলা ও উর্দু।

১১ সেপ্টেম্বর — পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকাল। খাজা নাজিমউদ্দিন গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত।

www.pathagar.com

১৯১০	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুসলিম লীগে যোগদান
১৯১০	ভারতের বড় লাট লর্ড মিন্টোর কার্যকাল শেষ। লর্ড হার্ডিঞ্জের বড়লাট হয়ে আগমন। তিনি এসেই ঘোষণা করেন বৃটিশ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে বসে দরবার করবেন।
১৯১১	
নভেম্বর	ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তার।
১২ ডিসেম্বর	সম্রাট ৫ম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করেন। হিন্দু সমাজের উল্লাস।
১৯১২	
৩১ জানুয়ারী	বড় লাট লর্ড হার্জিঞ্জের ঢাকা আগমন। বঙ্গভঙ্গ রদের সান্ত্বনাস্বরূপ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাস।
২ ফেব্রুয়ারী	সরকারী ইশতেহারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব পেশ। হিন্দু নেতাদের তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা। তাদের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙ্গালি জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে। নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।
১৯১৫	
জানুয়ারী	মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত নবাব সলিমুল্লাহর ইন্তেকাল।
১৯১৬	কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ১১ জন মুসলিম ও হিন্দু সদস্য বৃটিশ সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।
২৯ ও ৩০	
ডিসেম্বর	লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন। মুসলিম লীগের নবম বার্ষিক অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সভাপতিত্ব করেন।
১৯১৯	জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড
১৭ অক্টোবর	ঐতিহাসিক খিলাফত দিবস পালিত। একে, ফজলুল হক ও মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে বাংলায় খিলাফত আন্দোলনের সূচনা।
১৯২১	কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের প্রচন্ড বিরোধিতার মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৫	ভারত শাসন আইন ঘোষণা। সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ এই আইনের প্রধান দিক।
১৯৩৬	কোলকাতা থেকে মুসলমানদের মুখপাত্র দৈনিক আজাদ প্রকাশিত। সম্পাদকঃ মাওলানা আকরাম খাঁ।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ
ঘটনা প্রবাহ

১৯০৪

২৫ জানুয়ারী — ঢাকা সুহৃদ সংঘের সভায় আসাম চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী ও আশে-পাশের অঞ্চল নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠনের দাবী।

১০ ফেব্রুয়ারী — লর্ড কার্জনের পূর্ব বাংলা সফর। নবাব সলিমুল্লাহ তাকে রাজকীয় আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। তিনি লর্ড কার্জনকে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলেন।

১৯০৫

১০ জুলাই — ভারত সচিব ব্রডারিক লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

১৬ অক্টোবর — হিন্দু নেতাদের প্রচন্ড আপত্তির মুখে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর। দেশব্যাপী কংগ্রেসের উদ্যোগে শোকদিবস পালন।

স্যার ব্যাম্পফিল্ড ফুলার নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের ছোট লাট নিযুক্ত হন। ঢাকায় তাকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হয়।

নতুন প্রদেশের জন্মদিনে নবাব সলিমুল্লাহ মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন পতিষ্ঠা করেন।

২৮ সেপ্টেম্বর — মহালয়ার দিনে কলকাতায় কালিঘাটে কালিমন্দির প্রাঙ্গণে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে স্বৈরাচারী ও অপ্রয়োজনীয় কুকীর্তি বলে নিন্দাবাদ করে।

বিলেতী পণ্য বর্জনের জন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং

১৯০৬ — ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা।

১৯০৮

২ জুন — কোলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে বোমা প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কার। অরবিন্দঘোষসহ ৪৭ চরমপন্থী গ্রেফতার।

www.pathagar.com

our efforts to improve, and to take our proper position in the Work of life. The creation of the new province this day to which I alluded just now as a good omen, will afford us great opportunities for advancement, moral and material, Let us seize them, let us take to heart the lession of the past and now show that while the Government has no more loyal supporter in India than the Mohamedan, it also possesses in him a factor of real importance in the working out of the great problem of the advancement of India, Gentlemen, the Khan Bahadur (Mohammad yousof) has just mentioned the duty of this Association towards the Government. I feel and you will agree with me, I know, that looking to the prospect the new Government affords to Mohamedans and to the impetus which its formation promise to give to the advancement of our people, our best and heartiest thanks are due to Lord Curzon to whom we owe so much. His action informing the new province has given the Mohamedans yet another chance of showing his real worth and thus Mohamedan sincerest gratitude is his reward. And now, gentlemen, on last word, this Association embraces the whole of Eastern Bengal and Assam. Let her Moslem sons be up and doing; let them show not only that they are study supporters of the Empire and good citizens of India's towns, but let them also stir themeslves to show their title by right of sympathy with others and zeal for the advancement of India, genarally to be a power behind the throne. Gentlemen, I have to thank you once for offering me the chair on this great occasion. If as I fear, another than mysef could have better voiced the sentiments of our community at all events. no other could have the interest and welfare of this Association more deeply at heart (cheers).[১]

---

১. Moslem Chronicel, Calcutta, 21st October, 1905, Pp 438-39

www.pathagar.com

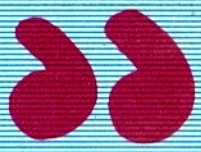

সত্য পথের তীর্থ পথিক ভয় নাহি নাহি ভয়
শান্তি যাদের লক্ষ্য তাদের নাই নাই পরাজয়
অশান্তিকামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে
অবশেষে চির লাঞ্ছিত হয় অপমানে আর লাজে।

— জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম